বিষয়ঃ বৃটিশ বাংলায় মুসলিম সংস্কৃতির রূপান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

এপ্রিল, ২০১৪ ঈসায়ী

গবেষক

মোছাঃ জান্নাতে গুলশান

এম.ফিল (২য় পর্ব)

রেজি. নং-২৯/২০০৯-১০

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী

প্রফেসর

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি, নিম্ন স্বাৰরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত "বৃটিশ বাংলায় মুসলিম সংস্কৃতির রূপান্তর" শীর্ষক অভিসন্দর্ভখানা আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ অভিসন্দর্ভখানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোথাও কোন ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করিনি এবং আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

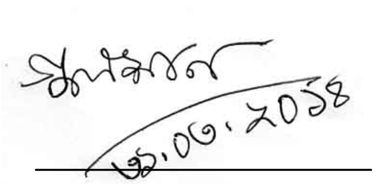

মোছাঃ জান্নাতে গুলশান
এম.ফিল. গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রত্যয়নপত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে গবেষণারত মোছাঃ জান্নাতে গুলশান এর "বৃটিশ বাংলায় মুসলিম সংস্কৃতির রূপান্তর" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যৰ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি উক্ত গবেষকের একক গবেষণাকর্ম। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য কর্তৃপৰের প্রতি সুপারিশ জ্ঞাপন করছি।

২৩/০৩/২০১৪

ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
এম.ফিল./ পিএইচ.ডি.
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদুলিলৱাহ্! মহান আলৱাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাকে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও 'বৃটিশ বাংলায় মুসলিম সংস্কৃতির রূপান্তর' শীর্ষক অভিসন্দর্ভখানা রচনার কাজ সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন। অভিসন্দর্ভ রচনায় আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী যেভাবে আন্তরিকতা ও পান্ডিত্যের সাথে তত্ত্বাবধান করেছেন, তাতে আমি বিশেষভাবে ঋণী। এছাড়া ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় অন্যান্য শিৰকবৃন্দ যাঁদের নিকট থেকে আমি বিভিন্ন সময়ে গুরৰত্বপূর্ণ পরামর্শ ও সহায়তা পেয়েছি, তাঁদের প্রতিও আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এ মূহুর্তে আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মোঃ লুৎফর রহমানকে যিনি অখ্যাত পলৱীতে বসবাস করেও তাঁর সন্তানদের সঠিক জ্ঞান আহরণ ও উচ্চশিৰা গ্রহণে সর্বদা উৎসাহ প্রদান করেছেন। এই প্রিয় মানুষটি বেঁচে থাকলে আমার সফলতায় আজ সবচেয়ে বেশী খুশি হতেন। আলৱাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাত নসীব করৰন।

তবে যে মানুষটির সহায়তা ছাড়া আমার পৰে অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ এক রকম অসম্ভব হয়ে যেত, তিনি আমার মা-নূরবানু বেগম। তিনি আমার সন্তান ও পরিবারের সকল দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে অধ্যয়ন ও গবেষণাকার্যে মনোনিবেশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। মহান আলৱাহ যেন তাঁকে দুনিয়া ও পরকালে উত্তম মর্যাদা দান করেন।

বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মাহাবুর রহমানের প্রতি, যিনি সর্বদা আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। এছাড়া আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গণগ্রন্থাগার (শাহবাগ) ও এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারের সকল

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি, 'বিশ্বাস কম্পিউটার্স' এর মোঃ আল-আমীন ভাইকে যিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে এই অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করেছেন।

এই বিশেষ মূহুর্তে আরও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় চাচা মোঃ রফিকুল ইসলাম মাস্টার ও আমার বড় ভাই স্বরূপ মোঃ আতাউর রহমান চৌধুরীকে (বোন জামাই)। তাঁদের সহযোগিতা ও প্রেরণা ছাড়া আমার পক্ষে কলেজের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হতো না। এছাড়া আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব যারা আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ।

মোছাঃ জান্নাতে গুলশান

ঢাকা

এপ্রিল, ২০১৪ ঈসায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় বিন্যাস

প্রথম অধ্যায়	০১-০৯
ক. ভূমিকা	০২-০৩
খ. সংস্কৃতির ধারণা	০৪-০৭
গ. ইসলামী সংস্কৃতির ধারণা	০৮-০৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	১০-১৩৭
ক. বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতির স্বরূপ	১১-১৫
খ. প্রাক বৃটিশ বাংলায় মুসলিমদের সাংস্কৃতিক অবস্থা	১৬-১৩৭
• সুলতানী আমলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি	১৬-৬৭
• মোগল আমলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি	৬৭-১৩৭
তৃতীয় অধ্যায়	১৩৮-১৫৯
ক. ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচয়, বাংলায় আগমন ও ক্ষমতা লাভ	১৩৯-১৫২
খ. বৃটিশ শাসনের প্রথমার্ধে মুসলিম বিরোধী নীতি ও বাঙালী মুসলিমদের পতন	১৫৩-১৫৯
চতুর্থ অধ্যায়	১৬০-২০৭
বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতির রূপান্তরঃ	
• শিক্ষা ব্যবস্থার পতন ও পরবর্তীতে উত্থান প্রচেষ্টা	১৬১-১৭৩
• বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপান্তর	১৭৩-১৮৯
• নগর ব্যবস্থাপনা ও মুসলিম স্থাপত্যের বিনাশ	১৮৯-১৯৩
• সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবক্ষয়	১৯৩-২০৩
• সাম্প্রদায়িক বিভেদ নিরসন ও সম্মিলন প্রচেষ্টা	২০৩-২০৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়	**২০৬-২২২**
বাঙালী মুসলিম জাগরণে বিভিন্ন আন্দোলনের ভূমিকা	২০৬-২২২
ষষ্ঠ অধ্যায়	২২৩-২৩১
উপসংহার	২২৪-২৩১
পরিশিষ্ট	২৩২-২৪৩
গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)	২৪৪-২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ক. ভূমিকাঃ

আরবের মক্কা নগরীতে ইসলামের আবির্ভাব হলেও দ্রুতই তা আরবের গন্ডি পেরিয়ে বহির্বিশ্বে সম্প্রসারিত হয়। মরুচারী দুঃসাহসিক অশ্বারোহী বাহিনী ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর লক্ষ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব আর ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অদম্য আকাঙ্খা নিয়ে পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। কায়রো, কর্ডোভা ও বাগদাদ কেন্দ্রিক গৌরবময় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাসী শাসনকালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে মুসলিমদের বিজয় অভিযান ভারত অবধি পৌঁছে যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল আক্রমণে বিধ্বস্ত মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে ভাগ্যের অন্বেষণে মুসলিম অভিযাত্রী দল ভারতে এসে ঠাঁই নেয়। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ছিলেন এমনই একজন ভাগ্যান্বেষী অভিযাত্রী, যিনি যোগ্যতা বলে বাংলার শাসন ক্ষমতাকে করায়ত্ব করেন এবং বাংলায় দীর্ঘ মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এরপর দলে দলে ধর্ম প্রচারক, বণিক, বুদ্ধিজীবী ও আশ্রয় প্রার্থী মানুষের ঢল নামে। এর সাথে যোগ দেয় ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট ধর্মান্তরিত স্থানীয় মুসলিমগণ। এভাবে বাংলায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং গড়ে তোলে স্বতন্ত্র অনন্য এক সংস্কৃতি।

সুলতানী ও মোগল শাসনের দীর্ঘ সময়কালে এ সংস্কৃতি কখনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে, কখনও পায়নি, কখনও বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে, কখনও ইসলামের মূল ধারার অনুসারীদের দ্বারা সংস্কার সংশোধনের দোলায় দোলায়িত হয়েছে কিন্তু তার পদযাত্রা থেমে থাকেনি। দীর্ঘ পাঁচশত বছর ব্যাপী এ সংস্কৃতির স্বাচ্ছন্দ্য পদচারণা বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে মুখরিত করেছে। বাংলার অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীও স্থানীয় সংস্কৃতির একটি অংশ হিসেবেই বাঙ্গালী মুসলিম সংস্কৃতিকে মেনে নিয়েছে। সকল জাতিগোষ্ঠীর মিলিত পদচারণা বাংলাকে গৌরবময় করেছে, উন্নতি ও প্রাচুর্যের শীর্ষে নিয়ে গেছে, বিশ্ব পরিব্রাজকদের ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত করেছে। এ বিস্তৃত পদচারণায় দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও মনোমালিন্য যে একেবারে

হয়নি তা কিন্তু নয়, তবে ভাগাভাগির প্রশ্ন ওঠেনি। এর পর আঠারো শতকে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে ইংরেজ বেনিয়াদের প্রতিষ্ঠা উদারনৈতিক বাংলার সকল অঙ্গনকে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি দ্বারা কলুষিত করে। বৃটিশ শাসনের প্রথম একশ বছরে মুসলিমরা বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারে সংগ্রাম করেছে কিন্তু হিন্দু জাতি এতে যোগ দেয়নি, বরং ইংরেজদের সাথে সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কারণ তাতে তাদের বৈষয়িক লাভ ছিল বেশী। এই একশ বছরে হিন্দুরা বৈষয়িক উন্নতিতে যতটা এগিয়েছে মুসলিমরা ঠিক ততটাই পিছিয়েছে। Hunter এর মতে, একশ সত্তর বছর আগে বাংলার কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তানের দরিদ্র হয়ে পড়া ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু বর্তমানে তার পক্ষে ধনী হওয়াটাই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে[১]।

পরবর্তী একশ বছরে মুসলমানরা যখন ঘর গোছানোর কাজে মনোনিবেশ করল, তখন তারা হিসেব কষা শুরু করল তারা কতটা কম পেয়েছে আর প্রতিবেশী হিন্দুদের ভাগ্যে কতটা বেশী জমা হয়েছে। হিন্দু সমাজও নতুন এই ভাগীদারের উত্থানকে সহজে মেনে নেয় নি, শুরু হল লাঠালাঠি। এই ঘৃণ্য ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সাংস্কৃতিক অঙ্গনকেও কলুষিত করে ফেলে। বাংলার উদার নৈতিক সংস্কৃতির অধঃপতন ঘটে। যখন হিন্দুদের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় মুসলিমগণ পিছিয়ে পড়ে তখন প্রশ্ন ওঠে পৃথক নির্বাচন, পৃথক আবাস ভূমির। জাতি ভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা পাশাপাশি অবস্থানের সংস্কৃতিকে অসম্ভব করে তোলে। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব সহকারে অবস্থানের যুক্তি অচল হয়ে যায়। হিন্দু মুসলমানের একগুয়েমি এবং তাতে ইংরেজ বেনিয়াদের অগ্নি সঞ্চারণে দেশ ভাগ অনিবার্য হয়ে যায়। শুরব হয় পূর্ব বাংলার নতুন পদচারণা। মুনাফা লোভী ইংরেজ বেনিয়াদের বিদায়ে বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি পুনরায় উদার নৈতিক ভাব ধারায় ফিরে আসে।

১। W.W. Hunter, *The Indian Musalmans*, Published by W. Rahman, Barnalipi Mudrayan, Banglabazar, Dacca, P-141.

খ. সংস্কৃতির ধারণাঃ সংস্কৃতি শব্দটি বর্তমানে বহুল পরিচিত ও আলোচিত বিষয় হলেও সংস্কৃতির সঠিক ধারণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতির প্রচলিত ধারণা হচ্ছে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলা সংস্কৃতির উপাদান। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও যে সংস্কৃতির উপাদান তা অনেকেরই অজানা। সংস্কৃতি শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-সংস্কার, উন্নয়ন ,অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিচারবুদ্ধি, রীতিনীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ। সহজ বাংলা অভিধান (বাংলা একাডেমী) অনুযায়ী, সংস্কৃতি হচ্ছে-"কোন জাতি বা গোষ্ঠীর শিৰা-সাহিত্য, বিশ্বাস, ধর্ম, আচার, আচরণ ও তার চর্চার সামগ্রিক রূপ। শিৰা চর্চার ফলে পাওয়া মানসিক বিকাশ।"[২]

সংস্কৃতি শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসেবে 'Culture' শব্দটি প্রচলিত। *The New American Encyclopedia* তে Culture এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে-

Culture: In anthropology means the characteristic attainments, enlightenment and discipline of a people or a social order whether these attainments are primitive or advanced. In short it means a particular human group's mastery of the art of living, various phases of culture are language, religion, customs, industries, all of which are a general social inheritance of the group, which may continue to develop retrogress independently of all other groups or may have its culture modified by contact with other culture.[৩]

২। *বাংলা একাডেমী-সহজ বাংলা অভিধান*, সম্পাদক- মোহাম্মদ হারৰন-উর-রশিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৩,পৃ-৩৮৮।

৩। উদ্বৃতঃ জহুরী, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, ১ম খন্ড, উতলু প্রকাশন, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ-১৪ ।

The New Encyclopedia Britannica তে বলা হয়েছেঃ 'Culture consists of language, ideas, beliefs, customs, taboos, codes, institutions, tools, tecniques, rituals, ceremonies and other related components.'[৪]

New Webster's Dictionary তে বলা হয়েছে–

Culture (L.caltura, <colere, cult) the acquired ability of an individual or a people to recognize and appreciate generally accepted esthetic and intellectual excellence, the esthetic and intellectual achievement of civilization , as in case of a certain nation of period. The total of human behavior patterns and technology communicated from generation to generation.[৫]

The world Book Encyclopedia তে বলা হয়েছে–

"Culture consists of all the ideas, objects and ways of doing things created by the group. Culture includes arts, beliefs, customs, inventions, language, technology and traditions. The term civilization is similar, but it refers mostly to scientifically more advanced ways of life. A culture is any way of life, simple or complex. Culture consists of learned ways of acting, feeling and thinking, rather than biologically determined ways."[৬]

অর্থাৎ culture হচ্ছে Way of Living। জীবনযাত্রা প্রণালী যে রকমই হোক (primitive বা advanced) তাই Culture। এখানে morality বা নৈতিকার প্রশ্ন নেই।

৪। *The New Encyclopedia Britannica*, vol-3, founded 1768, 15th edition, p-784.
৫। উদ্ধৃত: জহুরী, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, ১ম খন্দ, উতলু প্রকাশন, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ-১৬
৬। *The World Book Encyclopedia*, (ci-cz), vol-4, Field Enterprises, INC, Chicago.

আরবী ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটির প্রতিশব্দ 'তাহযীব'। আর সভ্যতা বা civilization এর প্রতিশব্দ 'তমদ্দুন'। আরবী-বাংলা অভিধান (বাংলা একাডেমী) এ 'তাহযীব' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে-শিষ্টাচারিতা করা, অনুশীলন করা, শিক্ষা দেয়া[৭]। আর তমদ্দুন অর্থ সভ্য হওয়া, ভদ্র হওয়া, সুঠাম ও সুন্দর হওয়া।[৮] অর্থাৎ যে চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস, প্রত্যয় ও অনুভূতি মানুষকে মার্জিত, পরিশোধিত, সুসজ্জিত, সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান করে তাই তাহযীব বা সংস্কৃতি। তাহযীব হচ্ছে মূল চেতনা ও অনুভূতি আর তমদ্দুন হচ্ছে তার বহিঃপ্রকাশ।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম সংস্কৃতির সহজ সরল সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে-

"একক আচরণ নয় বরং যে আচরণ বহু জনের অনুসৃত এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়-তাই সংস্কৃতি। মানবগোষ্ঠী যে আচরণ নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয় এবং মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করে অর্জন করে, তা ঐ সমাজের সংস্কৃতি।.... সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো সরলতা। বিষয়টি সরল না হলে সকলের অনুসরণ, অনুকরণ বা অবলম্বন সম্ভব নয়।"[৯]

কাজী মোতাহার হোসেন সংস্কৃতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন-

"সাধারণভাবে বলতে গেলে যুগ-যুগের অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার ফলে জীবন-যাপনের যে বিশিষ্ট ধারা গড়ে উঠে, তারই নাম 'সংস্কৃতি'। সংস্কৃতি কথাটির সঙ্গে অপূর্ণতার পরিপুষ্টি বা জীর্ণতার পরিমার্জনার ভাব মিশানো রয়েছে, অর্থাৎ সংস্কৃতি যে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নয়, বরং সমাজের ভেতর থেকেই উদ্ভূত একটি জীবন্ত শক্তি তারই দিকে ইংগিত রয়েছে। ....মোট কথা মানুষের চিন্তা কল্পনা, কর্মক্ষমতা প্রভৃতির সমন্বয়ে

৭। *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ ১৯৭২, পৃ-৯৯৭।
৮। *আরবী-বাংলা অভিধান*, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ ১৯৭০, পৃ-৯২৭।
৯। জেড. এম. শামসুল আলম, প্রবন্ধ-সংস্কৃতি ও সুন্নাহ, *আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* (সংকলিত গ্রন্থ), সংকলক- মনির উদ্দিন ইউসুফ, আত্মপ্রকাশ প্রকাশনী, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

জীবনধারনের জন্য অত্যাবশকই হোক বা তার আনন্দ ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যই হোক, যত প্রকার বিশ্বাস, অনুষ্ঠান, সরঞ্জাম বা প্রতিষ্ঠান জনসাধারনের সমর্থন লাভ করে ব্যাপকভাবে প্রচলিত বা শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছে, সে সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত।"[১০]

উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে প্রতীয়মান হয় যে সংস্কৃতি, তাহযীব ও কালচার শব্দের ভাবগত অর্থ এক হলেও সূক্ষ পার্থক্য রয়েছে। যে কোন ধরণের জীবনযাত্রা প্রণালী বা art of living কালচারের অন্তর্ভূক্ত হলেও সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত নাও হতে পারে। সংস্কৃতি শব্দটির মূলগত অর্থের সাথে সংস্করণ, মার্জন, উৎকর্ষ সাধন, ক্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ প্রভৃতি শব্দ জড়িত। উন্নত পরিশোধিত জীবনচারণকে সংস্কৃতি বলে। নৈতিক মূল্যবোধকে সংস্কৃতি থেকে আলাদা করার উপায় নেই। মূলত মার্জিত জীবনবোধ তথা মূল্যবোধ দ্বারা যাপিত জীবনযাত্রা প্রণালীই সংস্কৃতি। এ দিক থেকে culture শব্দের চেয়ে civilization বা সভ্যতা শব্দটির সাথে সংস্কৃতির নৈকট্য বেশী। এজন্যই আবুল মনসুর আহমদ civilization কে সংস্কৃতির প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[১১] অন্যদিকে তাহযীব বা তমদ্দুন শব্দটির সাথে সংস্কৃতি শব্দটির খুব একটা পার্থক্য নেই।

জীবনযাত্রা প্রাণালীই সংস্কৃতি হলেও স্থান-কাল-পাত্রভেদে সংস্কৃতির রূপ ভিন্ন ভিন্ন। পানাহার ও বস্ত্র পরিধানের সংস্কৃতি জাতি ও সমাজ ভেদে আলাদা । ধর্মীয় প্রার্থনা সংস্কৃতির অংশ হলেও প্রার্থনার বিধি-বিধান ধর্মভেদে ভিন্নতর। তাই জাতিভেদে যেমন ইংরেজ, বাঙালী, ইরানি, আরবি প্রভৃতি নানা সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে, তেমনি ধর্মভেদে ইসলামী সংস্কৃতি, বৈদিক সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, পৌত্তলিক সংস্কৃতি প্রভৃতি নানা সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। আমাদের বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করেও হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রণালীতে তাই স্বাতন্ত্র্য বা ভিন্নতা রয়ে গেছে।

১০। কাজী মোতাহার হোসেন, প্রবন্ধ-সংস্কৃতি ও সভ্যতা, *'প্রবন্ধ সংগ্রহ'*: সংকলন-সম্পাদনা-ভূমিকা-আবুল আহসান চৌধুরী, মধ্যযুগ প্রকাশনী,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ-৭৮৮।

১১। আবুল মনসুর আহমদ, *'বাংলাদেশের কালচার'*, আহ্মদ পাবলিশিং, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ-১।

গ. ইসলামী সংস্কৃতির ধারণাঃ 'ইসলাম' ও সংস্কৃতি শব্দ দুটির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলাম হচ্ছে 'দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থা। আল্ কুরআনে আলল্বাহ রব্বুল আলামীন ইসলামকে তাঁর মনোনীত একমাত্র-দ্বীন হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আর এই দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা কোন স্থান, কাল বা পাত্রে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা সার্বজনীন ও চিরন্তন। পুরো পৃথিবীর সকল মানুষের জীবন যাপনের পথ সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আর এই দ্বীন কোন সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষের চিন্তাপ্রসূত নয়, বরং তা বিশ্বজগতের স্রষ্টা মহান রব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রেরিত। আবার এই দ্বীন-ই-ইসলাম কালের পরিক্রমায় গড়ে ওঠা কোন জীবনধারাও নয়, বরং পুরো মানব জাতির জন্য নির্ভুল, সর্বাধিক কল্যাণকর ও সর্বোপযুক্ত জীবন বিধান। ইসলাম এসেছে মানুষের চিন্তা ও কর্মকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। এ অর্থে দ্বীন-ই-ইসলামের সাথে সংস্কৃতির একাত্মতা রয়েছে। কবি আসাদ বিন হাফিজ মনে করেন, "ইসলামের যেমন মূল টার্গেট পরিশুদ্ধ জীবন, পরিশুদ্ধ মানুষ-সংস্কৃতিরও মূল টার্গেট জীবনের এই পরিশুদ্ধ রূপ। তাই একজন প্রকৃত মুসলমান মানেই একজন পরিপূর্ণ সংস্কৃতিবান মানুষ। আবার একজন প্রকৃত সংস্কৃতিবান মানুষ মানে একজন পরিপূর্ণ ও যথার্থ মুসলমান।"[১২]

ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মিশরের দার্শনিক অধ্যাপক হাসান আইয়ুব তাঁর রচিত 'তাবসীত আল আকায়েদ আল ইসলামী' গ্রন্থে বলেছেন-"ইসলামী সংস্কৃতি বলতে বোঝায় কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক মানুষের সামষ্টিক জীবনের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, আবেগ, অনুভূতি, অনুরাগ, মূল্যবোধ, ক্রিয়াকান্ড, সৌজন্যমূলক আচরণ, পরিমার্জিত ও পরিশোধিত সৎকর্মশীলতা, উন্নত নৈতিকতা তথা জীবনের সকল কর্মকান্ডকে।"[১৩] অর্থাৎ আল্ কুরআন ও সুন্নাহকে অনুসরণ করে মুসলিম সমাজ যে জীবনধারা গড়ে তোলে তাই ইসলামী সংস্কৃতি।

১২। আসাদ বিন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রীতি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ-৪৮।
১৩। উদ্বৃত: জহুরী, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, ১ম খন্ড, উচ্চারণ প্রকাশন, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ-১৩।

আর ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। সার্বভৌম ৰমতার মালিক আলৱাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও আনুগত্য এবং পরকালের জবাবদিহিতার অনুভূতি একজন মুসলিমের জীবনযাত্রা প্রণালীর সীমা রেখা নির্ধারণ করে দেয়। আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনযাপন পদ্ধতিই হচ্ছে দ্বীন-ই-ইসলাম বা ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃত মডেল। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবন যাপন পদ্ধতির গুরৰত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল সরলতা ও উদারতা। তাঁর জীবন ছিল কৃত্রিমতামুক্ত। তাঁর প্রতিটি অভ্যাস ও কর্মের মাঝে মানবতার সর্বাধিক কল্যাণ নিহিত। মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি ইসলামী সংস্কৃতির মূল লৰ্য নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। এই লৰ্য হচ্ছে একতা, বিনয়, নম্রতা, পারস্পরিক সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাবোধ সহকারে জীবন যাপন। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের সহজাত সকল প্রবণতাকে স্বযত্নে লালন করে। তবে কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে সীমারেখা তৈরী করে দিয়ে মানুষকে অপসংস্কৃতি থেকে রৰা করে।

মুসলিমগণ যতৰণ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ভিত্তিক জীবন যাপন অব্যাহত রাখবে ততৰণ তারা ইসলামী সংস্কৃতির পরিসীমার ভেতরে অবস্থান করবে। তারা এর বাইরে যদি অন্য কোন রীতি বা পন্থা অনুসরণ করে তবে তা অপসংস্কৃতি হিসেবেই বিবেচ্য হবে। মুসলিমগণ যে কোন সংস্কৃতির চর্চা করলেই তা ইসলামী সংস্কৃতি হয়ে যায় না। তাই আরব, পারসিক, স্পেনীয় বা ভারতীয় রাজা বাদশাহদের বিলাসী জীবন, জৌলুসপূর্ণ দরবার ইসলামী সংস্কৃতির পর্যায়ে পড়ে না। তবে ইতিহাসের পরিক্রমায় মুসলিম জাতি বিভিন্ন সময়ে অপসংস্কৃতির বেড়া জালে জড়িয়ে পড়লেও ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভাবধারায় ফিরে আসার প্রচেষ্টা সব যুগেই লৰণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক. বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতির স্বরূপঃ

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা তথা ভারতবর্ষ বহিঃশক্তির নজর কেড়েছে। কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে এবং তারা এখানকার সমাজ ও সংস্কৃতিতে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেকে মনে করেন আর্যদের পরে সবচেয়ে বেশী এবং সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে ইসলাম তথা মুসলিমগণ[১]।

মুসলিমদের আগমনের পর থেকেই বাংলার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। বাংলা প্রাচীনকালে বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। এর একটি বিরাট অংশ হিন্দু-বৌদ্ধ রাজাদের শাসনাধীনে থাকলেও তারা নিজেদের 'বাংলার' শাসক হিসেবে পরিচয় দেয়ার চেয়ে 'গৌড়রাজ' হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশী গর্ববোধ করতেন। বখতিয়ার খলজির আগমনে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। তাবে বাণিজ্যিক কারণে বাংলায় মুসলিমদের আগমন ঘটে তারও আগে। ইলিয়াছ শাহ্ প্রথম বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহকে একত্রিত করে 'বাঙ্গালাহ' নাম দেন। এরপর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাঙলা নামে কোন অঞ্চলের যাত্রা শুরু হয়। মুসলিম শাসকদের অধীনে ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা, বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষা পরিতুষ্টি অর্জন করে। বহিরাগত ও স্থানীয় মুসলিমগণ বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে অন্যতম একটি অংশে পরিণত হয়। এর পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল-

এক. মুসলমানগণ এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং এখানকার সমাজ সংস্কৃতির সাথে মিশে এদেশীয় হয়ে ওঠে। ইংরেজদের মত সাময়িক মুনাফা সংগ্রহের নিমিত্তে তারা আসেনি। Khaleda Manzur-khuda বলেছেন-

---

১। গোলাম রাব্বানী, *উপনিবেশপূর্ব বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃ-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

"It is a most noteworthy fact that both the Muslim conquerors and the traders who arrived to settle in India severed ties with their original homelands. In spite of their monotheistic faith and different mores, those immigrant Muslims became part of Indian society." [২]

দুই. বিজয় সেনের কৌলীন্য প্রথা ও আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষ্পেষণে বাংলার নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী মুক্তির পথ খুঁজছিল। ইসলামের শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা, সহজ-সরল মতবাদ ও ভ্রাতৃত্ববোধকে তারা স্বাদরে গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মত বাংলায়ও ইসলাম নিরবে নিভৃতে গণজোয়ার এনেছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু তারানাথ ও কবি রামাই পন্ডিতের বর্ণনায় সেন রাজাদের অত্যাচার ও মুসলমানদেরকে মুক্তিদূত হিসেবে গ্রহণের বিষয়টি উঠে এসেছে। কবি রামাই পন্ডিত আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন,

"এমন কি দেবতারাও ব্রাহ্মণদের এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মুসলমান পয়গম্বর, সাধুপুরুষ, উলেমা ও ধর্মযোদ্ধা ইত্যাদিরূপে আগমন করলেন এবং ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ধূলিসাৎ করে দিলেন। অতঃপর, মুসলমানগণ নির্যাতিত মানুষদের উদ্ধার করলেন এবং তাদের এই উদ্ধার কার্যে সাধুপুরুষ ও উলেমাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।"[৩]

তিন. বাংলায় বাণিজ্যিক ও সামরিক কারণে মুসলমানদের আগমন ঘটলেও এখানে ইসলামের প্রসার ঘটেছে সুফী সাধকের মাধ্যমে। মুসলিম শাসকগণ ইসলাম প্রচারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা তেমন রাখেননি, তাদের ভূমিকা ছিল সহায়ক। মূলত:সুফি - সাধক, পীর, মাশায়েখ, ফকির

২। Khaleda Manzur-khuda, *Islam-The Formative Background of Bangladesh*, Academic Press and Publishers Library, June 2004, Dhaka-1209, p-6.

৩। রামাই পন্ডিত, শূন্যপুরাণ, উদ্বৃত: ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ-৬০।

দরবেশ প্রমুখ ধর্মপ্রচারকগণের দ্বারাই ভারতে ইসলামের প্রসার ঘটেছে। Dr. K. R. Qanungo বলেছেন "Bengal was not conquered by seventeen cavaliers of bakhtiar khilji, but by the Baro awliyas (the twelve legendary Sufi saints)." [৪]

জালালুদ্দীন তাব্রিজি, শাহ্ মাহীসওয়ার, শাহ্ মাখদুম, হযরত বদর শাহ্, শাহ্ জালাল এবং অন্যান্য সাধকেরা বাংলায় এসেছেন ইসলামের আলো নিয়ে এবং সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছেছেন। তাঁদের শিক্ষা ও সান্নিধ্যে স্থানীয়দের মধ্যে বড় একটি অংশ ধর্মান্তরিত হয়েছে। ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের ভাষায়- "একদিকে মুসলিম সেনাপতি ও সৈন্যরা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়াছেন, অন্যদিকে ঔলিয়া (আউলিয়া), দরবেশ ও আলিমগণ দলে দলে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন।"[৫] এ সময়ে বাংলায় যে সমস্ত দরবেশ ও আলিম প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গৌড়ের আখী সিরাজুদ্দীন (মৃত-১৩৫৭), পাভুয়ার শেখ আলাউল হক (মৃত-১৩৯৮) নূর কুতুব-উল-আলম (মৃত-১৪১৬), হুগলীর ফুরফুরাহর শাহ্ আনওয়ার কুলী হলবী (মৃত-১৩৭৫), রংপুরের শাহ্ ইসমাঈল গাজী (হত্যা-১৪৭৪), খুলনার খান জাহান (মৃত-১৪৫৮), সোনার গাঁয়ের হাজী বাবা সালিহ (মৃত-১৫০৬), শ্রী হট্টের শাহজালাল (মৃত-১০৯৬), চট্টগ্রামের শাহ্ মুহসীন আউলিয়া (মৃত-১৩৯৭) এবং পীর বদর (ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন), ত্রিপুরার রাস্তী শাহ্ (১৩৫১ হতে ১৩৮৮), গৌড়ে মৌলানা বরখুরদার (মৃত-১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে), দেবকোটের

৪। Quoted by Khaleda Manzur Khuda, Ibd, Academic Press and Publishers Library, June 2004, Dhaka 1209,PP-9.

৫। মুসলিম বাংলা সাহিত্য, *'মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী'*, প্রথম খন্ড, মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১, পৃ-২৩১।

মৌলানা আতা (১৩৫৫), রাজশাহীর মৌলানা শাহ্ দৌলা (জীবিত-১৫১৯), মুর্শিদাবাদে শাহ্ চাঁদ প্রকাশ দাদা পীর (১৪৯৩-১৫১৯), সপ্তগ্রামের সৈয়দ আমূলী (১৫৩১) প্রমুখ প্রধান[৬]।

চার. একদিকে ইসলামের উদারনৈতিক মনোভাব অন্যদিকে মুসলিম শাসকদের অসাম্প্রদায়িক নীতি বাংলা তথা ভারতে ইসলামকে ব্যাপক প্রসারতা দান করেছে। মুসলিম শাসকগণ উপমহাদেশে এসে বৈষয়িক জাহানদারী কায়েম করেছিলেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রজা পালনের মানসিকতা তাদের শাসনকালকে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ (১২০৪-১৭৫৭) বছরব্যাপী স্থায়ীত্ব দান করেছিল। Dr. K. R. Qanungo স্পষ্টভাবে বলেছেন-

"Islam did not seriously disturb the continuity of Indian culture. Islam never waged war against culture at any stage of its history in India or outside."[৭]

মুসলিমগণ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লেও বাংলায় দ্রুত বিস্তার লাভ করে, বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত আর্থিক নিগ্রহের স্বীকার পূর্ব বাংলায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই দ্রুত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পেছনে অনেকে ব্যাপক হারে ধর্মান্তরকরণকে দায়ী করলেও অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বাংলার মুসলমানদের দ্রুত জন্মহার।[৮] পশ্চিম বাংলায় মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করলেও দ্বিতীয় প্রধান জনগোষ্ঠীর মর্যাদা অর্জন করে। বাঙালী, তুর্কি, আফগান, ইরানি, আরবি প্রভৃতি নানা জাতির নানা দেশের মুসলিমগণ মিলে বাংলায় এক অভিনব সংস্কৃতির জন্ম দেয়-এ সংস্কৃতি সম্প্রীতির, উদারতার, বৈচিত্রের ও স্বাতন্ত্রের।

৬। পূর্বোক্ত, পৃ-২৩২।

৭। Dr. K. R Qanungo, *Islam and its Impact on India*, p-67; দ্রষ্টব্য: Khaleda Manzur Khuda, Ibd, p-9.

৮। বিস্তারিত দেখুন, ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, পৃ-৪৪-৪৫।

প্রথমত, বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে সম্প্রীতি ও উদারতার নিদর্শন স্বরূপ বলা যায়- বখতিয়ারের বাংলা বিজয় (১২০৪ খ্রীঃ) থেকে শুরু করে পলাশীর বিপর্যয় (১৭৫৭ খ্রীঃ) পর্যন্ত দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে শাসকের আসনে থেকেও এই জাতি বাংলার অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর সাথে সহমর্মিতা ও সহাবস্থানের অনন্য নজীর স্থাপন করেছিল। মাঝখানে বৃটিশদের ২০০ বছরের শাসনকালে Divide and Rule policy এর কারণে বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হলেও বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের বিভিন্ন পর্যায়ে মিলন প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বৃটিশরা চলে যাবার পর পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে ৪৭ ও ৭১ এর দূর্যোগময় পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমী কিছু ঘটনা ছাড়া বড় আকারে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা তেমন একটা হয় নি। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতেও বাংলদেশে স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় ছিল।

দ্বিতীয়ত, সম্প্রীতি ও উদারতার পাশাপাশি বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈচিত্র্য। বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতি বাঙালী, ইরানী, তুর্কী, আরবীয়, আফগান প্রভৃতি নানা জাতির সংস্কৃতিক উপাদানে সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় মিশ্র এক সংস্কৃতি। বাঙালী মুসলিমের পানাহার, বস্ত্র পরিধান, অতিথি আপ্যায়ন, আচার ব্যবহারের মধ্যে এ বিচিত্রতার প্রমাণ মেলে।

তৃতীয়ত, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলা ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। রাজধানী থেকে দূরে অবস্থান করায় ‘বাংলা’ সুলতানী ও মোগল আমলে নামকাওয়াস্তে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। সুলতান বা সম্রাট পূত্র থেকে শুরু করে যে প্রশাসকই বাংলায় এসেছেন তারা বাংলার এই ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বা প্রায় স্বাধীনভাবেই বাংলা শাসন করেছেন। বাংলার শাসকদের কেন্দ্রের প্রতি এই বিদ্রোহী মনোভাবের জন্যেই বাংলা ‘বলগাকপুর’ নামে পরিচিতি পেয়েছে।

খ. প্রাক বৃটিশ বাংলায় মুসলিমদের সাংস্কৃতিক অবস্থা

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলায় মুসলিম শাসন দুটি পর্বে বিভিক্ত ছিল-সুলতানী আমল ও মোগল আমল। সে অনুযায়ী বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতিও দুটি পর্বে আলোচনার দাবি রাখে।

এক. সুলতানী আমলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি:

বণিক শ্রেণী ও সুফী সাধকেরা বখতিয়ার খলজির আগমনের অনেক আগে থেকেই বাংলায় মুসলিম সংস্কৃতির বীজ বপনের কাজটি শুরু করে ছিলেন। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সে বীজটির অঙ্কুরোদগম হয়ে দ্রুত মহীরূহে পরিণত হয়। বখতিয়ার নদীয়া বিজয় সম্পন্ন করে মসজিদ ও খানকাহ নির্মানের কাজে হাত দেন। তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে তিনি অনেক মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তী শাসকেরাও এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন। Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan বলেছেন-

"The reulers, nobles and officers undoubtedly played an important part in the propagation of Islam and growth of the Muslim society by constructing mosques, Madrashas and dargahs promoting the Islamic spirit, patronizing Muslim scholars and saints, encouraging eduction and literature and performing benevolent activities" [৯]

ফলে মসজিদ ও খানকাহ কেন্দ্রিক ইসলামের প্রচার ও চর্চা মুসলিম সভ্যতার শিকড়কে বাংলার মাটিতে মজবুতি দান করেছে। বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হওয়ার কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। ১২০৪-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশ বছর মুসলিম সুলতানরা বাংলা শাসন করেছেন। এর মধ্যে ১২০৪-১৩৩৮খ্রিস্টাব্দ

৯। Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan, The sufis of Dhaka: A study of their role in historical context,(Unpublished Ph.D thesis) P-56, Dhaka Univeristy 2011.

পর্যন্ত দিল্লী সালতানাতের অধীনে বাংলা শাসিত হয়েছে এবং ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দী মুবারক শাহের ক্ষমতা গ্রহণের সময় থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দুশ বছর বাংলা দিল্লীর অধীনতা মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে শাসিত হয়েছে। এ সময়ে বাইরের প্রভাব মুক্ত হয়ে বাংলায় জাতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির রূপায়ণের ধারা শুরু হয়। সুলতানী আমলে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির চিত্র আঁকতে গেলে যে দিকগুলো উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয় তা হচ্ছে শাসকের উদার শাসন নীতি, সমাজের নিরাপদ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, বাংলার সমৃদ্ধ অর্থনীতি ও মানুষের স্বচ্ছল জীবন যাপন, নগর জীবনের বিকাশ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কলকারখানার বিস্তৃতি, বস্ত্রশিল্পের নিপুন কারিগরিতা, শিক্ষার গণমুখী বিস্তার, আলেম ওলামা ও সুফী সাধকের সাহসী পদচারণা প্রভৃতি। ইতিবাচক উপাদানের পাশাপাশি নেতিবাচক উপাদানও বিদ্যমান ছিল, যেমন-অসৎ উপায়ে হত্যাযজ্ঞের দ্বারা ক্ষমতারোহণ, বিদ্রোহীদের দমনে পাশবিকতার পরিচয়, রাজকীয় শান শওকতের পেছনে অগাধ অর্থ ব্যয় প্রভৃতি।

সুলতানদের শাসন প্রকৃতি:

বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাসে প্রজাপীড়নের দৃষ্টান্ত বিরল। দীর্ঘ সুলতানী আমলে বাংলায় মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে কোন গণআন্দোলনের কথা জানা যায় না। অভিজাত হিন্দুগণ মুসলিম শাসনকে মনে প্রাণে মেনে নিতে না পারলেও প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন নি। ব্যতিক্রম ঘটনা হিসেবে রাজা গণেশ ক্ষমতারোহণ করলেও তাকে সমকালীন জনমতের সাথে সমঝোতা করতে হয়েছে। বাংলার সাধারণ জনগণ মুসলিম শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিল। ঐ সময়ের অনেক হিন্দু কবি সাহিত্যিকের রচনায় মুসলিম শাসন ও সুলতানদের প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন রামাই পন্ডিতের 'শূন্যপুরাণ', বিজয় গুপ্তের 'মনসা মঙ্গল', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলার সুলতানী আমলের শাসন প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনকল্যাণ ও উদারতা। অনেক শাসক হত্যা বা নৃশংসতার দ্বারা ক্ষমতায় আরোহণ করলেও তারা ক্ষমতায় আরোহণের পর যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে শাসন করেছেন, জনকল্যাণে কাজ করেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' ও 'বুকাননের' বিবরণী থেকে ইলিয়াস শাহের অসৎ চরিত্রের বিবরণ দিয়ে বলেছেন "তবে রাজা হবার আগে ইলিয়াস যা'ই করে থাকুন না কেন, রাজা হবার পরে তিনি অসীম যোগ্যতার পরিচয় দেন।"[১০]

রিয়াজের বর্ণনায় এসেছে, হাবশী মালিক আন্দিল 'ফিরোজ শাহ' নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করে রাজকোষের অর্থ অকাতরে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। তার দানশীলতা সম্পর্কে রিয়াজে একটি চমৎকার কাহিনীর উল্লেখ আছে[১১]। প্রসঙ্গক্রমে ইলিয়াস শাহী বংশের গিয়াসুদ্দীনের কথা উল্লেখ করা যায়। সিংহাসন প্রাপ্তির পরে তিনি নিজের ক্ষমতাকে নিষ্কন্টক করতে বিমাতা ভাইদের অন্ধ করে দেন। অথচ তিনিই শিকার ধরতে গিয়ে ভুলবশত এক বিধবার পূত্রকে হত্যা করলে কাজীর আদেশে সাধারণ অপরাধীর মত দরবারে হাজির হয়ে কাজীর রায় মেনে নিয়েছিলেন[১২]। এ ঘটনাগুলো সত্য হলে বলতে হবে মধ্যযুগের বাংলার শাসকদের প্রজা সাধারণের প্রতি দায়িত্ববোধ ছিল, তাঁরা আইনের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল, স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরে থেকে দরবারী বিলাসিতায় গাঁ ডুবিয়েও তাঁরা প্রজা সাধারণের কথা ভুলে যান নি। গিয়াস উদ্দীন ইওজ খলজী লক্ষৌতি নগর ও শহরতলীকে বন্যা থেকে রক্ষার জন্য বহু বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করে দেবকোট ও লক্ষ্মৌ শহরকে সংযুক্ত করেছিলেন যা ছিল দশ দিনের পথ। হোসেন শাহ্ জনকল্যাণে বহু কূপ ও দিঘী খনন করেন। রিয়াজের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় বিভিন্ন স্থানে মসজিদ

১০। সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস* ১২০৪-১৫৭৬ (সুলতানি আমল), খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০১০, পৃ-২০৯।

১১। *রিয়াজ-উস-সালাতীন*, বঙ্গানুবাদ-আকবরউদ্দীন, অবসর প্রকাশ, ঢাকা ১১০০, ২০০৮, পৃ-৭৫।

১২। *রিয়াজ*, পৃ-৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

ও সরাইখানা তৈরি ও প্রতিষ্ঠা করেন এবং আউলিয়া ও দরবেশগণকে বহু দান খয়রাত করেন। তিনি নূর কুতব উল আলমের দরগাহের সরাইখানার জন্য কয়েকটি গ্রাম দান করেন[১৩]। আলাউদ্দীন হুসেন শাহের প্রধান উজির বলে কথিত জনৈক হামিদ খান বিভিন্ন স্থানে খাদ্যশালা, মসজিদ নির্মাণ ও দিঘী খননের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন[১৪]। জনকল্যাণের এমন অনেক উদাহরণ সুলতানী আমলে পাওয়া যাবে। বাংলার সুলতানদের সুখ্যাতি বহির্বিশ্বেও পৌছেছিল। গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ এবং জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ্ মক্কা ও মদিনায় মাদ্রাসা ও সরাইখানা স্থাপন ও খাল খনন করেন এবং সেখানকার মুসলমানদের জন্য উপহার প্রেরণ করেন।

বাংলায় মুসলিম শাসনের শুরু থেকে সুলতানগণ রাষ্ট্রের মজবুতি সাধনের জন্য মুসলিম সমাজ বিনির্মাণে যে কাজটি গুরুত্বের সাথে করে গেছেন তা হচ্ছে মসজিদ, মাদ্রাসা বা খানকাহ প্রতিষ্ঠার কাজ। সুলতানী আমলে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহ প্রায় সবই মসজিদ ও মাদ্রাসা সংক্রান্ত এবং কিছু ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে জমি দান সংক্রান্ত। বখতিয়ার খলজির বিজয়ের সময় থেকে বাংলায় মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়। মিনহাজের বর্ণনায় এসেছে লক্ষৌতিতে সরকারের সদর দফতর স্থাপন করার পর বখতিয়ার খলজি মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহ নির্মাণ করেন[১৫]। ইউজ খলজি বেশ কিছু জামে মসজিদ ও ছোট মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে স্বাধীন সুলতানদের আমলে মসজিদ নির্মাণ এবং সংস্কারের কাজটি জোরালোভাবে শুরু হয়। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন শিলালিপি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে[১৬]। সুলতানী আমলের গুরুত্বপূর্ণ মসজিদসমূহের মধ্যে পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, বাগেরহাটের খান-ই-জাহানের

১৩। *রিয়াজ*, পৃ-৭৮।

১৪। দৌলত উজির বাহরাম খান, *লাইলী মজনু*, সম্পাদিত-আহমদ শরীফ, ঢাকা ১৯৫৫।

১৫। উদ্বৃত –Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1956, P-40.

১৬। Journal of the Asiatic Society of Bengal, Caluctta, উদ্ধৃত-Abdul Karim, পূর্বোক্ত, P-40

মসজিদ, বাকেরগঞ্জের মসজিদবাড়ী মসজিদ, ত্রিবেনীতে জাফর খানের মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সুলতান সিকান্দর শাহ্ কর্তৃক নির্মিত পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ আয়তনের দিক দিয়ে ভারত উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ[১৭]। মসজিদ নির্মাণের কাজটি সুলতানগণ ধর্মীয় কর্তব্য মনে করেই করতেন। আবদুল করিমের মতে এই মসজিদসমূহ ছিল মুসলিম সমাজের স্নায়ুকেন্দ্র এবং মুসলিম সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি। প্রত্যেক শাসক, আলিম-ওলামা ও সুফি-সাধকগণের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। ইবনে বতুতা এর চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। ইবনে বতুতা যখন বাংলা ভ্রমণে আসেন তখন বাংলার সুলতান ছিলেন ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্। সুলতানের নির্দেশে দরবেশগণকে নদীতে চলাচলের সময় কোন কর দিতে হত না। দরবেশদের কোন খাবার না থাকলে সুলতানের পক্ষ থেকে খাবার দেয়া হত। ইবনে বতুতা ‘হাবাঙ্ক’ নামে একটি শহরের উল্লেখ করেছেন, যেখানে কোন দরবেশ এলে তাকে অর্থ সাহায্য করা হত[১৮]। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াছ শাহ্ শেখ আলাওল হকের সম্মানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন[১৯]। সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ্ শেখ জালাল তাব্রিজীর স্মরণে একটি দরগাহ্ নির্মাণ করেন[২০]। সিকান্দর শাহ্ দেবকোটে মওলানা আতার দরগাহে গম্ভুজবিশিষ্ট অট্রালিকা নির্মাণ করেন[২১]। সুলতানের কর্মচারীরাও সুফী সাধকদের সম্মানে মসজিদ ও সমাধি সৌধ নির্মাণ করেছেন।

১৭। Abdul Karim, পূর্বোক্ত, P-41

১৮। *ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনী*, ভাষান্তর খুররম হোসাইন, ক্যাবকো বিসিক শিল্পনগরী টাঙ্গাইল, ২০০০ইং, পৃ-১৬২-১৬৫।

১৯। Abdul Karim, P-41

২০। *রিয়াজ*, পৃ-৬১।

২১। Abdul Karim, P-42

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি সুলতানগণ শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। প্রয়োজন বোধে এসব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাদের ধর্মীয় কর্তব্যবোধ থেকেই রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করতেন বা সুলতানদের পরামর্শ দিতেন। এতে অনেক সময় মত পার্থক্যের কারণে সুলতানদের সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটত। সিকান্দর শাহ্ শেখ আলাওল হককে পান্ডুয়া থেকে বহিষ্কার করে সোনারগাঁওয়ে নির্বাসন দিয়েছিলেন। সুলতান রুকনউদ্দীন বরবক শাহের আদেশে শাহ্ ইসমাইল গাজীকে প্রাণদন্ড দেয়া হয়। তবে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে সুলতানদের দিক-নির্দেশনামূলক পরামর্শ দিতেন, ক্ষমতা লাভ বা প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার তাদের উদ্দেশ্য ছিলনা।

সুলতানাতের দুঃসময়ে এসে নূর কুতব উল আলমের দৃঢ় ভূমিকা সমস্যার উত্তরণ ঘটিয়েছে। মোজাফফর শামস বখলীর গিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে লেখা কয়েকটি চিঠি পাওয়া গেছে। চিঠিগুলোতে সুলতানকে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে বিভিন্ন পরামর্শ এবং সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে[২২]।

সুলতানগণ ধর্মনিষ্ঠ হলেও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তারা অন্য ধর্মাবলম্বী পুরোহিত পাদ্রীদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করতেন। নারী, শিশু ও ধর্মীয় প্রধানদের জিজিয়ার আওতামুক্ত রাখা হত। ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ছিল। মুসলিম সুলতানদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ফলেই নবদ্বীপ সংস্কৃত তথা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

২২। Journal of the Bihar Research Society, Vol-XLII, Part II, 1956, P-2; দ্রষ্টব্যঃ Abdul Karim, P-51.

শিৰা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

"পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তের পিন্ড হতে।

পড়, আর তোমার রব্ব বড়ই অনুগ্রহশীল,

যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন।

মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানত না।"[২৩]

কুরআনের প্রথম বাণী অবতীর্ণ হয় বিদ্যা শিক্ষার নির্দেশনা দিয়ে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রত্যেক নর-নারীর জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজ বলে ঘোষণা করেছেন[২৪]। এ কারণে মুসলিম ইতিহাসের শুরু থেকে বিদ্যা শিক্ষার প্রতি মুসলিমদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

মদিনা মসজিদে আহলে সুফফার অবিরত জ্ঞান সাধনা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাগদাদ, কর্ডোভা, কায়রো জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুসলিমগণ শুধু ধর্মীয় জ্ঞান চর্চায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন করেছেন। খিলাফতের পতনকালে বাংলা সালতানাতের প্রতিষ্ঠা। শিক্ষা-দীক্ষায় কায়রো বা কর্ডোভার মত বাংলার সমৃদ্ধি হয় নি। এরপরও মুসলিম সভ্যতার উত্তরসূরী হিসেবে বাংলা সালাতানাতেও শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। শিক্ষা কার্যক্রমে সুলতানগণ যেমন পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন, তেমনি ব্যক্তি উদ্যোগেও পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়েছে। তবে বাংলায় ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান চর্চাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

২৩। আল্ কুরআন: সূরা আল্ আলাক, আয়াতঃ ১-৫।

২৪। ইবনে মাজাহ, উদ্ধৃত: *আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব* (হাদীস সংকলন), প্রথম খণ্ড, অনুবাদ: হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারৰক, হাসনা প্রকাশনী, ঢাকা-১০০০, জুন ২০০৪, পৃ-৬৭।

সুলতানী আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। ঐ সময়ের মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রায় সবই ধ্বংস হয়েছে। সৌভাগ্যবশত কিছু শিলালিপি আবিস্কৃত হওয়ায় আমরা কয়েকটি মাদ্রাসার অস্তিত্বের কথা জানতে পারি। মাদ্রাসাগুলির মধ্যে বর্তমান রাজশাহী জেলার অন্তর্গত মাহিসুনে মৌলানা তকী-উদ-দীন আরবীর মাদ্রাসা প্রাচীনতম। ড. আবদুল করিম তার নামের শেষে ‘আরবী’ উপাধী দেখে ধারণা করেছেন যে তিনি আরবের অধিবাসী[২৫]। এরপর উল্লেখ করা যায় সোনারগাঁও মাদ্রাসার কথা। মৌলানা শায়খ শরফ-উদ-দীন আবু তওয়ামা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

সুলতান রুকন উদ্দীন কাইকাউসের সময়ে ৬৯৮ হিজরীর (১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) শিলালিপি থেকে পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়[২৬]। একই স্থানে প্রাপ্ত ৭১৩ হিজরীতে (১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরুজ শাহের সময়ে উৎকীর্ণ আর একটি শিলালিপিতেও একটি মাদ্রাসা স্থাপনের কথা উল্লেখ আছে[২৭] সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহের সময়ে ৮৩৫ হিজরীর (১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ) সুলতানগঞ্জ শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু শিলালিপির ভাষা দেখে আধুনিক পন্ডিতগণ মনে করেন যে, এই মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসাও ছিল[২৮]। হোসেন শাহের সময়ে দরসবাড়ি থেকে প্রাপ্ত ৯০৭ হিজরী (১৫০১ খ্রিঃ) ও ৯০৯ হিজরীর (১৫০৩ খ্রিঃ) দুটি শিলালিপি থেকে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়।

২৫। আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ-২২৫

২৬। Shamsu-ud-din Ahmad: *Inscriptions of Bengal*, vol- IV, Pp.18-21, উদ্ধৃতঃ আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ-২২৫।

২৭। আবদুল করিম,পূর্বোক্ত, পৃ-২২৫।

২৮। Journal of the Asiatic Society of Pakistan, vol, Vlll. No.1, 1963, P355-66, দ্রষ্টব্যঃ আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ-২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

Charls Stewart এর বিবরণ থেকে শায়খ নূর কুতুব-উল-আলমের একটি মাদ্রাসার কথা জানা যায়, যে মাদ্রাসার জন্য হোসেন শাহ্ ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন[২৯]। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে আগত মোগল পরিব্রাজক আবদুল লতিফের বিবরণে রাজশাহীর বাঘা নামক স্থানে হাওয়াদা মিয়া কর্তৃক পরিচালিত একটি মাদ্রাসার কথা জানা যায়[৩০]। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এটি সুলতানী আমলের সর্বশেষ মাদ্রাসা। কায়কাউসের শিলালিপি, জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহে্র সুলতানগঞ্জ শিলালিপি ও হোসেন শাহের শিলালিপিতে বিদ্যা শিক্ষা করাকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং আলিম ও বিদ্যা অন্বেষণকারীদের জন্য অর্থ ব্যয়কে মহা পুণ্যের কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে[৩১]।

সুলতানী আমলে মাদ্রাসার সাথে একটা religious complex গড়ে উঠত। মসজিদ, খানকাহ্, মাজার, সরাই বা মুসাফির খানা এবং লঙ্গরখানা প্রভৃতি নিয়ে Complex গড়ে উঠত। সৈয়দ, আলিম, ওলামা এবং সুফিগণ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন বেশী, কারণ শিক্ষাদান তাদের কাছে প্রধান কর্তব্য বলে মনে হত। সুফিগণ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে খানকাহ তৈরী করতেন, কারণ শরীয়ত শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে তারা তরীকত, মারেফাতও শিক্ষা দিতেন। বিশিষ্ট আলেম এবং সুফিগণের মাজারও অনেক সময় একই Complex এ থাকত। ত্রিবেণীতে জাফর খানের মাদ্রাসার স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং মাজার এই তিন নিয়ে Complex গড়ে উঠে। সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহের মাদ্রাসাও মসজিদ সংলগ্ন ছিল বলে আবদুল করিম ধারণা করেছেন।

২৯। Charls Stewart: *History of Bengal,* Calcutta, 1813, P-129, দ্রষ্টব্যঃ আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ-২২৫।

৩০। আব্দুল করিম,পূর্বোক্ত, পৃ-২০।

৩১। এ.কে.এম. শাহনেওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ-১৬৭।

নূর কুতব উল আলমের মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিদ আলি খান ধারণা করেছেন যে, মাদ্রাসার সাথে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান যুক্ত ছিল[৩২]। বাঘার হাওয়াদা মিয়ার মসজিদের কাছে নসরত শাহ্ একটি শাহী মসজিদ নির্মাণ করেন। তাছাড়া মৌলানা শাহ্ দৌলাহ এবং তার পূত্র মৌলানা হামিদ দানিশমান্দ এর মাজারও এখানে অবস্থিত ছিল। ফলে বাঘাতেও একটি Religious Complex বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমষ্টি গড়ে উঠেছিল[৩৩]।

সব মাদ্রাসাই আবাসিক ছিল। শিক্ষক, ছাত্র কর্মচারী সবার ব্যয় নির্বাহ করত মাদ্রাসা ফান্ড। 'মকতুবাদ-ই-সদী' তে বর্ণিত ইয়াহিয়া মানেরীর জীবনের একটি ঘটনা থেকে জানা যায় যে আবু তওয়ামার মাদ্রারাসা ছিল আবাসিক। ঘটনাটির সারসংক্ষেপ হচ্ছে মাদ্রাসায় সকল ছাত্রের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা একসাথে ছিল। এতে সময়ের অপচয় হওয়ায় মানেরি একসাথে খাওয়া ছেড়ে দিলেন। ফলে তাঁকে প্রায়ই না খেয়ে থাকতে হত। এ কথা জানতে পেরে তাঁর শিক্ষক ভিন্নভাবে তাঁর খাবার ব্যবস্থা করেন[৩৪]। জাফর খানের মাদ্রাসা আবাসিক হওয়ার প্রমাণ শিলালিপিতেই আছে। লিপির ভাষ্য অনুযায়ী আহল-উল-ফজল বা মাদ্রাসার সকল শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীর জীবিকার ব্যবস্থার জন্য কাজী নাসির তার সম্পদ ব্যয় করেছিলেন। তাছাড়া মাদ্রাসাকে দার-উল-খয়রাত এবং বিনা-উল-খাইর বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক আবিস্কৃত হোসেন শাহের মাদ্রাসার গঠন প্রণালী থেকে মাদ্রাসাটি আবাসিক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়[৩৫]।

৩২। Abdil Ali Khan, *Memoirs of Gaur and Pandaa*, P-48, দ্রষ্টব্যঃ আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩০।

৩৩। উদ্ধৃত আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩০-২৩২।

৩৪। আবদুল করিম, ঐ, পৃ-২৩২।

৩৫। *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, vol- XXIV-XXVI, 1979-81, Pp-27-30।

Dhaka University Institutional Repository

হাওয়াদা মিয়ার বাঘা মাদ্রাসাও আবাসিক ছিল। আবদুল লতিফের বিবরণ থেকে মসজিদ, মাদ্রাসা, পুকুর ও থাকার ঘরের কথা জানা যায়। এই মাদ্রাসা ছিল মাটির তৈরী কিন্তু অনেক বড় আকৃতির। ইংরেজ আমল পর্যন্ত এই মাদ্রাসা চালু ছিল। গৌড়ের সুলতান এবং পরবর্তীতে মোগল সম্রাট শাহজাহান এই মাদ্রাসায় ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলে[৩৬]। সুলতানী আমলের মাদ্রাসা ও মসজিদ সমূহের গঠন কাঠামোতে পরিকল্পনা ও সুরুচির পরিচয় মেলে এবং সে আমলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

সুলতানী আমলে শিক্ষক ও আলিম-ওলামাগণ সমাজে অনেক শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জাফর খান ও হোসেন শাহের শিলালিপি থেকে সমাজে আলিমগণের উচ্চ মর্যাদা লাভের কথা জানা যায়। সৈয়দ, আলিম, সুফি প্রমুখ আহল-ই-খাইর, আহল উল-ফজল, আহল-ই-সাদাত বা আহল-ই-কলম নামে পরিচিত ছিলেন। মিনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাত-ই-নাসিরি'তে আলিম সম্প্রদায়কে বৃত্তি বা ভাতা, যা মদদ-ই-মা'শ নামে পরিচিত, দেয়ার কথা বলা হয়েছে । সুলতানগণ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের জন্য তাঁদের শরণাপন্ন হতেন। সদর, সদর-উস-সুদূর, কাজী, শায়খ-উল-ইসলাম, শিক্ষকতা, ইমামত এবং খিতাবতের সমুদয় পদ তাঁরাই অধিকার করতেন।

৩৬। আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ-২০-২৩।

পাঠ্যসূচী:

সুলতানী আমলে বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচী সমন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে জাফর খান ও হোসেন শাহের শিলালিপি থেকে 'এলম-ই-দীন' বা 'এলম-ই-শরা' শিক্ষা দেয়ার কথা জানা যায়। আবদুল করিম বলেছেন-

"যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হত বা বর্তমানেও পড়ানো হয়, সেগুলি হচ্ছে এলম-ই-তফসীর, এলম-ই-হাদীস, ফিকাহ্, উসুল-উল-ফিকাহ্, তসওফ, আদব বা সাহিত্য, নোহ্, ছরফ, কালাম, মুনতিক ইত্যাদি। এলম-ই-দীন বা এলম-ই-শরা এই সমুদয় বিষয়কেই বুঝায়। উচ্চতর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান বুঝার জন্য ভাষাজ্ঞানও অপরিহার্য ছিল। এই জন্য আদব, নোহ্, ছরফ বা বলাগত, ফছাহত ইত্যাদিও অবশ্য পাঠ্য ছিল[৩৭]"।

সুলতানী আমলের শিক্ষা কার্যক্রমে ধর্মীয় এবং ভাষা ও সাহিত্য ভিত্তিক শিক্ষার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন ও পরকালীন কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন এবং ধর্মপ্রচারকগণই প্রথম বাংলায় এসে জ্ঞানদান কার্যক্রম শুরু করেন। এ কারণেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আর বিচার ব্যবস্থা ইসলামী আইন ভিত্তিক হওয়ায় কাজী, মুফতি পদের জন্য কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জন ছিল অপরিহার্য। অন্যদিকে ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য ভাষা শিক্ষাও একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ছিল।

৩৭। আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৫; দ্রষ্টব্যঃ K.A. Nizami, *Some Aspects of Religion and politics in the Thirteenth Century*, P-151.

কাব্য, সাহিত্য (আদব), দর্শন (কালাম), যুক্তিবিদ্যা (মান্তেক) প্রভৃতি মানবিক বিষয়ে বাংলার মুসলিমদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তবে সমর বিদ্যার চর্চাও ছিল। মুসলিম পন্ডিতগণ ধনুর্বিদ্যা বিষয়ে 'হিদায়েৎ-উর-রামী' নামে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন[৩৮]।

বাংলায় ধর্মতত্ত্ব, ইসলামী আইন ও মানবিক বিষয়ে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হলেও বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান চর্চার বিবরণ আমাদের হাতে আসে নি। শুধু Stewart এর বিবরণে নূর কুতুব-উল-আলমের মাদ্রাসার পাশে একটি চিকিৎসালয়ের কথা জানা যায়। মুসলিম সালাতানাতের একটি অংশ হয়েও বাঙলা কেন বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভার মত জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে নি তা গবেষণার দাবি রাখে।

আলিমগণ মদদ-ই-মা'শ লাভের কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট স্বচ্ছল ছিলেন। এই বৃত্তি লাভের জন্য আলিমগণ শাসকের কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী হতেন না, বরং শাসকগণই আলিম সমাজকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার মাধ্যমে নিজেদের কৃতার্থ মনে করতেন। ফলে শিক্ষা ও গবেষণা কাজে আলিমগণ ছিলেন স্বাধীন। কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই শিক্ষকরা ছাত্রদের সঠিকভাবে মুল্যায়ন করতে পারতেন। ফলে বর্তমানের মত অনিয়ম বা দূর্নীতি কোন অবকাশ ছিল না।

৩৮। Abdul Karim, '*Social History of The Muslims in Begnal* (Down To A. D. 1538)', The Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1959, P-82

প্রাথমিক শিক্ষা:

মুসলিম শাসনের শুরু থেকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মুসলিমগণ তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়া অপরিহার্য মনে করতেন এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনেও শিক্ষা দেয়া হত। যেখানেই মুসলিম বসতি ছিল সেখানেই মসজিদ বা মক্তব কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু ছিল। কবি মুকুন্দরাম তার চন্ডীকাব্যে মক্তবের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে ধর্মপ্রাণ মৌলভীগণ শিক্ষা দান করতেন[৩৯]।

কবি মুকন্দরাম ও কবি বাহরামের (লাইলী মজনু) বর্ণনা থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক পর্যায়ে সহশিক্ষা চালু ছিল। চার বছর চার মাস চার দিন বয়স হলে আনুষ্ঠানিকভাবে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা শুরু করা ছিল মুসলিমদের একটি রীতি। এই অনুষ্ঠান 'বিসমিল্লাহ্‌খানি' নামে পরিচিত ছিল। নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষক কুরআনের একটি নির্বাচিত আয়াত তেলাওয়াত করতেন এবং শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশুর শিক্ষাজীবন শুরু হত[৪০]।

হিন্দু শ্রেণীর কায়স্থগণ মুসলিমদের 'বিসমিল্লাহ্‌খানি' অনুষ্ঠান গ্রহণ করেন এবং তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দান করার সময় মৌলভি দ্বারা এই অনুষ্ঠান করতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা ও ধর্মীয় মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দেয়া হত। কবি বিপ্রদাসের বর্ণনায় এসেছে, মুসলিম ছেলে মেয়েদেরকে মক্তবে নামাজ পড়া ও ওজু করা শিখানো হত। আরবী, ফার্সি, বাংলা তিনটি ভাষায় শিক্ষা দেয়া হত।

৩৯। ড. এম.এ রহিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ-২৪৪
৪০। পূর্বোক্ত, পৃ-২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষা:

সুলতানী আমলে প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষা প্রচলিত ছিল। মেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ছিল সীমাবদ্ধ। মুহম্মদ কাসিম ফিরিস্তার মতে, মালবরাজ সুলতান গিয়াসুদ্দিনের হারেমে (১৪৬৯-১৫০০ খ্রিঃ) পনের হাজার রমণী ছিলেন এবং এদের মধ্যে বহু শিক্ষয়িত্রী, গায়িকা ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী মহিলা ছিলেন[৪১]। হারেমের মেয়েদের শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী রাখা হয়েছিল। অভিজাত ও অবস্থা সম্পন্ন মুসলিমরা গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। হাসানহাটির জনৈক কাজীর স্ত্রী হিন্দু শাস্ত্রে খুবই পারদর্শী ছিলেন[৪২]। 'গদাই মল্লিকার পুঁথি' বা 'মল্লিকার হাজার সওয়াল' নামক কাব্য থেকে জানা যায় মল্লিকা নামে একটি মুসলিম বালিকা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেছিল।

কাগজের ব্যবহার:

মুসলিমরাই বাংলায় প্রথম কাগজের ব্যবহার শুরু করে। চীনা রাষ্ট্রদূত ও লেখক মাহুয়ান বাঙালীদের কাগজ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন-তারা হরিণের চামড়ার মতো তেলতেলে মসৃণ এক ধরণের সাদা কাগজ গাছের ছাল থেকে তৈরী করতো[৪৩]। গোবিন্দ চন্দ্র রাজার গানে লেখার বস্তু হিসেবে কাগজের উল্লেখ দেখা যায়[৪৪]। বই-পুস্তক, দলিল-পত্রাদি এবং নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজে কাগজের ব্যবহার হত। কাগজের প্রচলন শিক্ষার প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪১। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত (১ম খন্ড), পৃ-১৭৮।

৪২। বিজয়গুপ্ত, *পদ্মপুরান*, পৃ-৫৬; উদ্ধৃত: ড. এম.এ. রহিম, ঐ, পৃ-১৭৮।

৪৩। Mahuan's Accounts; N.K. Vattasali: *Coins and Cronology*, P-171; ড. এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৪।

৪৪। পূর্বোক্ত, পৃ-১৮৪ ।

বাংলায় মুসিলমগণই প্রথম পুস্তক নকল করে প্রচারের রীতি প্রবর্তন করেন। J. N. Sarkar বলেন, যখন প্রথম যুগের হিন্দু লেখকগণ সাধারণ রীতি অনুসারে তাদের রচিত পুস্তকাদি গোপন রাখতে ভালবাসতেন, সেই যুগে পুস্তক নকল করার এবং তা প্রচারের দ্বারা জ্ঞান প্রথা প্রচলনের জন্য আমরা মুসলমানদের নিকট ঋণী[৪৫]।

বাংলা ভাষার বিকাশ ও সাহিত্য চর্চাঃ

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলা ভাষা আদিমস্তরে ছিল এবং এর সুনির্দিষ্ট কোন কাঠামো ছিল না। নীচু শ্রেণীর মুখের ভাষা হিসেবে বাংলা ছিল অবহেলিত এবং রাজদরবারে এর কোন ঠাঁই ছিল না। সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃতের জয়-জয়কারে বাংলা ভাষা চাপা পড়ে যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে বাংলার নীচু শ্রেণীর মানুষের লেখা পড়ার কোন অধিকার ছিল না, এ কারণে বাংলা ভাষা সংগঠিত হতে পারে নি। অল্প সংখ্যক কিছু বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য এর চর্চা করেছিলেন এবং আর্যদের কথ্য ভাষার সাথে স্থানীয়দের ভাষার সংমিশ্রণে গৌড়ীয় প্রাকৃত ভাষায় 'চর্যাপদ' রচনা করেন। এই চর্যাপদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই ভাষা বুঝত না। এটি শুধু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদেরই বোধগম্য ছিল[৪৬]।

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয়দের প্রতি শাসকের উদার ও সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, স্থানীয়দের সংস্কৃতিকে জানার প্রচেষ্টা বাংলা ভাষার বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে। মুসলিম সুলতানদের অধীনে পুরো বাংলা অঞ্চল একটি প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত হবার পর এখানকার ভাষা-সংস্কৃতিও বিশেষ মর্যাদা পেয়ে নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। শাসকেরা শাসিতের সমর্থন আদায়ে তাদের সমন্ধে জানার চেষ্টা করেছেন এবং নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন।

৪৫। J.N. Sarkar *'India Through the Ages'*, P-52; ড. এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ-১৮৬।
৪৬। ড. এম. এ. রহিম, পৃ-১৯৮।

এছাড়া যেসব আলিম-ওলামা, সুফি-সাধক ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন তাঁরা তাঁদের বাণীকে স্থানীয়দের বোধগম্য করার জন্য স্থানীয়দের ভাষা শিখেছেন এবং সে ভাষাতেই প্রচারকার্য চালিয়েছেন।

এভাবে মুসলিম শাসনামলে বাংলার ব্যাপক চর্চা শুরু হয় এবং এই ভাষা এক সময় রাজদরবারেও স্থান করে নেয়। কালের বিবর্তনে জ্ঞাতী ভাষা আরবী ও ফার্সিকে ছাপিয়ে বাংলা একদিন বাঙালী মুসলিমদের প্রধান ভাষায় পরিণত হয়। মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষা কেবল অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সংগঠিতই হয়নি, সমৃদ্ধশালী দুটি ভাষা আরবী ও ফার্সির সংমিশ্রণে বাংলা ভাষার ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হয়েছে। মুসলিম শাসকদের বরাবরই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি দুর্বলতা ছিল। ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবীকে মর্যাদা দেয়া হত, পাশাপাশি রাজকার্যে ফার্সি ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষাও মুসলিমদের দৃষ্টির বাইরে ছিল না। তাই আরবী-ফার্সির পাশাপাশি বাংলাও শাসকের উদার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। ধর্মান্তরিত মুসলিমগণ ধর্মীয় ইবাদতে আরবী, রাজকার্যে অংশগ্রহণের জন্য ফার্সির ব্যবহার শিখলেও তারা দৈনন্দিন জীবনে মাতৃভাষা ব্যবহার করতেন। অন্য দিকে অভিবাসী মুসলিমগণ দীর্ঘদিনের ব্যবধানে স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েন। ফলে মুসলিম শাসনামলে বাংলা একটি শক্তিশালী প্রচলিত ভাষায় রূপ লাভ করে। পঞ্চম শতাব্দীতে চীনা পর্যটক মাহুয়ান তার বিবরণীতে সার্বজনীন ভাবে বাংলায় ব্যবহৃত দুটি ভাষার উল্লেখ করেছেন-পাং-কি-লী (বাংলা) ও পা-এন-সি (ফার্সি)[৪৭]।

৪৭। Visva-Bharati Annals, 1945, Vol-1, P-117; Abdul Karim, ‘*Social History of The Muslims in Bengal* (Down To A. D. 1538)’, The Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1959, P-176.

Dhaka University Institutional Repository

অভিবাসীদের বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং বাঙালী হয়ে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত ছিল শেখ আসাদ লাহোরীর পরিবার। বাংলায় এ পরিবারের দীর্ঘ বসবাসের ফলে শেখ আলা উল হক এবং নূর কুতব উল আলমের নামের সঙ্গে বাঙালী উপাধীটি যুক্ত হয়েছিল[৪৮]।

মুসলিম শাসনামলে সুলতানগণ উদার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনে অবদান রেখেছেন। ভাষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রিঃ) বিখ্যাত ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ও কবিদের প্রতিভার স্বীকৃতি দিতেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় কবি শাহ্ মুহাম্মদ সগীর তার বিখ্যাত কাব্য ‘ইউসুফ জুলেখা’ রচনা করেন। ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বনে এটি রচিত হলেও কুরআন বর্ণিত ঘটনার আলোকে এর ঐতিহাসিক সত্যতা পাওয়া যায় না। কিন্তু সাহিত্যাঙ্গনে এটি আলোড়ন তোলে এবং নতুন ধারা সংযোজন করে। মুসলিম শাসনামলে কবি কৃত্তিবাস গৌড়ের জনৈক শাসনকর্তার পৃষ্ঠপোষকতায় ‘রামায়ণ’ কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন। এই কাব্যে শাসকের নাম উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু কাব্যে গৌড় রাজদরবারের বর্ণনা , একজন হিন্দু সভাসদের ‘খান’ উপাধী গ্রহণ ও দরবারের আদব কায়দা থেকে ধারণা করা হয় কৃত্তিবাস রাজা কংসের আদেশে কাব্য গ্রন্থটি রচনা করেন[৪৯]।

সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিঃ) এর পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু ভগবত গীতার বাংলা অনুবাদ করেন। তার ছেলে সুলতানের কাছ থেকে ‘সত্যরাজখান’ উপাধী লাভ করেন[৫০]।

৪৮। *Akhbar Al-Akhyar*, P-143; Abdul Karim, ibd, P-177.
৪৯। দীনেশ চন্দ্র সেন-*কৃত্তিবাসের রামায়ন*, ভূমিকা, পৃ-২; আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৯।
৫০। মুসলিম বাংলা সাহিত্য, *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ-২৭৫।

ঐতিহাসিকগণ সুলতান হোসেন শাহের আমলকে (১৪৯৩-১৫১৭) বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও সুখময় মুখোপধ্যায় তা পুরোপুরি মানতে নারাজ, তবে হোসেন শাহ্ ও তার উত্তরাধিকারীদের সময়ে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষের নানা প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' এবং বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' কাব্য হোসেন শাহের আমলে রচিত। বিজয়গুপ্ত হোসেন শাহের মহানুভবতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। হোসেন শাহের সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় তার সভা কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের অনেকাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। কবি পরমেশ্বর পরাগল খানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন[৫১]।পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের, যিনিও চট্টগ্রামের শাসনকর্তার পদ অলংকৃত করেছিলেন, পৃষ্ঠপোষকতায় তার সভাকবি শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব বাংলায় অনুবাদ করেন[৫২]। হোসেন শাহের উত্তরাধিকারীগণও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার ধারা চালু রাখেন। তার পুত্র নসরত শাহের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামে অন্য আর একজন কবি মহাভারত অনুবাদ করেন[৫৩]। শ্রীধর নামক একজন প্রতিভাবান কবি নুসরত শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় 'বিদ্যাসুন্দর' নামে একটি রম্য রচনা করেন। মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈদিক ধর্মগ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুদিত হয়ে সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়ে ওঠে এবং বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

৫১। শ্রী সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ-২০০৯।

৫২। শ্রী সুকুমার সেন, ঐ, পৃ-২১১।

৫৩। দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, পৃ-৮২; ড. এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২০০।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানী আমলের কবিদের রচিত উল্লেখযোগ্য রচনাবলী[৫৪]-

১. কানা হরিদত্ত, 'মনসামঙ্গল'। ত্রয়োদশ শতকের কবি।

২. রামাই পণ্ডিত, 'শূন্যপুরাণ'। এটি চতুর্দশ শতকে রচিত বলে মনে করা হয়।

৩. চন্ডীদাস, 'পদাবলী'। ইনি সুলতান শামসউদ্দিন আহম্মদ শাহের (১৪৩১-৪২ খ্রিঃ) সমসাময়িক।

৪. বিদ্যাপতি, পদাবলী। চন্ডীদাসের সমসাময়িক এবং মিথিলা ভাষার কবি। বাংলার সাথে মিথিলার ভাষাগত মিলের জন্য বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি মনে করা হয়।

৫. কৃত্তিবাস, রামায়ণ। রাজা কংস এবং জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহের সমসাময়িক।

৬. মালাধর বসু, 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'। ইলিয়াস শাহী বংশের শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-৮১ খ্রিঃ) সমসাময়িক।

৭. ধ্রুবানন্দ মিশ্র, 'মহাবংশাবলী'। এ গ্রন্থটি শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের সময়ে রচিত।

৮. বিজয়গুপ্ত, 'পদ্মপুরাণ'। হোসেন শাহের সময়ে রচিত।

৯. বিপ্রদাস, মনসামঙ্গল ও মনসা-বিজয়। গ্রন্থদুটি হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত।

১০. দ্বিজ জনার্দন, চন্ডীর উপ্যাখ্যান। হোসেন শাহের সমসাময়িক।

১১. যশোরাজ খান, শ্রীকৃষ্ণ বিজয়। হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন।

১২. কবীন্দ্র পরমেশ্বর, মহাভারত। হোসেন শাহের আমলে লিখিত।

১৩. কবি কঙ্ক, বিদ্যাসুন্দর কাব্য। হোসেন শাহের সময়ে রচিত।

৫৪। ড. এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ-২০৮-২১১। দ্রষ্টব্য, এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য; দীনেশচন্দ্র সেন-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. শ্রীকর নন্দী, মহাভারত। নুসরত শাহের সময়ে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছুটি খানের আদেশে রচিত।

১৫. কবি শেখর, 'পদাবলী'। হোসেন শাহ্ ও নুসরত শাহের কর্মচারী।

১৬. শ্রীধর, 'বিদ্যাসুন্দর'। নুসরত শাহের সময়ে যুবরাজ ফিরুজ শাহের আদেশে রচিত।

১৭. দ্বিজ অনন্ত, 'রামায়ণ'। তিনি পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচনা করেন।

১৮. বৃন্দাবন দাস, 'চৈতন্য ভাগবত'।

১৯. লোচন দাস, 'চৈতন্যমঙ্গল', ১৫৩৮ খ্রিঃ রচিত।

২০. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। শ্রী চৈতন্যের সমসাময়িক।

২১. জয়ানন্দ, 'চৈতন্যমঙ্গল'।

২২. ষষ্ঠিধর সেন, 'মনসামঙ্গল'। কবি ষোড়শ শতকের শেষদিকে জীবিত ছিলেন।

২৩. দ্বিজ বংশীবদন, 'মনসামঙ্গল'। ১৫৭৫ সালে এটি রচিত হয়।

২৪. চন্দ্রবতী, 'মনসামঙ্গল'। ইনি বংশীবদনের কন্যা।

২৫. মুক্তারাম সেন, 'সারদামঙ্গল'। এটি ১৫৪৭ খ্রিঃ রচিত হয়।

২৬. রামচন্দ্র খান, 'মহাভারত'। ১৫৫০ খ্রিঃ রচিত হয় ।

২৭. রঘুনাথ পন্ডিত, 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী'। ১৫৭০ খ্রিঃ রচিত।

২৮. মাধবাচার্য,'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল', 'গঙ্গামঙ্গল' ও 'চন্ডীমঙ্গল'। ১৫৭০-১৫৭৯ খ্রিঃ মধ্যে রচিত।

২৯. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, 'চন্ডীমঙ্গল কাব্য'। 'কবিকঙ্কন' উপাধিধারী বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে এই কাব্য রচনা করেন।

৩০. দ্বিজ হরিরাম, 'চন্ডীকাব্য'। ষোড়শ শতকের শেষপাদে রচিত।

৩১. নরহরি চক্রবর্তী, 'ভক্তি রত্নাকর' ও 'নরোত্তম-বিলাস'।

Dhaka University Institutional Repository

৩২. নিত্যানন্দ দাস, 'প্রেম-বিলাস'।

৩৩. লোকনাথ দাস, সীতাচরিত্র।

৩৪. জ্ঞানদাস, 'বৈষ্ণব পদাবলী'।

৩৫. গোবিন্দ দাস, কড়চা।

মুসলিম কবি সাহিত্যকগণও পিছিয়ে ছিলেন না। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় তারাও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। সুলতানী আমলে মুসলিম কবিদের রচিত বেশ কিছু কাব্যগ্রন্থ[৫৫]-

১. কবি শাহ্ মুহাম্মদ সগীর-ইউসুফ জুলেখা।

২. কবি ফয়জুল্লাহ্- (ক) গোরক্ষ বিজয়, (খ) গাজী বিজয়, (গ) সত্যপীর পাঁচালী, (ঘ) জয়নালের চৌতিষা ও (ঙ) রাগমালা।

৩. কবি আফজল আলী- নসিহত- নামা

৪. কবি জৈনুদ্দিন- (ক) রসূল বিজয় । সুলতান ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে (১৪৭৪-৮১ খ্রিঃ) আবির্ভূত হন।

৫. কবি মুজ্জাম্মিল-

(ক) নীতিশাস্ত্র বার্তা, (খ) সায়াৎনামা ও (গ) খঞ্জন চরিত্র

৬. চাঁদ কাজী- পদাবলী (সুফি -ভাবমূলক কবিতা) ।

৭. দৌলত উজির বাহরাম খান- (ক) লায়লী-মজনু কাব্য। ১৫৬০ ও ১৫৭৫ খ্রিঃ মধ্যে রচিত।

৮. শেখ কবির-পদাবলী

৫৫। মুসলিম বাংলা সাহিত্য, *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, পৃ- ২৭১-২৭৮।

৯. দোনাগাজী- (ক) সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান। কবি ষোড়শ শতকের মধ্যে ভাগে বর্তমান ছিলেন।

১০. মুহাম্মদ কবির- (ক) মনোহর মধুমালতী।

১১. সারিবিদ খান- (ক) বিদ্যাসুন্দর, (খ) রসুল-বিজয়, (গ) হানিফা ও কয়রা পরী।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে মুসলিম কবি সাহিত্যিকগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং তাদের রচনার দ্বারা বাংলা সাহিত্য ঐশ্বর্যমন্ডিত হয়। তাদের প্রবর্তিত নতুন ভাবধারা, বিষয়বস্তু ও ভাষার উপাদান বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করে। হিন্দু কবিদের উপজীব্য ছিল পৌরাণিক ও অতি প্রাকৃত কাহিনী, মুসলিম কবিরা বাংলা সাহিত্যে মানবিক ও রম্য উপাদান আমদানি করেন। ইউসুফ জুলেখা, হানিফ ও কয়রা পরী, সয়ফুলমুলক, লাইলী মজনু প্রভৃতি রম্য কাব্য ও প্রেমের উপ্যাখ্যানসমূহ মানবধর্মী সাহিত্য। মুসলিম সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করেছেন। তারা তাদের রচনায় নায়ক-নায়িকার নৈতিকতা ও সতীত্বকে অক্ষুন্ন রাখেন। মুসলিম কবিগণ বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস বিষয়ক সাহিত্যের অবতারণা করেন। ইতিহাস মিশ্রিত কাল্পনিক ঘটনা, নবী রাসূলদের অলৌকিক কার্যাবলী, সাহাবা ও ইসলামের প্রথম যুগের বীরপুরুষদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে বিজয় কাব্যসমূহ রচিত হয়। বিজয় কাব্যসমূহের মধ্যে ‘রসূল বিজয়’, ‘গাজী বিজয়’ উল্লেখযোগ্য। শুধু মুসলিম ঐতিহ্য নয়, বৌদ্ধ গুরু সিদ্ধাচার্য গোরক্ষনাথের কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে ‘গোরক্ষ বিজয়’ কাব্য রচিত হয়। এই বিজয় কাব্যসমূহ বাংলা সাহিত্যে নতুনত্ব আনে। মরমী সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলিম কবিগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পারস্যের জালালউদ্দিন রুমী ও অন্যান্য সুফি কবিদের ‘গজলিয়ৎ’ ও ‘মসনবী’ এর অনুকরণে বাঙ্গালী মুসলিম কবিরা ‘পদাবলী’ নামে মরমী ভাবধারার কবিতা রচনা করেন। হোসেন শাহের আমলে

Dhaka University Institutional Repository

নবদ্বীপের চাঁদ কাজী মরমী সাহিত্যের প্রথম খ্যাতনামা কবি। পদাবলী সাহিত্য বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে[৫৬]।

মুসলিম কবিদের রচনা শৈলীর প্রভাব হিন্দুদের উপরও পড়ে। মুসলিম কবিগণ প্রচুর আরবী-ফার্সি শব্দের ব্যবহার দ্বারা বাংলা ভাষার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন যা পরবর্তীতে হিন্দু কবিদের দ্বারাও অনুসৃত হয়। বিপ্রদাস তার 'মনসাবিজয়' কাব্যে প্রচুর আরবী-ফার্সি শব্দের ব্যবহার করেছেন-

হাসান হুকুম পাই সাদিয়া গুলাম ধাই
যেথাই মজলিস করে কাজী।
তথা 'রুজু' সর্বজনে নস্কর (লস্কর) পায়দল সনে
সবে পাহলোয়ানী মর্দ গাজী।
কাজী, মোল্লা, খাজাগণ মজলিসে সর্বজন
শুনিয়া এতেক হাকীকত[৫৭]।

সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা:

সাহিত্যের চর্চা বা পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে সুলতানী আমলে জাতিগত বা ধর্মীয় বৈষম্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি মুসলিম বিদ্বেষের স্বীকার হয় নি। মুসলিমগণ ভারত বিজয়ের বহু আগে থেকে ভারতীয় জ্ঞানরাজীর অনুশীলন করতেন। আব্বাসীয় খলিফাদের

৫৬। বিস্তারিত দেখুন, ড.এম. এ. রহিম, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-২০০-২০৮।
৫৭। বিপ্রদাস, *মনসা-বিজয়*, সুকুমার সেন সম্পাদিত, পৃ-৬৬-৬৯।

সময় থেকে মুসলিমগণ ভারতীয়দের জোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা আয়ত্ব করার জন্য সংস্কৃত চর্চা করতেন। আল বেরুনী সংস্কৃত ভাষা চর্চা করেছিলেন[৫৮]।

দিল্লীর ফিরোজ শাহ্ তুগলক সংস্কৃত ভাষায় লেখা কিছু গ্রন্থ ফার্সিতে অনুবাদ করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের একটি গ্রন্থের নাম সুলতানের নামানুসারে ‘দালাইল-ই-ফিরুজশাহী’ নামকরণ করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় বাংলার সুলতানগণও সংস্কৃত চর্চা করেছেন এবং এ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। শামসুদ্দিন ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে তার সেনাপতি ও সাতগাঁয়ের শাসনকর্তা জাফর খান গঙ্গার প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করেন[৫৯]। ‘বামন সূত্র’ নামক বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন আল্লা বখশ নামে একজন মুসলিম[৬০]।

মুসলিম লেখকগণ সংস্কৃত ভাষায়ও শিলালিপি খোদাই করতেন। হোসেন শাহের বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ শাহের (১৫৩৩-৩৮ খ্রিঃ) রাজত্বকালে এ ধরনের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এটি বর্তমানে রাজশাহী জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। মুসলমান শাসকগণ সংস্কৃত পন্ডিতগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ্ বিখ্যাত সংস্কৃত পন্ডিত ও কবি বৃহস্পতি মিশ্রকে সম্মানিত করেন। সুলতান তাকে ছয়টি উপাধি দেন এবং ‘রায়মুকুট’ উপাধিটি অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে দেয়া হয়। কবিকে হার, কর্ণকুন্ডল ও মুক্তা নির্মিত বহু অলংকার, মূল্যবান পাথর ও স্বর্ণের দ্বারা সজ্জিত করা হয়। অতঃপর কবিকে হাতির পিঠে চড়িয়ে শোভা যাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পান্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ কবিকে বহু উপহার উপঢৌকন দেয়া হয়। জনশ্রুতি আছে কবিকে সুলতান তার সেনাদলের একজন সেনাধক্ষ্য নিযুক্ত করেছিলেন[৬১]।

৫৮। ড. এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২১২।
৫৯। *সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা*, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, প্রথম অধ্যায়, পৃ-৪৫।
৬০। ড. এম.এ. রহিম, পৃ-২১৩।
৬১। ড. এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসনামলে বৃহস্পতি মিশ্রের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ[৬২]-

১. স্মৃতিরত্ন হার।

২. গীতগোবিন্দ টীকা; এ গ্রন্থটি খ্যাতনামা কবি জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দের' টীকা।

৩. 'কুমার-সম্ভাব' টীকা; বিখ্যাত কবি কালীদাসের কাব্যের টীকা।

৪. রঘুবংশ টীকা, কালীদাসের 'রঘুবংশ' নামক গ্রন্থের টীকা।

৫. মেঘদূত টীকা, কালীদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের টীকা।

৬. শিশুপাল বধ টীকা।

৭. পদচন্দ্রিকা, অমর ঘোষের টীকা।

সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহের সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। হোসেন শাহের সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়। হোসেন শাহ্ রূপ ও সনাতন নামে দু'জন ব্রাহ্মণকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন এবং সনাতনকে তার উজির ও রূপকে দবির-ই-খাস (ব্যক্তিগত সচিব) নিযুক্ত করেন। এই খ্যাতনামা পন্ডিতদ্বয় বেশ কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

রূপ রচিত গ্রন্থাবলী-১. ভক্তি রসামৃত, ২. লঘুভগবতামৃত, ৩. ললিত মাধব, ৪. স্তবমালা, ৫. মথুরা মাহাত্ম্য, ৬. হংসদূত, ৭. প্রযুক্তখ্যাত চন্দ্রিকা, ৮. উজ্জল নীলমনি, ৯. বিদগ্ধ মাধব, ১০. দানকেলী কৌমুদী, ১১. শ্রীরাধাকৃষ্ণ গনোদ্দেশ দীপিকা, ১২. উদ্ভব সন্দেশ, ১৩. নাটক-চন্দ্রিকা, ১৪. শ্রীকৃষ্ণ জন্মতিথি-বিধি। আর সনাতন কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে- ১. শ্রী বৈষ্ণবতোষিণী, ২. বৃহৎ ভাগবতামৃত, ৩. শ্রীহরিভক্তি বিলাস এবং এর টীকা 'দিগ্বদর্শনী', ৪. লঘহরিনামামৃত ব্যকরণ, এবং ৫. শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্তব বা দশম চরিত[৬৩]।

৬২। সুকুমার সেন, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী*, পৃ-১২, ড. এম. এ.রহিম, পৃ-২১৪।
৬৩। বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্য ভাগবত*, পৃ-৫২৪-৫৩১, ড. এম. এ.রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২১৪।

সংস্কৃত সাহিত্যে স্মৃতিশাস্ত্রের আবির্ভাব মুসলিম যুগের অবদান। বিখ্যাত পণ্ডিত শুলপানি চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতকে তার স্মৃতিশাস্ত্র সংকলন করেন। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে রঘুনন্দের স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়। বারভূঁইয়াদের অন্যতম ঈসা খানের পুত্র মুসা খান 'শব্দরত্নাকরী' নামে একটি সংস্কৃত অভিধান রচনায় পন্ডিত নাথুরেশকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন[৬৪]। সেন রাজত্বের পতনে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দুরবস্থা তৈরী হয়েছিল, মুসলিমদের উদারনৈতিক শাসনে দ্রুত তার উন্নতি হয়। নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সুলতানী বাংলার অর্থনীতির হালচালঃ

প্রাচীন যুগে যে বাংলা ব্রাহ্মণদের কাছে নিম্নশ্রেণীর আবাসস্থল হিসেবে ঘৃণিত ছিল, আধুনিক যুগে বৃটিশদের কাছে খামারবাড়ি হিসেবে অবহেলিত ছিল; মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলে এই বাংলাই সম্পদের প্রাচুর্যে ভরপুর সমৃদ্ধশালী একটি অঞ্চল ছিল। ইতালীয় বণিক বারথেমার বিবরণে বাংলা ছিল বসবাসের জন্য উৎকৃষ্ট স্থান। তিনি বলেছেন- I never saw a country in which provisions were so cheap[৬৫].

মাহুয়ান, ফেইসিন, র‍্যালফ ফিশ, বারবোসা, সিবাস্তিয়ান মানরিক, ইবনে বতুতা, আবদুল লতিফ প্রমুখ পর্যটকদের বর্ণনায় বাংলার প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতার প্রমাণ পাওয়া যায়[৬৬]। এই সব পর্যটকদের বিবরণে ঐ সময়ের বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প, শহর নগরের বিবরণ উঠে এসেছে। মুসলিম শাসনামলে বাংলা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করেছিল। আন্ত ও বহির্বাণিজ্য দুটোই ছিল রমরমা। মুসলিম সুলতানদের অধীনে – লক্ষ্মৌতি, পান্ডুয়া, সাতগাঁও,

---

৬৪। *সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা*, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, প্রথম অধ্যায়, পৃ-৪৪; ড. এম. এ. রহিম, পৃ-২১৪।

৬৫। *Bengal in the Sixteenth A.D*, J. N. Das Gupta, Calcutta University 1914, P-118

৬৬। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ-৩৪২-৬৭; ওয়াকিল আহমদ, *মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮ ।

সোনারগাঁও, চিটাগাং, মুয়াজ্জেমাবাদ, গিয়াসপুর, ফতেহাবাদ, খলিফাতাবাদ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক নগরী হিসেবে গড়ে উঠে[৬৭]। বারথেমা ও বারবোসা ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে 'বাঙালা' নামে একটি শহরকে সমৃদ্ধশালী বন্দররূপে উল্লেখ করেছেন। তারা সেখানে বহু মুসলিম বণিকদের লক্ষ্য করেছেন যারা সুতী বস্ত্র, চিনি ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় করতেন[৬৮]।

র‍্যালফ ফিশ সোনারগাঁও বন্দরের কথা উল্লেখ করেছেন। এখান থেকে বিপুল পরিমাণ সুতীবস্ত্র ও চাল বিদেশে রপ্তানি হত। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে বাংলার সাথে চীন, বার্মা, মালয় দীপপুঞ্জ, সিংহল, আরব, পারস্য, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশের এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল[৬৯]।

কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের ফলে বাংলার বিরাট রপ্তানি বাণিজ্য ছিল। সুতী বস্ত্র, চাল ও চিনি ছিল প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। এছাড়া রেশমি বস্ত্র, আদা, মরিচ, লাক্ষা, হরিতকী, তেল, মাখন, শুটকি, মাছ, ফলমূল, কলাই, পান, সুপারি, পেয়াজ, রসুন, কর্পূর, ঘৃতকুমারী, সুগন্ধীকাঠ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, পাটজাত দ্রব্য প্রভৃতি প্রায় ৩৫ রকমের দ্রব্যের রপ্তানির কথা পর্তুগীজ বিবরণে পাওয়া যায়[৭০]। বাংলার এই বিশাল রপ্তানি বাণিজ্যের প্রমাণ বাংলা সাহিত্য থেকেও পাওয়া যায়। বংশীদাসের 'মনসামঙ্গল' ও মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে হিন্দু বণিকদের চতুরতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়ে বাংলা স্বর্ণ ও মুল্যবান ধাতব পদার্থ আমদানি করত।

৬৭। Abdul Karim, প্রাগুক্ত।
৬৮। J.N. Das Gupta, ibd, P-119-20.
৬৯। C. Frediric, *Hakluat Society*, vol-II, P-136-147; Purchas-His Pilgrims, 10th chapter; ড. এম.এ. রহিম, পৃ-৩৫২-৬৩।
৭০। C. Frediric, *Hakluat Society*, vol-v, P-411, ড. এম. এ. রহিম, পৃ-৩৬৩।

সুলতানী আমলে মুদ্রার প্রচলন বাংলার অর্থনীতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যকে গতিশীল করেছিল। প্রফেসর মমতাজুর রহমান তরফদারের মতে, "সভ্যতার গ্রামীণ পর্যায় থেকে মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলনের উপর প্রতিষ্ঠিত নাগরিক পর্যায়ে বাংলাকে আবার নিয়ে আসার ব্যাপারে মুসলিম শাসনের একটি ভূমিকা ছিল।"[৭১]

সুলতানী বাংলায় জিনিসপত্র ছিল অস্বাভাবিক রকম স্বস্তা। সিবাস্তিয়ান মানরিকের বর্ণনায় এসেছে, প্রত্যেক বাজারে বা শহরে খাদ্যদ্রব্য, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, শিল্পজাত দ্রব্যাদি, সুতিবস্ত্র ইত্যাদির এত বেশী প্রাচুর্য ছিল যে মাত্র একটি বাজারে প্রাপ্ত এসব জিনিপত্রের যে কোন একটি দ্রব্যের দ্বারা কয়েকটি জাহাজ বোঝাই করা যেত। তিনি এও মন্তব্য করেছেন যে, বাংলাদেশের শহরগুলোতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত স্বস্তা ছিল যে, তিনি দিনে কয়েকবারই আহার করতে প্রলুব্ধ হন[৭২]। ইবনে বতুতা প্রদত্ত জিনিস পত্রের মূল্যের তালিকা থেকে সহজলভ্যতার ধারণা পাওয়া যায়। তিনি উলেৱখ করেছেন যে-এক দিরহাম মূল্যে এখানে আটটি মোটা তাজা মুরগি, দুই দিরহামে একটি হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া বিক্রি হয়। এছাড়া ত্রিশ হাত লম্বা খুবই উন্নত মানের এক ধরণের সুতি কাপড় মাত্র দু'দিনারে এখানে ক্রয় করা যায়। একটি স্বর্ণ দিনারে (মরক্কোর আড়াই স্বর্ণ দিনার) এখানে একজন সুন্দরী ক্রীতদাসী বালিকা বিক্রি হয়[৭৩]। ইবনে বতুতা সে সময়ে বাংলায় প্রচলিত দাস ব্যবসার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি 'আশুরা' নাম্নী একটি সুন্দরী মেয়েকে ক্রয় করেছিলেন। অভাবী পরিবারের সন্তানদের নপুংশক বানিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করার মত জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। বাংলার বাইরে থেকেও দাস-দাসী আনা হত, আবিসিনিয়ার হাবসী ক্রীতদাসরা এভাবে বাংলায় এসেছিল।

৭১। মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেনশাহী আমলে বাংলা* (১৪৯৪-১৫৩৮)-একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যেষণা, অনুবাদ-মোকাদ্দেসুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ-৩০।

৭২। *Hakluat Society*, vol-LXI, P-135; উদ্বৃত, ড. এম. এ. রহিম, পৃ-৩৫৭।

৭৩। এইচ.এ.আর গিব, *'ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনী'*, অনুবাদ-খুররম হোসাইন, ক্যাবকো বিসিক শিল্পনগরী টাংগাইল, ২০০০, পৃ-১৬২।

আবুল ফজলের বর্ণনায় এসেছে যে, শ্রীহট্ট ও ঘোড়াঘাট অঞ্চল থেকে বহু খোজা সরবরাহ করা হত[৭৪]। বারবোসা অভিযোগ করেছেন, মুরদেশীয় বণিকগণ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বহু ছেলে মেয়ে ক্রয় করে, অনেক সময় চুরি করে নিয়ে এসে খোজা বানিয়ে বিক্রি করত[৭৫]। ড. এম. এ. রহিম মনে করেন বারবোসার এই অভিযোগ সত্য নয় কারণ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে এই নিষ্ঠুর কাজটি ভারত বিশেষ করে বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত একটি সামাজিক প্রথা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যা সম্রাট কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল[৭৬]। প্রকৃত পক্ষে বাংলায় অধিক হারে জন্মহার ও অভাবের তাড়নায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ যারা গতিশীল অর্থনীতির বাইরে অবস্থান করেছিল তারা এই নিষ্ঠুর প্রথা অবলম্বন করেছিল। সুলতানী আমলে কৃষিকাজের চরম উন্নতি হয়েছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রে স্থিতি আসায় মানুষের কর্ম উদ্যম বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া নদীমাতৃক বাংলার মাটি উর্বর হওয়ায় প্রচুর উৎপাদন হত। উদ্বৃত্ত উৎপাদান না হলে এত প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বাইরে রপ্তানি করা সম্ভব হত না।

মুসলিমদের আগমনে বাংলায় শিল্পায়ন ঘটে। বাংলায় ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের প্রচলন পূর্ব থেকে ছিল। মুসলিমগণ আসার পর বহির্বাণিজ্য প্রসারিত হওয়ায় এসব শিল্পের আয়তন বেড়ে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। পাশাপাশি বড় বড় শিল্পও গড়ে উঠে। বাঙালী কারিগররা ছোট বড় নানা আকারে নৌকা নির্মাণ করত। মুসলমানরা আসার পর নৌযুদ্ধে নৌকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের প্রতি অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়ার ফলে জাহাজনির্মাণ শিল্প খুব বেশী সম্প্রসারিত হয়। বারথেমার বিবরণে ঐ সময়ে বাংলায় প্রচলিত বৃহৎ আকারের কয়েক ধরণের জাহাজের বিবরণ পাওয়া যায়[৭৭]।

৭৪। *আইন-ই-আকবরী*(ব্লকম্যান), প্রথম খণ্ড, পৃ-১৩৬; ড. এম.এ.রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ-২৬০

৭৫। Barbosa, *Hakluat Society*, vol-2, P-145-47; উদ্বৃত, ড. এম.এ.রহিম, ।

৭৬। ড. এম. এ. রহিম, পৃ-২৬০।

৭৭। J. N. Dash Gupta, *Bengal in the Sixteenth Century*, P-117; ড.এম.এ রহিম, পৃ-৩৪৯।

বারবোসার বিবরণেও বাংলার জাহাজ নির্মাণ শিল্পের কথা জানা যায়। বাংলা সাহিত্যেও বাংলার বণিকদের জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যকলাপ প্রতিফলিত হয়েছে। কবি মুকুন্দরাম গৌড়ের ধনপতি সওদাগর ও তার পুত্র শ্রীমন্তের বৃহৎ একটি জাহাজে বাণিজ্য যাত্রার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন[৭৮]। জগজ্জীবনের 'মনসামঙ্গল' কবিতায় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের আলোকপাত করা হয়েছে[৭৯]। ফজলুলল্লাহ রচিত 'মাসালিক আল আবসার' গ্রন্থের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে বাংলার জাহাজ সমূহ এত বৃহৎ ছিল যে অনেক জাহাজে কারখানা, তন্দুর ও বাজারের ব্যবস্থা ছিল। জাহাজের পরিসর এত বড় ছিল যে একই জাহাজের যাত্রীরা একে অন্যকে জানতে বেশ কিছু দিন সময় লাগত। নৌকার গতিশীলতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, যদি একটি তীর দুশত চলন্ত নৌকার মধ্যে সবচেয়ে আগ্রগামী নৌকাটি লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হত তা হলে তাদের দ্রুতগতির দরুন তীরটি ঐ নৌকায় না পড়ে এদের মাঝের নৌকাগুলোর একটির উপর গিয়ে পড়তো[৮০]।

তবে মুসলিম বাংলা যে শিল্পটির জন্য পৃথিবীব্যাপী বিখ্যাত হয়েছিল তা হল বস্ত্রশিল্প। বাংলায় 'মসলিন' নামে পরিচিত সবচেয়ে উত্তম মানের সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী হত। আমির খসরু বাংলার এই বস্ত্র তৈরীর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন- এ বস্ত্র এত বেশী সূক্ষ্ম ও মিহি ছিল যে, এর একশত গজ কাপড় মাথায় জড়ানোর পরেও তার ভেতর দিয়ে মাথার চুল দেখা যেত[৮১]। বারথেমা বাংলার মতো সুতি বস্ত্রের প্রাচুর্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখেননি বলে মন্তব্য করেন।

৭৮। R.K. Mukharzee, *History of Indian Shipping*, P-159; ড.এম.এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫০।
৭৯। পূর্বোক্ত।
৮০। ফজলুলল্লাহ, *মাসালিক আল আবসার*, অনুবাদ-অধ্যাপক আবদুর রশীদ, আলিগড়, ১৯৪৩, পৃ-১৭; ড.এম.এ.
রহিম, পৃ-৩৪৯।
৮১। *কিরান আল সাদাঈন* (লক্ষ্মী সম্পাদিত, ১৮১৫) পৃ-৩২-৩৩; ড.এম.এ. রহিম, পৃ-৩৪৭ ।

তিনি উত্তম শ্রেণীর বিভিন্ন বস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে বৈরাস, নামোনী, লিজাতি, কায়েনতার, দওজায় এবং সিনাবাফের কথা উল্লেখ করেছেন[৮২]।

বারবোসা বাংলার সুতা ও সুতি বস্ত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। চাইনিজ বিবরণে ছয় রকমের সুতি বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়[৮৩]-।

১. পি-পো। বিভিন্ন রংয়ের এক ধরণের কাপড় যা প্রস্থে দু থেকে তিন ফুট এবং দৈর্ঘ্যে ছাপান্ন ইঞ্চি। এই বস্ত্র খুব সূক্ষ্ম ও মিহি।
২. মান-চে-তি। চার ফুট বা তারও অধিক চওড়া এবং পঞ্চাশ ফুট লম্বা আদার রংয়ের হলদে বস্ত্র যা খুব মজবুত।
৩. শাহ-না-কিয়ে (শাহ্-না-পা-ফু)। পাঁচ ফুট প্রশস্ত ও বিশ ফুট লম্বা এক ধরণের কাপড়।
৪. হিন-পেই-টাঙ্গ-টা-লি (ফি-পাই-লাও-টা-লি) এটা মোটা ধরণের কাপড়।
৫. শা-তা-ইউল। এ কাপড়ের দু রকমের মাপ ছিল, একটি প্রস্থে পাঁচ ইঞ্চি ও দৈর্ঘ্যে চল্লিশ ফুট এবং অন্যটি প্রস্থে আড়াই ফুট ও দৈর্ঘ্যে চার ফুট।
৬. মা-হেই-মা-লি। চার ফুট চওড়া এবং দৈর্ঘ্যে বিশ ফুট বা তারও বেশী।

প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত 'মসলিন' বাংলার অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তবে মোগল যুগ ছিল মসলিনের স্বর্ণযুগ। এছাড়া চৈনিক বিবরণ থেকে কার্পেট, কাগজ, ইস্পাত, বন্দুক, অলংকারাদি ইত্যাদি শিল্পের কথা জানা যায়।

৮২। K. M. Ashraf, *Life and Conditions of the people of Hindustan*, P-97; ড.এম.এ. রহিম, পৃ-৩৪৭।

৮৩। *Visva-Bharati Annals*, Vol-I, 1945, Pp-96-134; উদ্ধৃতঃ ড.এম.এ রহিম, পৃ-৩৪৭।

নগরায়ণঃ

ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকেই মুসলিমগণ নগরায়ণ বা নগর সভ্যতাকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। মক্কা নগরীতে ১৩ বছরের দাওয়াতী মিশন শেষে মহানবী (সঃ) মদীনা নগরীতে হিযরত করে একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলেন। এরপর ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার কার্যক্রমে মুসলিমগণ প্রথমে বিভিন্ন অঞ্চলের রাজধানীসমূহ, কেন্দ্রস্থল বা শহর ও নগরগুলিকেই বেছে নিয়েছেন। কারণ শহর ও নগরসমূহকে আয়ত্ব করতে পারলে খুব সহজেই পুরো অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তার করা যেত। Md. Akhtaruzzaman মন্তব্য করেছেন-

“The Islamic revolution in the first half of the seventh century under prophet Muhammad (sm) was essentially urban in character.”[৮৪]

এরই ধারাবাহিকতায় বখতিয়ার সেনরাজ্যের রাজধানী নদীয়াতে অভিযান করেন। মুসলিমগণ আসার আগে বাংলার শহর ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাকে শহর বলা যায় না। রাজাদের প্রাসাদ, ধর্মীয় স্থাপনা ছাড়া বাণিজ্যিক কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তখন ছিল না। নদীয়া বিজয় সম্পন্ন করেই বখতিয়ার টাকশাল স্থাপন ও মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ শুরু করেন। এ থেকে বাংলায় নব উদ্যমে নগরায়নের যাত্রা শুরু হয়। Md. Akhtaruzzaman বলেন-

“Right from the time of the establishment of Muslim rule in 1205, rulers made capital cities, established administrative headquarters,

৮৪। Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, December 2009, P-133

posted police camps or thanas and constructed garrison camps or forts in deferent parts of Eastern India."[৮৫]

নগরায়ণে মুসলিমগণ যথেষ্ট পরিকল্পনা ও সুরুচির পরিচয় দেন। সাধারণত নদী তীরেই বড় বড় শহর নগর গড়ে উঠে ছিল। এতে যোগাযোগের যেমন সুবিধা হত তেমনি শহরের সৌন্দর্য বর্ধন হত। অন্যদিকে আদ্র আবহাওয়া শহরের দালানকোঠাকে স্থায়িত্ব দান করত। শহরসমূহে শুধু প্রশাসনিক ভবন বা রাজকীয় প্রাসাদ নয়; সাথে আবাসিক এলাকা, রাস্তাঘাট, বাজার রেস্তোরা, গণপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে আধুনিক শহরে রূপান্তরিত হয়েছিল। শহরের প্রবেশদ্বারে বড় বড় তোরণ নির্মিত হত, অনেক শহর প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। এছাড়া শহরের সৌন্দর্য বর্ধনের দিকেও নজর দেয়া হয়েছিল। Md. Akhtaruzzaman এর বর্ণনায় এসেছে- "There are many references to high and large buildings surrounded by beautiful gardens in the Muslim cities of Delhi, Camboy, Jaunpur, Lakhnauti and Pandua." [৮৬]

এভাবে মুসলিমগণের পরিচর্যায় দ্রুত শহর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং লক্ষ্ণৌ, দেবকোট, সোনারগাঁ, পাভুয়া বা ফিরুজাবাদ, গৌড়, একডালা, তান্ডা প্রভৃতি রাজধানী শহরের মর্যাদা লাভ করে[৮৭]। প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে চিটাগাং ও খলিফাতাবাদ (খুলনা) এর উত্থান ঘটেছিল সুলতানী আমলেই। এছাড়া পর্যটকদের বিবরণে 'বাঙালা' ও 'হাবাঙ' নামে দুটি বাণিজ্যিক শহরের নামও জানা যায়। এর বাইরে ছোট ছোট আরও অনেক শহর ও নগরের উত্থান ঘটেছিল।

৮৫। Ibd, P-135.
৮৬। Ibd, P-145.
৮৭। Ibd, P-145.

জীবনযাত্রা প্রণালী ও জীবনযাত্রার মান

সমাজের শ্রেণীবিন্যাসঃ

সুলতানী সমাজের স্তর বিন্যাসে সুলতান ও তার পরিবারের অবস্থান ছিল শীর্ষে, এর পর ছিল আমীর ওমরাহ, সামরিক কর্মকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবস্থান। তারা সবাই ছিলেন অভিজাত শ্রেণীভূক্ত। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে হিন্দু কর্মকর্তাগণও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তবে সম্পদ, প্রশাসনিক পদবী ও প্রভাবের অধিকারী না হয়েও একটি শ্রেণী মর্যাদার দিক থেকে অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, তাঁরা হলেন আলিম-ওলামা, সুফি-সাধক, পীর-দরবেশগণ। ধর্মনিষ্ঠা, শিক্ষানুরাগ ও উন্নত চরিত্রের জন্য বাঙালী সমাজে তাঁদের প্রভাব ছিল অসামান্য। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সুলতানগণ পর্যন্ত তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

ফিরুজ শাহ তুঘলক ১৩৫৩ খ্রিঃ বাংলার বিদ্রোহী শাসনকর্তা হাজী ইলিয়াছ শাহের পক্ষ ত্যাগ করে তার আনুগত্য গ্রহণের জন্য লক্ষ্মণাবতীর অধিবাসীদের প্রতি নির্দেশনামা জারি করেন। এই নির্দেশনামায় বিভিন্ন শ্রেণীকে সম্বোধন করে আহ্বান জানানো হয়েছে। সম্বোধনের এই শ্রেণী বিন্যাসের তালিকায় প্রথম ছিলেন সৈয়দ, উলেমা ও শেখগণ, দ্বিতীয় সারিতে ছিলেন খান, মালিক, সদর, কবীর, মায়ারিফ এবং অন্যান্য প্রধান ব্যক্তি ও অনুচরবর্গ, তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন জমিদার মুকাদ্দাম ও আরও অনেকে, চতুর্থ শ্রেণীতে তাপস, সিদ্ধপুরুষ ও গাবরগণ[৮৮]। সৈয়দ, শেখ ও উলেমাদেরকে প্রথমে সম্বোধন করা থেকে সমাজে তাদের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রাসূল (সঃ)এর বংশধরগণ সৈয়দ নামে পরিচিত ছিলেন। সৈয়দগণ সুলতান ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী সুফিরা 'শায়খ'

৮৮। *ইনশা-ই-মাহরু* (আয়নাল মুলকের পত্রাবলী), এশিয়াটিক সোসাইটি কলিকাতা, JASB ১৯২৩, ১৯ তম অধ্যায় পৃ-২৮০; ড. এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২২৯।

হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই শ্রেণী থেকেই সদর, কাজী ও অন্যান্য ধর্ম বিষয়ক কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন প্রশাসনিক অভিজাতগণ, যেমন মালিক, খান, আমির, সদর ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তৃতীয় পর্যায়ের অভিজাতগণ ছিলেন জমিদার, মুকাদ্দাম (গ্রামের খাজনা আদায়কারী প্রধান ব্যক্তি), ভূসম্পত্তির মালিক, কৃষক ও খাজনা আদায়কারীগণ। সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষ ও গাবরদের (যারা বেশিরভাগই ছিলেন হিন্দু যোগী, পন্ডিত ও শিক্ষাগুরু) নিয়ে চতুর্থ শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এরাও রাষ্ট্র থেকে নিষ্কর জমি ও ভাতা ভোগ করতেন এবং হিন্দু সমাজের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

সুলতানি আমলে সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব না থাকলেও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে জীবিকা নির্বাহকারী একটি শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক স্ত রে অবস্থানকারী মোল্লা, মুনশি, নিম্নপদস্থ কর্মচারী, কেরানী, চিকিৎসক, শিক্ষক, কবি সঙ্গীতশিল্পী, কারিগর, স্থপতি, উৎপাদনকারী ব্যক্তিবর্গ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। শিক্ষিত শ্রেণীটি সমাজে কিছুটা প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

কৃষক, ছোট ছোট কারিগর ও উৎপাদক, শ্রমিক, নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী, পাইক-পেয়াদা প্রভৃতি ছিল সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। মুসলিম সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরাও সাধারণত চাকুরীজীবী হতে পছন্দ করত এবং হিন্দুরা বেশির ভাগ ছিল কৃষিজীবী[৮৯]।

৮৯। উদ্ধৃত ড. এম. এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-২৩৪-২৩৬।

বৃত্তিমূলক পেশাও মুসলিমরা ব্যাপকহারে গ্রহণ করত। বাংলা সাহিত্যেও মুসলিম সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের কথা উঠে এসেছে। অর্থনৈতিক মানদণ্ডে শ্রেণীবিভাজন থাকলেও ধর্মীয়সূত্রে সমাজে এক ধরণের একতা ছিল। রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে জনগণ ইসলামী ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিল। এই ধর্মীয় ভাবধারার বিপরীতে অবস্থান করা সুলতানের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। আর এই একতা বা জনমত গঠনের রূপকার ছিলেন আলিম ওলামা, পীর, দরবেশগণ। তারা সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করতেন। সব শ্রেণীর মানুষের জন্য তাদের দ্বার ছিল উন্মুক্ত। উদাহরণ হিসেবে নূর কুতুব উল আলমের কথা বলা যায়। কোন প্রশাসনিক বা সামরিক ক্ষমতার অধিকারী না হয়েও তিনি রাজা গণেশকে জনমতের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য করেছিলেন।

জীবনযাত্রার মানঃ

সুলতানী আমলের বাংলা আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী হওয়ায় বাংলার সুলতানগণ আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন। রাজদরবার ছিল জাঁকজমকপূর্ণ এবং রাজধানী ছিল সুরম্য অট্টালিকা দ্বারা সজ্জিত। বাংলার সুলতানগণ শান শওকত প্রকাশে দিল্লীর সুলতানদের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। বাংলার সুলতানদের রাজদরবারের শান শওকতের প্রমান পাওয়া যায় চৈনিক দূত ও পর্যটকদের বিবরণে। তারা গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ও তার উত্তরাধীকারীদের রাজসভা পরিদর্শন করেছিলেন। সিং-চ-সেঙ্গ-লান এর বর্ণনায় এসেছে-

“রাজার বাসভবন মর্টার মিশ্রিত ইটের নির্মিত ছিল; বাসভবন পর্যন্ত সিঁড়িগুলো ছিল উচ্চ ও প্রশস্ত। কক্ষগুলো ছিল প্রশস্ত ছাদবিশিষ্ট এবং এর অভ্যন্তর ভাগ ছিল সাদা চুনকাম করান। অভ্যন্তর ভাগের দরজাগুলো ছিল তিনগুণ ঘন ও প্রতিটি নয়টি প্যানেল বিশিষ্ট। সভাকক্ষের স্তম্ভগুলো ছিল পিতল দিয়ে মোড়ান; নানাবিধ ফুল ও জীবজন্তুর চিত্রাঙ্কিত, চক্রাকৃতি এবং

সুমার্জিত। ডানে ও বামে প্রসারিত দীর্ঘ অলিন্দ, যেখানে (আমাদের দর্শন উপলক্ষে) অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত সহস্রাধিক লোক সারিবদ্ধ ভাবে মোতায়েন করা হয়েছিল এবং সভাগৃহের বহির্ভাগের প্রাঙ্গনে উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ও বর্ম পরিহিত এবং বর্শা, তরবারি ও তীরধনুক সজ্জিত (আমাদের) অশ্বারোহী চীনা সৈনিকদের দীর্ঘ সারি ছিল। ---- রাজার ডানে ও বামে ময়ূর পালকে তৈরি শত শত ছত্র ছিল এবং দরবার কক্ষের সম্মুখভাগে হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ছিল কয়েকশত সৈনিক। রাজা প্রধান দরবার কক্ষে মূল্যবান পাথর বসানো উচ্চ সিংহাসনে পা দুটো আড়াআড়ি করে বসেছিলেন এবং একখান দু'ধারী তলোয়ার তার কোলের উপর স্থাপিত ছিল। পাগড়ি পরিহিত ও রূপার লাঠি হাতে দুজন লোক আমাদের অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলো।"[৯০]

সিং ইয়াং চৌ কুং তিয়েন লু লিখেছেন-"মেঝেতে কার্পেট বিছানো হয় এবং রাজা চীনা শুভেচ্ছা সফরকারী দলকে স্যাঁকা ও সংরক্ষিত এবং ঘিয়ে ভাজা গরু ও ভেড়ার মাংস গোলাপ জল এবং বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধিযুক্ত সুমিষ্ট পানীয় যোগে ভোজে আপ্যায়িত করেন"[৯১]।

তার বর্ণনা থেকে আরও জানা যায়, রাজা চীনা সম্রাটের দূতের জন্য একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। সৈনিকদের বহু উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা শেষে রাজাদূতদেরকে স্বর্ণ নির্মিত জলপাত্র, রুটি স্যাঁকার পাত্র ও নানা প্রকার স্বর্ণ নির্মিত থালাবাটি উপহার দেন। সকল সহকারী দূতগণও একই প্রকারের রৌপ্য নির্মিত জিনিস উপহার পান এবং তাদের নিম্ন পদস্থ কর্মচারীদের প্রত্যেকে একটি সোনালি বর্ণের ঘড়ি এবং পাট ও রেশমীজাত লম্বা সাদা জামা উপহার পান। প্রহরী দলের প্রত্যেককে একটি করে রৌপ্যমুদ্রা উপহার দেয়া হয়।

৯০। Chines Accounts, *Visva Bharati Annals*, Vol-1, P-96-134; দ্রষ্টব্যঃ ড. এম.এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২২৩-২২৪।

৯১। *Visva Bharati Annals*, Vol-1, P-96-134; দ্রষ্টব্যঃ ড. এম.এ রহিম, পৃ-২২৪।

চীন সম্রাটের জন্য স্বর্ণপাত্রে লিখিত একটি স্মারক-পত্র স্বর্ণ নির্মিত কৌটায় প্রদান করা হয় এবং আরও নানাবিধ উপহার-উপঢৌকন দেয়া হয়[৯২]। চীনা দূতগণ বাংলার শাসক ও অধিবাসীদের অতিথিপরায়ণতা, সুরুচি ও সংস্কৃতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সুলতানগণ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আমির-ওমরাহ্, উজির, মনসবদারগণ, সরকারি কর্মচারীবৃন্দ, উজ্জ্বল পোশাকে সজ্জিত দেহরক্ষী ও অনুচরবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। নকিবগণ দরবার গৃহে সুলতানের আগমনের বার্তা ঘোষণা করতেন। আমন্ত্রিত ও দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তিদের নামও তারা ঘোষণা করতেন। হাজিবগণ দরবারের আদব কায়দা রক্ষা করতেন। দবির-ই-খাস নামে সুলতানের ব্যক্তিগত সচিব ছিল যারা পঠন ও লিখনে সুদক্ষ হতেন। সুলতানের নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত চিকিৎসক থাকতেন। এছাড়া দরবার ছিল কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, গায়ক, বিদ্বান ও রসজ্ঞ-ব্যক্তিদের আবাসস্থল। একাধিক স্ত্রী ও বহু সংখ্যক ক্রীতদাসী নিয়ে হারেম গঠিত ছিল। হারেমে গায়িকা ও নৃত্য পটীয়সী যুবতীরাও স্থান পেত। রাজ প্রাসাদে রাজা-রানী, শাহজাদা ও শাহজাদীদের সেবার্থে শত শত দাসী ও খোজা ছিল। 'জেনানামহল' এত বিরাট ছিল যে, এর সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য নারী পরিদর্শিকা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হত[৯৩]।

অভিজাত শ্রেণীর আমির-ওমরাহ ও অন্যান্যরাও আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসী জীবন যাপন করতেন। জাঁকজমকের ব্যাপারে তারা শাসকদের অনুসরণ করতেন। প্রাসাদ ও গৃহসমূহ নানারকমের ফুলের বাগান দ্বারা সজ্জিত ছিল। গৃহের কক্ষসমূহ বহু মূল্যবান গালিচা, সোফা, দিয়ান ও বিচিত্র সুন্দর পর্দায় চমৎকারভাবে সাজান থাকত। আমির-ওমরাহদের প্রত্যেকের জমকাল পোশাক পরিহিত অনুচরবাহিনী ছিল।

৯২। *Visva Bharati Annals,* Vol-1, P-134; দ্রষ্টব্যঃ ড. এম.এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২২৫।
৯৩। ড. এম. এ. রহিম, পৃ-২২৬।

আমির-ওমরাহ্গণ পোশাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলনে বিলাসপরায়ণ ছিলেন এবং মনন ও রুচির প্রয়োজনে মুক্ত হস্তে ব্যয় করতেন। শাসকের মত তারাও হারেমের অধিকারী ছিলেন[৯৪]। সে সময়ে হারেমে অধিক সংখ্যক দাসদাসী রাখা আভিজাত্যের প্রতীক ছিল। হাসান নামে একজন মুসলিম জমিদার সমন্ধে কবি বিপ্রদাস লিখেছেন-

“শতেক বিবির সঙ্গে হাসান আনন্দরসে

রভসে নিভসে সর্বক্ষণ
কর্পূরা তাম্বুল খায় কস্তুরি চন্দন গায়
গোলাম জোগায় ঘন ঘন ।
কেহ মলে অঙ্গপদ কেহ করে খোসামোদ
কেহ শ্বেত চামর ঢুলায়
কেহ প্রাণের ভয়ে, করজোড় করি রয়
কেহ বলে রসূলে খোদায়।”[৯৫]

জমিদার হাসানের ঐতিহাসিক সত্যতা নিরূপন করা যায় নি, আর একশত স্ত্রীর বর্ণনাও অতিরঞ্জিত মনে হয়। হয়ত দাসদাসীসহ পুরো জেনানা মহলকে বিপ্রদাস স্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে এ বর্ণনা ঐ সময়ের আমির-ওমরাহদের আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। এসব ওমরাহদেরও ক্ষুদ্র আকারের দরবার ছিল এবং সেখান সঙ্গীত শিল্পী, গায়িকা, নর্তকী ও রসজ্ঞ ব্যক্তিদের পদচারণা ছিল।

৯৪। ড. এম. এ. রহিম, পৃ-২৩১ ।
৯৫। *মনসামঙ্গল*, এস কে সেন সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৫৬, পৃ-৬৬-৬৭।

বারবোসা ও সিবস্তিয়ান মানরিকের বিবরণে অভিজাত শ্রেণীর বিলাসপরায়ণ খানাপিনার বিবরণ এসেছে। তবে এটা সর্বজনীন রীতি ছিল না বলে ড. এ. রহিম মনে করেন। চৈনিক বিবরণে অভিজাত নর নারীর সুরাপানের অভ্যাসের কথা জানা যায়। তবে প্রকাশ্য ভোজসভায় সুরাপান রুচি বিরুদ্ধ ছিল। আর শরয়ী দৃষ্টিতে সুরাপান হারাম হওয়ায় জনসম্মুখে সুরাপানের রীতি না থাকাই স্বাভাবিক ছিল। চৈনিক বিবরণে অভিজাত মহিলাদের পোশাক পরিচ্ছদের বিবরণ পাওয়া যায়। মহিলারা খাট জামা পরতেন, সুতি বা রেশমি ওড়না দিয়ে শরীর জড়িয়ে রাখতেন। প্রসাধনী ব্যবহার করতেন না, তবে হাতে, পায়ে, গলায় ও কানে অলঙ্কার পরতেন[৯৬]। ড.এম.এ. রহিম মনে করেন, মহিলারা পুরোপুরি অন্তঃপুরে আবদ্ধ ছিলেন না বলেই বিদেশীরা তাদের সমন্ধে জানতে পেরেছেন[৯৭]।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষরও সচ্ছল জীবন যাপন করতেন। এদের মধ্যে বণিক শ্রেণীটি অভিজাতদের মতই বিলাসী ছিলেন। বারথেমা ও বারবোসা বাঙ্গালা বন্দরের ঐশ্বর্যশালী বণিকদের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বণিকদের বিরাট পরিবার, ভৃত্য ও অনুচরবর্গ ছিল[৯৮]। মাহুয়ান বাঙালী অধিবাসী পুরুষদের পোশাকের যে বিবরণ দিয়েছেন তা ড.এম.এ. রহিমের মতে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর পোশাক। বর্ণনায় এসেছে “পুরুষরা তাদের মস্তক মুন্ডন করেন এবং গোল গলাবন্ধ বিশিষ্ট লম্বা ও ঢিলা পোশাক পরিধান করেন, মাথায় সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেন এবং কোমরে চওড়া রঙিন রুমাল বাঁধেন। তারা সুচালো চামড়ার জুতা পরেন[৯৯]।”

৯৬। *Visva Bharati Annals*, Vol-1, P-122; ড. এম. এ. রহিম, পৃ-২১৩।

৯৭। ড. এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-২১৩।

৯৮। *Hakluat Society*, Vol-II, Pp: 144-148; Purchas-His Pilgrims, Vol-IX; ড.এম.এ. রহিম, পৃ-২১৩।

৯৯। Mahuan’s Accounts; N.K Bhattasali, *Coins and Chronolgy of the Early Independent sultans of Bengal*, Cambridge, 1922, P-170.

বারবোসার বিবরণে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পোশাকের বর্ণনা উঠে এসেছে-"সাধারণ স্তরের পুরুষেরা খাট সাদা জামা পরে, সেগুলি উরুর আধখানা অবধি প্রসারিত। তাছাড়া এরা পায়জামা (drawers) পরে এবং মাথায় তিন চার পাক দিয়ে ছোট পাগড়ি জড়ায়। এরা সবাই চামড়ার জুতো পায়ে দেয়, কেউ কেউ পরে বড় জুতো (Shoe), কেউ পরে খুব সুন্দর ভাবে তৈরী রেশমি এবং সোনালি সুতা দিয়ে সেলাই করা চটি জুতো।"[১০০]

সাধারণ শ্রেণীর মানুষেরা বিলাসিতা না করলেও স্বচ্ছলভাবেই জীবন যাপন করতেন। বাংলা সাহিত্যে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের নানা পেশার বিবরণ উঠে এসেছে-

রোজা নমাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা।
তাসন না করিয়া নাম ধরিল জেলা।।
বলদে বাহিয়া নাম বলয়ে মুকেরি।
পীঠা বেচিয়া নাম ধারাল্য পীঠারি।।
মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাল্য কাবারি।
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি।।
হিন্দু হয়ে মুসলমান বৈসে গয়সাল।
কাল হয়ে মাঙ্গে কেহ পায়্যা নিশাকাল।।
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকার।
জীবন উপায় তার পায়্যা তাঁতিঘর।।
পট পঢ়িয়া কেহ ফিরয়ে নগরে।
তীরকর হয়ে কেহ নির্মারেণ লরে।।

১০০। উদ্ধৃত, সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস* (১২০৪-১৫৭৬), পৃ-৬৩১ ।

কাগজ কুটিয়া নাম ধারাল্য কাগতি (কাগচা)

কলন্দর হয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি। ।

বসন রাঙ্গায়া কেহ ধরে রঙ্গরেজ।

লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ।।

সুন্নত করিয়া নাম বেলাল্য হাজাম

সহরে সহরে ফিরে না করে বিশ্রাম।।

গো মাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই।

এই হেতু যমপুরে তার নাই ঠাঞি।।

কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা

দরজি ধরাল্য নাম মুন্সির বেটা[১০১] ।।

সুলতানী আমলে বৃত্তিজীবী মানুষের মধ্যে তীর-ধনুক প্রস্তুতকারী, তাঁতি, কাগজের কারিগর, গবাদি পশুর ব্যবসায়ীদের অবস্থা ভাল ছিল। কারণ এসব ব্যবসায় ছিল লাভজনক। বাংলায় প্রস্তুত পোষাকের পৃথিবী ব্যাপী চাহিদার কারণে সবচেয়ে রমরমা অবস্থা ছিল তাঁতিদের। কাগজের কারিগররা সমাজে সম্মানের অধিকারী ছিলেন। আবার জন্মহার বেশী হওয়ায় বাংলায় খৎনাকারী হাজমরা ফুরসতই পেতেন না। তবে নিম্নবিত্ত সব শ্রেণীর মানুষের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। মোল্লাদের ফী ছিল অত্যন্ত নগন্য। সমাজের সম্মান লাভ করেও তারা কষ্টে জীবন যাপন করতেন। হাসান হাটীর কাজির শিক্ষক খালাস নামক মোল্লাকে ছেঁড়া ইজারা পরিধান করতে দেখা যায়[১০২]।

১০১। মুকুন্দরাম, *কবি কঙ্কন চন্ডী*, পৃ-৮৬; উদ্ধৃতঃ Abdul Karim, প্রাগুক্ত, P-193।
১০২। বিজয়গুপ্ত, পৃ-৬১; উদ্ধৃতঃ Abdul Karim, P-193।

সাপের কামড়ে মৃত্যুবরণকারী হাসান হাটীর তাঁতি তার স্ত্রীর জন্য মাত্র চার পণ কড়ি (আধ আনার মত) রেখে গিয়েছিলেন[১০৩]।

আব্দুল করিম মনে করেন, জীবন যাত্রায় ব্যয় কম হওয়ায় স্বল্প আয়েও সাধারণ মানুষকে দুঃখ দুর্দশা তেমন পোহাতে হয় নি। আর সাধারণ মানুষের স্বল্প আয়ের সাথে চাহিদাও ছিল অতি অল্প। চৈনিক বিবরণে বলা হয়েছে " স্বর্গের ঋতুসমূহ মর্তের সম্পদ এ রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। সম্পদ ও সততায় এর অধিবাসীরা সম্ভবত চিন চিয়াং (পালেবাং) এর অধিবাসীদের ছাড়িয়ে যায় এবং তারা চাও-ওয়ার (জাভা) অধিবাসীদের সমতুল্য।"[১০৪]

নারীর অবস্থাঃ

ইসলামি আইনে নারীদের অধিকারের ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। মহানবী (সঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে নারীর অধিকারের ব্যাপারটি অত্যন্ত জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাংলার সুলতানী সমাজেও নারীর নিশ্চিত নিরাপদ অবস্থার কথা জানা যায়। পর্দাপ্রথা চালু ছিল এবং নারীদের মর্যদাসহকারে সযত্নে গৃহে রাখা হত। উচ্চ শ্রেনীর নারীদের রাত্রিকালে ভোজসভায় যোগদানের বিবরণ পাওয়া যায়। বারবোসা বলেছেন, তারা নিজেদের সযত্নে তালাবদ্ধ করে রাখতেন। কিন্তু স্বামীদের কাছে তারা ভাল ব্যবহার পেতেন এবং স্বামীরা তাদের প্রচুর পরিমাণে সোনা, রূপা এবং মিহি রেশমি পোশাক দিতেন[১০৫]। বারবোসার বিবরণে এও পাওয়া যায় যে, সমাজের বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং মুসলমানরা হিন্দু স্ত্রীও গ্রহণ করতেন।

১০৩। Abdul Karim, প্রাগুক্ত, P-193।
১০৪। *Visva Bharati Annals,* Vol-II, P-11; ড. এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪৩।
১০৫। Abdul Karim , পূর্বোক্ত, P-194।

ধর্মনিষ্ঠাঃ

সুলতানী সমাজের মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অভিজাত শ্রেণীর চেয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণী এবং বিশেষ করে আলিম-ওলামাগণ নিষ্ঠার সাথে ধর্মের চর্চা করতেন। তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন এবং পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারে ইসলামী ঐতিহ্য মেনে চলতেন। মুকুন্দরাম লিখেছেন- "তারা প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে এবং লাল কার্পেট বিছিয়ে প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ পড়ে। সোলেমানি মালাগুনে তারা পীর-পয়গম্বরের ধ্যান করে এবং পীরের মোকামে প্রদীপ জ্বালায়। তাদের দশ-বিশ জন একত্রে বিচার-আচার করে। মুসলমানগণ সদা সর্বদা কোরআন-কেতাব পাঠ করে। তারা অত্যন্ত জ্ঞানী এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা আর কাউকে ভয় করে না, প্রাণ গেলেও এরা রোজা ত্যাগ করে না।"[১০৬]

তবে আরব থেকে পারস্য পাড়ি দিয়ে ভারতে আসতে পথে ইসলামের সাথে অনেক অনৈসলামিক রীতিনীতিও সংমিশ্রিত হয়েছিল এবং ভারত ও বাংলার নওমুসলিমদের দ্বারা হিন্দু সংস্কৃতির অনেক কিছু মুসলিম সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছিল। নওমুসলিম বাঙালীদের ধর্মসংক্রান্ত জ্ঞানের ঘাটতি থেকে ধর্ম বিষয়ে দ্বিধা সংকোচ বেশী ছিল এবং বাংলা ভাষায় ধর্মীয় বিষয়ে লেখা গর্হিত কাজ মনে করত। শাহ্ মুহাম্মদ সগীর ও অন্যান্য কবিদের বর্ণনায় এ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীতে এ মনোভাব বর্জন করে বাংলা ভাষায় ধর্মচর্চা শুরু হয়[১০৭]।

১০৬। মুকুন্দরাম, *চন্ডীকাব্য*, পৃ-৩৪৪; উদ্ধৃতঃ Abdul Karim, প্রাগুক্ত, P-61।
১০৭। ড.এম.এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪১।

বাঙালী মুসলমানের চরিত্রঃ

চৈনিক দূতগণ বাংলার মুসলিমদের সততা ও সরলতার প্রশংসা করেছেন। মাহুয়ান বলেছেন যে, আচার ব্যবহারে তারা অকপট ও সরল[১০৮]। সি-ইয়াং চৌ-কুং তিয়েন-লু বলেছেন- বাংলার অধিবাসীরা ভাল স্বভাবের লোক, তারা ধনী এবং সৎ[১০৯]। সিং চা সেং লান বলেছেন- "বাংলার বণিকগণ এরূপ সৎ ছিলেন যে, তারা সর্বদা তাদের ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি মেনে চলতেন এবং চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে তারা কখনও দুঃখ প্রকাশ করতেন না, এমনকি এটা যদি দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার লেনদেনও হয়"[১১০]।

তৎকালে রচিত বাংলা সাহিত্যেও বাঙালী মুসলিমের চরিত্রের প্রশংসা পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে বীর নামক একটি নগরের মুসলমানদের সম্বন্ধে লিখেছেনঃ "তারা জ্ঞানী এবং বিদ্বান, কপটতা ও ফাঁকিবাজি তাঁদের নিকট অপরিচিত।"[১১১]

কিন্তু তোমে পিরেজ ঢালাওভাবে সব বাঙালী ব্যবসায়ীকেই অসৎ বলে অভিহিত করেছেন, যা সত্যি নয়। তবে কিছু অসৎ ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব ছিল, যাদের সাথে তোমে পিরোজের পরিচয় হয়েছিল। অবশ্য তোমে পিরেজ বাঙালীদের যে কোন জাতির চেয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে উল্লেখ করেছেন[১১২]।

১০৮। Mahuan's Account; উদ্ধৃতঃ ড.এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪১।
১০৯। *Visha Bharati Annals*, P-98-108; ড. এম. এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-২৪১।
১১০। পূর্বোক্ত।
১১১। মুকুন্দরাম, *চন্ডীকাব্য*, পৃ-৩৪৪; উদ্ধৃতঃ ড. এম. এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-২৪১।
১১২। সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩২-৬৩৩।

উৎসব ও বিনোদনঃ

ঈদ উল্ ফিতর, ঈদ উল্ আজহা, আকিকাহ্, বিয়ে, খাৎনা এসবই ছিল সুলতানী বাংলার মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব। তবে মোগল আমলের চেয়ে সুলতানী আমলের উৎসবাদিতে আড়ম্বরের মাত্রা কম ছিল। ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত এবং সেখানে নানা সাজসজ্জা, খেলাধুলা, নাচগান ও সুরাপানের আসর বসত। রাত্রিকালের উৎসবাদিতে মহিলারা যোগদান করতেন। অনেক সময় উৎসবাদিতে সোনার থালায় আপ্যায়ন করা হত। এটি অভিজাত্য প্রকাশের জন্য করা হত। তবে এটি সার্বজনীন রীতি ছিল না।

স্থাপত্য ও শিল্পকলাঃ

মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শিল্পকলার উন্নতি সাধন। নগর সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল মুদ্রা। মুসলিমগণ আসার আগে বাংলায় কড়ির প্রচলন ছিল। মুসলিমগণই এসে মুদ্রার প্রচলন করেন। সুলতানী আমলের সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে ঐ সময়ের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাসমূহ। মুদ্রার নির্মাণ শৈলী ছিল চমৎকার। বাংলার স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সময়ে সোনারগাঁ টাকশাল থেকে উৎপন্ন মুদ্রাসমূহ সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ.কে.এম. শাহনেওয়াজ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের মুদ্রাসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন-৭৩৯ হিজরি (১৩৩৮ খ্রিঃ) থেকে ৭৪৪ হিজরি (১৩৪৩ খ্রিঃ) এর মধ্যে উৎকীর্ণ মুদ্রাসমূহ সাদামাটা। ৭৪৪ হিজরি (১৩৪৩ খ্রিঃ) থেকে ৭৫০ হিজরি (১৩৪৯ খ্রিঃ) এর মধ্যে উৎকীর্ণ মুদ্রাসমূহের শিল্পগুণ উচ্চমানের ও দৃষ্টি নন্দন। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে স্বাধীনতা গঠনের প্রথম দিকে আত্মরক্ষা ও স্থিতি স্থাপনের দিকে নজর দেয়ায় মুদ্রার শিল্পমানের দিকে নজর দেয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে সমাজে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুদ্রার নির্মাণ শৈলীতে ক্রমাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে[১১৩]।

১১৩। এ.কে.এম. শাহনেওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ-৩৮ ।

সোনারগাঁয়ে মুদ্রা অঙ্কনের একটি শিল্পী সমাজ গড়ে উঠেছিল। নলিনীকান্ত ভট্টশালী সোনারগাঁয়ের শিল্পীদের দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন[১১৪]। সোনারগাঁ ছাড়া লখনৌতি ও বাংলার অন্যান্য স্থানে টাকশাল গড়ে উঠেছিল। তবে সব টাকশালের মুদ্রার মান সমান ছিল না। মুদ্রায় ইসলামী ও হিন্দু ঐতিহ্যের ছাপ ছিল। মুদ্রায় যেমন কালেমা খচিত ছিল তেমনি আবার অশ্বারোহী, ষাঁড়, সিংহ, লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি বা সূর্যের ছবি ছিল[১১৫]।

শিলালিপি ও স্থাপত্য নির্মাণে মুসলিমগণ বরাবরই ইতিহাস চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, প্রাসাদ, সেতু, ঈদগাহ, ফটক, পুকুর এবং কুয়ো প্রভৃতি নির্মাণ বা খননের সময় নির্মাতাদের নাম ও নির্মাণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে শিলালিপি উৎকীর্ণ করার রেওয়াজ ছিল।

এই শিলালিপিসমূহ ইতিহাস চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হওয়ার পাশাপাশি শিল্পকলার একটি অংশে পরিণত হয়েছে। শিলালিপি সমূহ সাধারণত আরবী ও ফার্সি ভাষায় উৎকীর্ণ এবং কুরআনের আয়াত ও হাদিসের বাণী সংযুক্ত থাকত। পদ্ধতিগত দিক থেকে শিলালিপি অঙ্কনে অভিনবত্ব ছিল বলে এ কে এম শাহনেওয়াজ মনে করেন। মুসলিম ক্যালিগ্রাফি এই রীতিকে বিশেষত্ব দান করেছিল। সুলতানী আমলের শিলালিপিসমূহ তোঘরা রীতির লিপি অনুযায়ী লিখিত। তবে বাংলার তোঘরা লিপির লিখন কৌশলের সাথে বিশ্বের আর কোন হস্তলিখন শিল্পের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না[১১৬]।

১১৪। N.K Bhattasali, *Coins and Choronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, 1922; এ কে. এম শাহনেওয়াজ ,পৃ-৩৮।

১১৫। এ. কে. এম. শাহনেওয়াজ, পৃ-৪০ ।

১১৬। Pares Islam Syed Mustafizur Rahman, *Islamic Calligraphy in Medieaval India*, P-XI; এ. কে. এম. শাহনেওয়াজ, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৩।

ইউসুফ শাহের সুলতানগঞ্জ শিলালিপি, হুসেন শাহের মুর্শিদাবাদ শিলালিপি, খুলনার আরশা নগরের একটি শিলালিপি (বর্তমানে বরেন্দ্র জাদুঘরে রক্ষিত)তে এই তোঘরা রীতির লিপি দেখা যায়। বিসমিল্লাহ্ দিয়ে শিলালিপির লিখন শুরু করা হয়েছে এবং লিপির মাঝখানে ও আশেপাশে বিভিন্ন শৈল্পিক অলঙ্করণে শোভা বৃদ্ধি করা হয়েছে[১১৭]।

সুলতানী বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি সাধিত হয়েছিল। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহসমূহ, সুলতানদের প্রাসাদ ছিল এই সময়ের স্থাপত্যের নিদর্শন। সুলতানী যুগের স্থাপত্য সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন যে বাংলার স্থাপত্য স্বীয় অবদানে ঐশ্বর্যমন্ডিত এবং নিজস্ব স্টাইলের জন্য বিখ্যাত। এই নিজস্বতার উদাহরণ হচ্ছে পোড়ামাটির ফলক ও পাথরে উৎকীর্ণ নকশা, ধনুক চক্র, ছাদ, চালাঘর সদৃশ খিলান ছাদ, উল্টানো পেয়ালার মত ডিম্বাকৃতির গম্বুজের ব্যবহার ইত্যাদি। বাংলার স্থাপত্যের এই বৈশিষ্ট্যসমূহ বহির্বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য থেকে একে পৃথক করেছে[১১৮]।

চীনা রাষ্ট্রদূতদের বর্ণনা থেকে বাংলার সুলতানদের রাজপ্রাসাদের কারুকার্যের কথা জানা যায়। আরবি কবিতায় লেখা একটি শিলালিপিতে সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহের রাজপ্রাসাদের একটি মনেরাম বিবরণ রয়েছে[১১৯]।

স্থাপত্য শিল্পে 'করবেল' পদ্ধতির স্থলে খিলানের প্রবর্তন হয়। ইটের উপর ইট দিয়ে আকাশচুম্বী মন্দির তৈরির স্থলে মুসলিমদের মসজিদে গম্বুজ ও মিনার নির্মিত হয়, স্থাপত্য শিল্পে 'মর্টার' বা সুরকির ব্যবহার মুসলিমদের অবদান।

১১৭। এ কে এম শাহনেওয়াজ, পৃ-৪৫।

১১৮। আবুল বাসার মোসারফ হোসেন, সুলতানী বাংলায় স্থাপত্য শিল্প; একটি পর্যালোচনা ইতিহাস, ১০ম বর্ষ, ১৩ সংখ্যা ১৩৮৩, পৃ-৩৯; উদ্ধৃত, এ কে এম শাহনেওয়াজ, পৃ-১৭৮।

১১৯। রমেশচন্দ্র মজুমদার, মুসলিম সংস্কৃতি কমলা বক্তৃতামালা, পৃ-৩৩, উদ্ধৃত; এ কে এম শাহনেওয়াজ, পৃ-১৭৮।

স্থাপত্য ও প্রস্তরের গায়ে নাম, নাসতালীক এবং তোঘরা রীতির লিখন পদ্ধতির প্রকাশ ও অলঙ্করণ সৌন্দর্যবোধকে আরও ফুটিয়ে তুলত। অনেক সময় পোড়ামাটির অলঙ্করণে লতাগুল্ম, গাছপালা, ফুল ও ফলের ছবি ফুটিয়ে তোলা হত। গৌড়ের দারসবাড়ি মসজিদ ও বাঘা মসজিদে পোড়ামাটির অলঙ্করণ এর উৎকৃষ্ট প্রমান[১২০] ।

সুলতানী আমলের স্থাপত্য কলার একটি তালিকা প্রদত্ত হল[১২১]ঃ

১. আদিনা মসজিদ (মালদহ)
২. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধি (সোনারগাঁ)
৩. একলাখী ভবন (মালদহ)
৪. চিকা মসজিদ (গৌড়)
৫. কোৎওয়ালী দরওয়াজা (গৌড়)
৬. বাইশগজী (গৌড়)
৭. দাখিল দরওয়াজা (গৌড়)
৮. চামকাটি মসজিদ (গৌড়)
৯. তাঁতিপাড়া মসজিদ (গৌড়)
১০. ধুনিচক মসজিদ (গৌড়)
১১. লোটন মসজিদ (গৌড়)
১২. দরাসবাড়ী মসজিদ (গৌড়)
১৩. খনিয়া দীঘি মসজিদ (গৌড়)

১২০। এ কে এম ইয়াকুব আলী, বরেন্দ্র ভূমিতে মুসলিম ইতিহাস ও সভ্যতার ধারা, বা.এ.প, কার্তিক-পৌষ ১৩৮৮, ২৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ-১১।

১২১। সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৮২।

১৪.ফিরোজ মিনার (গৌড়)

১৫.বড় সোনা মসজিদ (গৌড়ের বৃহত্তম মসজিদ)

১৬.গুণমন্ত মসজিদ (গৌড়)

১৭.গুমটি দরওয়াজা (গৌড়)

১৮. কদম রসূল ভবন (গৌড়)

১৯.ঝনঝনিয়া মসজিদ (গৌড়)

২০. ফতেহ খানের সমাধিভবন (গৌড়)

২১. ছোট সোনা মসজিদ (গৌড়)

২২.খান জাহানের সমাধি (বাগেরহাট)

২৩.ষাট-গম্বুজ মসজিদ (বাগেরহাট)

২৪. মসজিদকুর মসজিদ (খুলনা জেলার মসজিদপুর গ্রামে)

২৫.কসবা মসজিদ (বাখেরগঞ্জ)

২৬.মসজিদবাড়ি মসজিদ (বাখেরগঞ্জ)

২৭.সালিকুপা মসজিদ (ঝিনাইদহ)

২৮. বাবা আদমের মসজিদ (ঢাকা)

২৯. শঙ্করপাশা মসজিদ (সিলেট)

৩০. বাঘা মসজিদ (রাজশাহী)

৩১. নবগ্রাম মসজিদ (পাবনা)

৩২. শাহজাদপুর মসজিদ (পাবনা)

৩৩. সুরা মসজিদ (দিনাজপুর)

৩৪. মোল্লা সিমলা (হুগলী) গ্রামের মসজিদ

৩৫. গোপালগঞ্জ (দিনাজপুর) গ্রামের মসজিদ

৩৬. কালনার (বর্ধমান) মজলিস সাহেবের মসজিদ

৩৭. বাগেরহাটের (খুলনা) সালিক মসজিদ

৩৮. খেরৌল গ্রামের (মুর্শিদাবাদ) মসজিদ

৩৯. শ্রীহট্টের রুকন খানের মসজিদ

৪০. বড় গোয়ালি গ্রামের (কুমিল্লা জেলা) মসজিদ (নির্মাণকাল ৯০৬ হিজরি বা ১৫০০ খ্রিঃ)

দুই. মোগল আমলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি

মোগলদের বাংলা অধিকারঃ

মোগল আমল সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বার ভূঁইয়াদের সমন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান দাউদ খান কররানী মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি খানজাহানের নিকট পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় আফগান শাসনের অবসানের সাথে সাথে স্বাধীন সালতানাতের অবসান হয়। কিন্তু স্বাধীন সালতানাতের পতনের সাথে সাথেই মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে আরও দীর্ঘ দিন সময় লাগে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬১২ সালে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সালতানাতের পতন এবং মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী ৩৬ বছর বাংলা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সেনানায়ক বা বার ভুঁইয়া নামে পরিচিত ছোট ছোট জমিদারদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। এই ভুঁইয়াগণ সম্মিলিত ভাবে মোগল আক্রমন প্রতিহত করে বাংলার স্বাধীনতা টিকিয়ে রেখেছিলেন। তবে বার ভুঁইয়াগণ তাদের সময়ের পুরোটাই যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকায় সমাজ সংস্কৃতির বিকাশে তেমন একটা ভূমিকা রাখতে পারেননি।

আর সুলতানী আমলের ধারাবাহিক ইতিহাস আমাদের হাতে না থাকায় এ সময়ের অনেক তথ্য অজানা রয়ে গেছে।

তবে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে, এই ক্ষুদ্র ভুঁইয়াগণ ৩৬ বছর ধরে শক্তিশালী মোগলদেরকে ঠেকিয়ে রাখার পেছনে তাঁদের যে বীরত্ব, মনোবল ও সাহস কাজ করেছে তা প্রশংসার দাবিদার। স্বাধীনতার চেতনা ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু মুসলিম ভুঁইয়াগণ একত্রিত হয়ে আঞ্চলিক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

মোগল সম্রাট হুমায়ুন প্রথম ১৫৩৮ সালে বাংলা জয় করেন এবং মাত্র কয়েক মাস বাংলা অধিকার করে রাখেন। তিনি রাজধানী গৌড়ের নাম দিয়ে ছিলেন জান্নাতাবাদ। ১৫৭৬ সালে দাউদ কররানীর নিকট থেকে সম্রাট আকবর বাংলা অধিকার করেন। এসময় উত্তর এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু এলাকায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভাঁটি অঞ্চল ছিল বার ভূঁইয়াদের অধীনে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খান বার ভূঁইয়াদের পরাজিত করে সমগ্র বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কামরূপ, কুচবিহার, কাছাড়, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও মোগল শাসন বিস্তার লাভ করে। সুবাদার মীর জুমলা আসামের রাজাদেরও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। শায়েস্তা খান আরাকানদের কাছ থেকে ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম জয় করেন।

মোগল সাম্রাজের অন্তর্ভূক্ত হয়ে বাংলা সালতানাত সুবা বাংলায় পরিণত হয়। সুবাদারদের অধীনে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির নবরূপায়ণ শুরু হয়। সুলতানী আমলের সমাজ সংস্কৃতির ধারায় নানা সংযোজন বিয়োজন ঘটে। প্রথম দিকে রাজধানী গৌড় ও তান্ডা থেকেই শাসন পরিচালনা করা হয়। কিন্তু অচিরেই বাংলার কেন্দ্রস্থল পরিবর্তিত হয়। মানসিংহ রাজধানী তান্ডা থেকে আকবর মহলে (রাজমহল) স্থানান্তরিত করেন। ১৬০৮ সালে ইসলাম খান

'জাহাঙ্গীর নগর' নাম দিয়ে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। সেই থেকে ঢাকা কেন্দ্রীক নবতর বাংলার যাত্রা শুরু হয়।

সুবা বাংলার শাসন ক্ষমতায় বিভাজন ছিল। শাসন সংক্রান্ত (নিযামত) দায়িত্বে ছিলেন সুবাদার এবং রাজস্ব প্রশাসনের (দীউয়ানী) প্রধান ছিলেন দীউয়ান। সুবাদার ও দীউয়ান কেউ কারো অধীনস্থ ছিলেন না। ফলে মাঝে মাঝেই দু'য়ের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিত। তবে সুবাদারকেই প্রদেশের প্রধান বলা যায়। পরবর্তীতে সুবাদারগণ স্বাধীনভাবে নিজামত শাসন করতে থাকেন এবং 'নবাব' নামে পরিচিতি পান।

মোগল সুবাদার ও নবাবদের শাসন প্রকৃতি:

সুবাদারগণ সম্রাটের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন এবং সম্রাটের অনুমতি ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন না। যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপন, কঠিন শাস্তি প্রদান, ঝরোকা দর্শন, হাতের লড়াই অনুষ্ঠান প্রভৃতি কাজ যা সম্রাটের রাজকীয় অধিকার ও মর্যাদার অন্তর্ভূক্ত ছিল যেসব সুবাদারদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বাংলার সুবাদারগণ প্রায়ই অধিকতর ক্ষমতা ও সুবিধা ভোগ করতে প্রয়াস পেতেন। আর বাংলা কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী হওয়ায় মোগল সাম্রাজ্যের জন্য একটি সমস্যাপূর্ণ প্রদেশ ছিল[১২২]। সুবাদার ইসলাম খান ছিলেন প্রথম সার্থক সুবাদার। কিন্তু তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ ও সুযোগ সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করতেন। তিনি ঝরকায় বসতেন এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে চৌকিতে উপস্থিত থেকে সুবাদারকে কুর্ণিশ ও তসলিম করতে বাধ্য করতেন। সম্রাটের কাছে এই অভিযোগ উত্থাপিত হলে সম্রাট ইসলাম খানকে তিরস্কার করে ১৭ দফা হুকুম জারি করে ফরমান পাঠিয়ে ছিলেন[১২৩]। মোগল সুবাদারগণ দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। অনেক সুবাদার প্রশাসন পরিচালনায়

১২২। ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৩।
১২৩। ড. এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৩।

বাড়াবাড়ি রকম কঠোরতা প্রদর্শন করলেও তাদের ইতিবাচক পদক্ষেপও ছিল। মোগল আমলে বাংলায় অনেক স্থাপত্য নির্মিত হয়েছে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতির উন্নয়নে সুবাদার ও নবাবগণ গুরব্বত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সুবাদার শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে দক্ষতার সাথে প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করেন। তিনি সুবিচার ও জনগণের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, দুঃস্থ ও বিধবাদের প্রচুর দান করতেন। তাঁর দানকার্যকে অপব্যয় হিসেবে আখ্যা দিয়ে মোগল বাদশাহের কাছে পর্যন্ত অভিযোগ দাখিল করা হয়েছিল। পরে অবশ্য তিনি বাদশাহকে সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। তাঁর সময়কালকে বাংলায় মোগল আমলের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বিবেচনা করা হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর প্রশংসা করতেন[১২৪]। শায়েস্তা খানের সময়ে বহু সরাই, পুল, রাস্তা নির্মিত হয়েছে[১২৫]। সুবাদার ও নবাবগণ জনগণের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকতেন এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। নবাব মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব আদায়ে অত্যন্ত কঠোর হলেও বিচারকার্যে ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। নিজের অপরাধী পুত্রকে ইসলামী আইন অনুসারে প্রাণদন্ড দিয়েছিলেন[১২৬]।

তবে সার্বিকভাবে এসময়ে এসে ধর্মনিষ্ঠার ঘাটতি দেখা দিতে থাকে। সমাজে শিল্পীদের প্রাধান্য বেড়ে যায়। বাংলায় প্রচুর ইরানীদের আগমন ঘটে। কারণ নবাবদের কেউ কেউ শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন এবং ইরানীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। এসময় রাজনৈতিক সংকটের কারণে ইরানীরা বাংলায় আশ্রয় নেয়। এ সময় বাংলায় মহরম ও বেরা উৎসবের প্রচলন ঘটে।

১২৪। *রিয়াজ*, পৃ-১২১।
১২৫। পূর্বোক্ত।
১২৬। পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৫।

নবাব মুর্শিদকুলী খান ঈদ-ই মিলাদুন্নবী উদযাপন করতেন । নবাব জাফর খান অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং আলিম-ওলামাগণের পৃষপোষকতা দান করতেন। জনদূর্ভোগ এড়াতে তিনি মজুতদারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারি রাখতেন। তিনি রাজস্ব আদায়ে অত্যাচার নিপীড়ন বন্ধ করেছিলেন। বাংলার নবাব সুবাদারগণ ব্যক্তি জীবনে কেউ অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, কেউ আবার ভোগ বিলাসী ছিলেন, কেউ যোগ্যতা দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন আবার কেউ দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন; তবে প্রজা পীড়ক হিসেবে ইতিহাসে কেউ চিহ্নিত হন নি। পলাশী পরবর্তী সময়ে নবাব সিরাজের চরিত্র হননের চেষ্টা করা হলেও তিনি তার চরিত্রের নেতিবাচক দিকসমূহকে ছাপিয়ে একজন দেশপ্রেমিক, জনদরদী ও সরল স্বভাবের শাসক হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন।

শিক্ষাব্যবস্থাঃ

মোগল আমলে বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক জোরদার হওয়ায় সুলতানী আমলে শিক্ষা সংস্কৃতির ধারায় গতি সঞ্চার হয়। মোগল আমল ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জল যুগ। মোগল সম্রাটগণ, যুবরাজ, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও রাজকর্মচারীগণ উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিলেন এবং তাদের দরবারসমূহ জ্ঞানী ও গুনীদের দ্বারা মুখরিত ছিল। রাজদরবারের জ্ঞান চর্চার প্রভাব প্রদেশসমূহেও এসে পড়েছিল।

ড.এম.এ. রহিমের মতে সুবাদার, দীউয়ান, বখশি, সদর, কাজি, ওয়াকিয়ানবিশ, ফৌজদার ও অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ যারা বাংলায় আগমন করেন তারা সকলেই শিক্ষা ও সুরুচির ক্ষেত্রে তাদের বিশিষ্টতা এবং পন্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তির প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। খান খানান মুনিম খান, খান জাহান, রাজা মানসিংহ, ইসলাম খান, কাসিম খান, ইব্রাহিম খান, ফতেহজঙ্গ, শাহাজাদা শুজা, মিরজুমলা, শায়েস্তা খান, যুবরাজ

মুহাম্মদ আজম, আজিম উশ শান ও অন্যান্য সুবাদারগণ তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁরা জ্ঞান ও প্রতিভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন[১২৭]।

নওয়াব জাফর খান সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কুরআন নকল করতেন। তার অধীনে দু'হাজার কারী নিয়োজিত ছিলেন। তারা প্রতিদিন পুরো কুরআন পাঠ করতেন এবং নওয়াবের লিখা কপি সংশোধন করে দিতেন। তিনি কারীদের জন্য নিজের বাবুর্চি খানা থেকে হরিণ, পাখি ও অন্যান্য পশুর মাংসসহ নানা উপাদেয় খাদ্য দুবেলা সরবরাহ করতেন। শেখ, সৈয়দ, আলিম ও ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গ তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন এবং তাঁদের পরিচর্যা করা পুণ্যের কাজ মনে করতেন[১২৮]। বীরভূমের জমিদার আসাদুল্লাহ্ ধার্মিক ও দরবেশতুল্য ছিলেন। তিনি তার সম্পত্তির অর্ধেক বিদ্বান, ধার্মিক ও দরবেশদের জন্য মদদ-ই-মা'শরূপে দান করেছিলেন এবং গরিব ও দুঃস্থদের জন্য দৈনিক দান বরাদ্দ করেছিলেন। এ কারণে মুর্শিদ কুলী খান তার উপর রাজস্ব আদায়ে কড়াকড়ি আরোপ করতেন না[১২৯]।

এ ঘটনাটি মোগল আমলে নবাব ও জমিদারদের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মুর্শিদকুলী খান বিদ্বান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের জন্য বৃত্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি ২৫০০ জন কারী ও জপকারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন যারা কুরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য পুণ্যকর্মে নিয়োজিত ছিলেন[১৩০]। নবাব শুজাউদ্দীনের জামাতা জাহাঙ্গীর নগরের উপপ্রশাসক ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন স্বভাব কবি এবং 'মাখফী' ছদ্মনামে কবিতা রচনা করতেন। তিনিও কবি ও বিদ্বান লোকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নবাব আলিবর্দি খান প্রতিভা ও সংস্কৃতির উচ্চ প্রশংসা করতেন এবং শিল্পী ও শিক্ষিত

১২৭। ড.এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২২৫।

১২৮। *রিয়াজ*, পৃ-১৪৭-১৪৮।

১২৯। *রিয়াজ*, পৃ-১৩৪-১৩৫।

১৩০। Abdul Karim, *Murshid Quli khan and His times*; P-238 আবদুর রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২২৭।

ব্যক্তিদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। তিনি উলেমা ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনায় আনন্দ পেতেন এবং প্রত্যহ তাদের নিয়ে আলোচনা সভা করতেন। নবাব শুজাউদ্দীন নিজেও উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সময়ে শিক্ষা সংস্কৃতির বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

সুলতানি আমলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মোগল আমলে আরও বেশি সমৃদ্ধ হয়। পাশাপাশি নতুন নতুন মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতানী আমলের বাংলার রাজধানী 'গৌড়' মোগল আমলের প্রথম দিকেও রাজধানীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। গৌড়ে বখতিয়ার খলজী ও তার সভাসদবর্গ, গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজী, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহ মোগল আমলেও শিক্ষার প্রয়োজন পূরণ করেছিল। পান্ডুয়ায় নূর কুতুব উল আলমের মাদ্রাসা ও চিকিৎসালয় ব্রিটিশ শাসনামল পর্যন্ত জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র রূপে পরিচিত ছিল।

শেখ শরফউদ্দিন আবু তাওয়ামার সোনারগাঁ মাদ্রাসার খ্যাতি দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বার ভূঁইয়াদের রাজধানী ছিল এই সোনারগাঁ। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এই মাদ্রাসার খ্যাতি অব্যাহত ছিল। শেখ আলাউল হক, তার দৌহিত্র শেখ বদর ই ইসলাম এবং প্রপৌত্র শেখ জাহিদ প্রমূখ বিদ্বান ব্যক্তি সোনারগাঁয়ে কিছুকাল বসবাস করেন।

কাজী আলী নাসির মুহম্মদ ও বাসার খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা দুটি সাতগাঁওয়ে শিক্ষার বিকাশ ঘটায় এবং ষোড়শ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত সাতগাঁও শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতির কেন্দ্র ছিল। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে বাংলার নবাবদের অধীনে হুগলীর উত্থান ঘটলে সাতগাঁওয়ের মর্যাদা কমে যায়। হুগলীতে পারস্য দেশীয় বহু বণিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি বসতি স্থাপন করেন এবং এসব শিয়া ব্যক্তিবর্গ নতুন ইমাম বাড়া নির্মাণ করেন। ফলে হুগলী সে

Dhaka University Institutional Repository

যুগের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। বীরভূম সুলতানী ও মোগল দু আমলেই গুরুত্বপুর্ণ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। বীরভূম জেলার নাগোরে হামিদ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে একটি শিৰাকেন্দ্র ছিল। হামিদউদ্দিন ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ ও শেখ নূর কুতুব উল আলমের শিক্ষা গুরু। বাংলার নবাবদের অধীনে বীরভূমের বিদ্যোৎসাহী জমিদারগণ শিক্ষা ও বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জমিদার আসাদউল্লাহ্ খানের বিদ্বান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রতি অনুরাগ এর প্রমাণ দেয়। মি. এডাম তার শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে বাংলা ও বিহারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দ্বারা পরিচালনার কথা উল্লেখ করেছেন[১৩১]। তিনি বিশেষ করে বীরভূমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন যেখানে ছাত্রদের শিক্ষা ব্যয় বহনের পাশাপাশি অনেক সময় বৃত্তিও দেয়া হত[১৩২]।

সপ্তদশ শতকে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোর্ট জ্ঞাচর্চার কেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়ে উঠে। মাওলানা হামিদ দানিশমান্দ এখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি মুজাদ্দীদ-ই-আলফ-ই-সানী শেখ আহমদ সিরহিন্দী এর শিষ্য ছিলেন। সমাজসংস্কার ও শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি নিজ জন্মভূমিতে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট শাহজাহান ১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর দরগাহের নিকট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন[১৩৩]।

রাজশাহীর বাঘা মাদ্রাসার জৌলুস মোগল আমল পর্যন্ত টিকে ছিল। মোগল পরিব্রাজক আবদুল লতিফ বাঘা মাদ্রাসার আকর্ষণীয় বিবরণ দিয়েছেন[১৩৪]। সম্রাট শাহজাহান এই

১৩১। A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal* 1757-1856, Bangla Academy, Dacca 1977; P-172.

১৩২। A. R. Mallick, পূর্বোক্ত, P-172।

১৩৩। এনামুল হক, *বঙ্গে সুফি প্রভাব*, পৃ-১৮৫; ড. এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৩৩।

১৩৪। ড. এম. এ. করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রবন্ধ- আব্দুল লতীফের ভ্রমন কাহিনীর পুর্নমূল্যায়ন, পৃ-২২।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসায় লাখেরাজ জমি দান করেছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের উনিশতম বছরের একটি সনদ থেকে জানা যায় যে, তিনি শাহাজাদা থাকাকালে মাদ্রাসার জন্য মাওলানা আব্দুল ওহাবকে যে মাদদ-ই-মা'শ দান করেছিলেন তা এই সনদে অনুমোদিত হয়[১৩৫]। মি. এডামের রিপোর্টেও বৃত্তিভোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাঘা মাদ্রাসার নাম উঠে এসেছে। এই মাদ্রাসা স্থানীয় ৪২টি গ্রামের করমুক্ত রাজস্বের অধিকারী ছিল।

মি. এডামের রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে A.R. Mallick বলেছেন "At Qasbah Bagha, for example all the pupils besides instruction received lodging, clothing (and its laundry) food, oil and stationary including what was necessary for copying manuscripts to be used as text books"[১৩৬]

রংপুরের ঘোড়াঘাট মুসলিম বিজয়ের শুরু থেকেই শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। শাহ ইসমাইল গাজীর দরগাহ এখানে অবস্থিত। ঘোড়াঘাট ষোড়শ শতক থেকে শাত্তারিয়া সিলসিলাহ এর সুফিদের কেন্দ্র ছিল। এই সুফিগণ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন[১৩৭]। শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে ঘোড়াঘাট মোগল আমল পর্যন্ত তার অবস্থান ধরে রেখেছিল। মোগল পরিব্রাজক আব্দুল লতিফ ঘোড়াঘাটের ইসমাইল গাজীর কথা উল্লেখ করেছেন। মুসলিম শাসনামলে চট্টগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। বাংলার বৃহত্তম সমূদ্রবন্দর ও সামরিক সদর দপ্তর হওয়ায় এখানে যেসব শাসনকর্তা ও রাজ-কর্মচারীবৃন্দ এসেছিলেন তারা উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন ছিলেন। তারা বিদ্বান ব্যক্তিদের সাহচার্য ভালবাসতেন, তাদের দরবারে সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান করতেন এবং কবি ও পণ্ডিতদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতেন।

১৩৫। ড. এম.এ. রহিম, ২য় খন্ড, পৃ-২৩৩।

১৩৬। Adam, Second Report, P-59, A. R Mallick , *British Policy and the Muslims in Bengal,* P-173.

১৩৭। আ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৩৪।

চট্টগ্রামে বহু সুফি, পন্ডিত ও কবির আর্বিভাব হয়েছে। তারা বাংলা, ফার্সি ও আরবি সাহিত্যে এবং ধর্মতত্ত্ব, আইন, হাদীস, সুফিবাদ ও অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। চট্টগ্রাম শিল্প ও শিক্ষাকেন্দ্রের মর্যাদা অধিকার করেছিল এবং কোম্পানি শাসনামল পর্যন্ত বজায় ছিল। চট্টগ্রামে মুসলিম শাসনামলের বৃত্তিভোগী বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কোম্পানি আমলেও ছিল[১৩৮]।

ইসলাম খানের সময় থেকে বাংলার নতুন রাজধানী জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থ সুবহ-ই-সাদিক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ড.এম.এ. রহিম বর্ণনা করেছেন যে, বহু পণ্ডিত, কবি, বিদ্বান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি সপ্তদশ শতকে জাহাঙ্গীরনগরে বাস করতেন[১৩৯]। মির্যা নাথানের বর্ণনায় জাহাঙ্গীরনগরের একটি মাদ্রাসার কথা জানা যায়, যেখানে ইসলাম খানের পুত্র শিক্ষা লাভ করেছিলেন[১৪০]। বড় কাটরা ও ছোট কাটরা নামে পরচিত ভবন দুটোও মাদ্রাসা ছিল বলে ড.এম.এ. রহিমের অভিমত। লালবাগের শাহী মসজিদও একটি মাদ্রাসা ছিল। শিক্ষকদের বেতন ভাতা এবং মাদ্রাসার রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ব্যয়ভার প্রাদেশিক কোষাগার থেকে নির্বাহ করা হত। এই মাদ্রাসার শেষ ওস্তাদ ছিলেন মৌলভী আসাদউল্লাহ্ [১৪১]।

স্বাধীন নবাবদের অধীনে বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। গোলাম হোসেন সলীম মুর্শিদাবাদের পণ্ডিত, আলিম, চিকিৎসক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তিদের একটি বৃহৎ তালিকা দিয়েছেন। উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছাড়া এত বিদ্বান ব্যক্তির উপস্থিতি সম্ভব নয়। মুর্শিদ কুলী খান কাটরা

১৩৮। আ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৩৪।
১৩৯। ড.এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১৩৪।
১৪০। মির্জা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, অনুবাদ-খালেকদাদ চৌধুরী, দিব্য প্রকাশ, প্রথম অধ্যায়, পৃ-১৫৬।
১৪১। জেমস টেলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, বাংলা অনুবাদ, পৃ-২১৬।

মাদ্রাসা নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি অতিথিশালা হিসেবেও ব্যবহৃত হত এবং সরকার এর রক্ষণাবেক্ষণ করত, এমনকি অষ্টাদশ শতকের শেষদিকেও 'কাটরা' মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়[১৪২]।

মোগল যুগে আজিমাবাদ (পাটনা) প্রসিদ্ধ জ্ঞান কেন্দ্র হয়ে উঠে। নবাব আলিবর্দী খানের অধীনে আজিমাবাদের শাসনকর্তা জৈনুদ্দীন একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভূমি দান করেন[১৪৩]। শহরের বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ করে গোলাম হোসেন তবাতবায়ি বলেন- "সে সময়ে আযিমাবাদ সুবাতে বেশ কয়েকজন পন্ডিত লোক ছিলেন যারা বিজ্ঞান ও শিৰাদিৰাকে ভালবাসতেন এবং তারা শিৰা গ্রহণ ও শিৰাদানে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। আমি নিজে এ নগরের উপকণ্ঠে নয় থেকে দশজন বিখ্যাত শিৰাবিদ ও তিনশ' থেকে চারশ ছাত্র ও শিষ্যকে অবস্থান করতে দেখেছি। তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, বড় শহরে ও গ্রামাঞ্চলে এ রকম কত লোক ছিলেন।"[১৪৪]

নবাবী আমলে পূর্ণিয়া শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিচিত লাভ করে। নবাব আলিবর্দী খান এবং তাঁর ভাতুষ্পুত্র ও জামাতা সৈয়দ আহমদ ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচন্ড অনুরাগী। তিনি এক দল বিদ্বান ব্যক্তির ভরণপোষণ করতেন এবং নিয়মিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে ধর্ম, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। গোলাম হোসেন তবাতবায়িও তার দরবারে এসব আলোচনায় অংশ নিতেন। তিনি সৈয়দ আহমদের জ্ঞানচর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

১৪২। Abdul Karim, *Murshid Quli Khan And His times*, P-242; ড.এম.এ. রহিম পৃ-২৩৫।
১৪৩। ড. এম.এ. রহিম, ২য় খন্ড, পৃ-২৩৫।
১৪৪। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন*, অনুবাদ-আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ-৪২০।

প্রাথমিক শিক্ষাঃ

সুলতানী আমলের মত মোগল আমলেও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রত্যেক মসজিদ, ইমামবাড়া ও অবস্থাপন্ন মুসলিমদের বাড়িতে মক্তব ছিল যেখানে এলাকার সব ছেলে মেয়ে বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ পেত। এই ঐতিহ্য বৃটিশ আমল পর্যন্ত চালু ছিল। ১৮৩৫ সালে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এডাম উল্লেখ করেছেন যে, বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। তিনি অনুমান করেছেন যে, দুটো প্রদেশের লোকসংখ্যা চার কোটি হলেও প্রত্যেক মক্তবে তিন শতকেরও বেশি বালক বালিকা পড়তে পারত। মি. এডামের মতে, এটা ব্যাপক হারে গ্রাম্যবিদ্যালয় থাকার এবং গরিব শ্রেণীর পিতামাতারও সন্তানদের শিক্ষাদানের নিবিড় আকাঙ্খার প্রমান দেয়[১৪৫]।

মোগল আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ করে H.G Roulinson বলেছেন যে, মোগল ভারতে উচ্চ পর্যায়ের সংস্কৃতি বহুল পরিমাণে চমৎকার শিক্ষা পদ্ধতির ফলশ্রুতি। তখন শিক্ষা ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হত। ধনী পিতা-মাতার সন্তান হলে, তাকে চার বছর বয়সে কোরআনের একটি অধ্যায় লিখে রৌপ্য বাঁধাই পাত উপহার দিয়ে শিক্ষকের হাতে তুলে দেয়া হত। পিতা-মাতা গরিব হলে পুত্রকে মোল্লা কর্তৃক পরিচালিত মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠান হত[১৪৬]।

সম্রাট আকবর শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেছিলেন। যে পাঠ্যসূচী আয়ত্ব করতে ছাত্রদের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হত, আকবরের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে একটি বালক মাত্র

১৪৫। এডামস রিপোর্ট, পৃ-৬, ড. এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ-২৪৫।
১৪৬। H.G. Roulinson, *India*, P-372; উদ্ধৃতঃ ড. এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

দুদিনে অক্ষর ও সপ্তাহ খানের মধ্যে শব্দসমূহ আয়ত্ব করতে পারত এবং অল্প সময়ের মধ্যে সে কবিতা পড়তে ও বুঝতে সক্ষম হত। ফলে ছাত্ররা খুব অল্প সময়ে পাঠ্য বিষয় আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছিল[১৪৭]।

সুলতানী আমলের মত মোগল আমলেও আরবী, ফার্সি, ও বাংলা এই তিনটি ভাষা চালু ছিল এবং ধর্মীয় নীতিমালা, গদ্য, পদ্য ইত্যাদি পড়ানো হত। প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল অঙ্কশাস্ত্র। যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ ও জমির পরিমাণ সংক্রান্ত কাঠাকিয়া, গন্ডাকিয়া, কড়াকিয়া ও বিঘাকিয়া প্রভৃতি শিক্ষা দেয়া হত। শুভঙ্কর নামে একজন প্রসিদ্ধ হিন্দু অঙ্কশাস্ত্রবিদের ছন্দবদ্ধ গণনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যা মি. এডামের দ্বিতীয় প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে। ক্রাফোর্ডের বিবরণে প্রাথমিক পর্যায়ে পদার্থবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ শিক্ষা দেয়ার কথা জানা যায়। হিন্দু পরিবারের সন্তানদের জন্য টোল কেন্দ্রিক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা চালু থাকলেও কায়স্থ পরিবারের অনেক সন্তান মক্তবে শিক্ষা গ্রহণ করত। রাজভাষা হিসেবে ফার্সি চালু থাকায় অনেক হিন্দু সন্তানরা গুরুত্ব দিয়ে ফার্সি শিখতেন। H.G. Roulinson এর বর্ণনায় এসেছে ঐ সময়ে কুরআন মুখস্ত করা একটা সাধারণ রীতি ছিল এবং হাদিস লিখন, পঠন, অঙ্কন ও ফার্সি ভাষার চর্চা এবং সুচারু লিখন পদ্ধতির চর্চা করা হত। কোন বালক কলা বা কারিগরি বিদ্যা আয়ত করতে চাইলে একজন ওস্তাদের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত[১৪৮]। স্ক্র্যাফটনের মতে অভিজাত পরিবারের ছেলেদের ৮/৯ বছর বয়সকালে অশ্বারোহণ ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেয়া হত[১৪৯]।

১৪৭। *আইন-ই-আকবরী*, প্রথম খন্ড, পৃ-২৮৮; উদ্ধৃত: ড. এম.এ. রহিম, ২য় খন্ড, পৃ-২৪৭।
১৪৮। H.G. Roulinson, *India*, P-372; উদ্ধৃত: ড.এম.এ. রহিম, ২য় খন্ড, পৃ-২৪৮।
১৪৯। ড. এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ-২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা:

মোগল আমলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা, অবস্থাসম্পন্ন মুসলিম ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টা ও জনসাধারণের বিদ্যোৎসাহিতার কারণে এই উন্নতি সম্ভব হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ে ধর্মীয় জ্ঞান ও লৌকিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। ধর্মীয় বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল কোরআন, হাদিস, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, ইতিহাস ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়। আর লৌকিক বিজ্ঞানসমূহের অন্তর্ভূক্ত ছিল তর্কশাস্ত্র, অঙ্ক, জ্যামিতি, বীজগণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়সমূহ। সম্রাট আকবরের সময়ের শিক্ষা সংক্রান্ত রেগুলেশনের বর্ণনায় আবুল ফজল বলেছেন যে, "প্রত্যেকটি বালকের পক্ষে নীতিশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্রের জন্য পদ্ধতি বা চিহ্ন, কৃষিবিদ্যা, জ্যামিতি, ক্ষেত্রবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, চিকিৎসা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, প্রশাসনবিদ্যা, জ্যোতিসশাস্ত্র, কারিগরি বিদ্যা, সঙ্গীত, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস ইত্যাদি শেখা আবশ্যক। এর সবগুলো বিষয়ই পর্যায়ক্রমে আয়ত্ব করা যেতে পারে। সংস্কৃত শিখতে গিয়ে ছাত্রদের বৈয়াকরণ (ব্যাকরণ), নৈয়াই (ন্যায়শাস্ত্র), বেদান্ত, পতঞ্জলি ইত্যাদি অধ্যয়ন আবশ্যক। বর্তমানকালে প্রয়োজন এরূপ কোন বিষয় কাউকে অবহেলা করতে দেয়া উচিত হবে না। এ সমস্ত বিধি বিদ্যালয়সমূহে নতুন আলোকের সঞ্চার করে এবং মাদ্রাসাগুলোর দীপ্তি বৃদ্ধি করে।"[১৫০]

১৫০। *আইন-ই-আকবরী*, প্রথম খন্ড, পৃ-২৮৮; ড. এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ-২৩৭-২৩৮।

আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে ঐ সময়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের পাঠ্যসূচী জানা যায়। আকবর শিক্ষা বিষয়ে যে উচ্চাভিলাষী ছিলেন তা বোঝা যায়। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যবিষয়কে বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন যাতে প্রত্যেকটি শিক্ষিত যুবক মৌখিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে।

সম্রাট আলমগীরও ধর্মীয় বিদ্যার পাশাপাশি লৌকিক বিষয়গুলোর শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান করতেন। ফরাসি পর্যটক বার্ণিয়ার সম্রাট আলমগীরের সাথে মোল্লা সালিহ নামে একজন শিক্ষকের কথোপকথন বর্ণনা করেছেন, যেখানে সম্রাট ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন, ভূগোল, ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভতি বিষয়ে যুবকের শিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন, যাতে সে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করে সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে[১৫১]।

আবদুর রহিম বার্ণিয়ারের বর্ণনার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে এই বর্ণনা সমকালীন শিক্ষার বিস্তারকে প্রমাণ করে। মি. এডাম তার প্রতিবেদনে বলেছেন যে আরবি বিদ্যালয়গুলোতে অত্যন্ত ব্যাপক পাঠ্যতালিকা ছিল। এতে ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ ব্যাকরণগ্রন্থ, ছন্দের পূর্ণ তালিকা, তর্কশাস্ত্র ও আইন এবং বাহ্যিক পর্যবেক্ষণসমূহের অধ্যয়ন এবং ইসলামের মূলনীতিসমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল। জ্যামিতিশাস্ত্রের উপর ইউক্লিডের এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর টলেমীর গ্রন্থাবলী অনূদিত হয়ে প্রাকৃতিক দর্শন ও সাধারণ দর্শনাশাস্ত্রের উপর নিবন্ধনসমূহের সঙ্গে একত্রে কোন কোন বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হত[১৫২]।

১৫১। বার্ণিয়ার, *ট্রাভেলস ইন মুগল এম্পারার*; এ কনস্টানস্, লন্ডন, ১৮৯১, পৃ-১৫৫-১৬০; উদ্ধৃত: ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৩৮।

১৫২। উদ্ধৃত: A.R. Mallick, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৫।

এডাম আরও মনে করেন, সংস্কৃত বিদ্যালয় অপেক্ষা মাদ্রাসার শিক্ষার বিষয় অনেক বেশী ব্যাপক ও উদার প্রকৃতির ছিল এবং মুসলিমদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যক্তিগণ বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।[১৫৩]

জেনারেল শ্লীম্যান ভারতীয় মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং এখানকার ছাত্রদের জ্ঞানগত দিক থেকে অক্সফোর্ডের ছাত্রদের সমান হিসেবে তুলনা করেছেন। তিনি শিক্ষিত ভারতীয় মুসলিমদের তুলনায় ইউরোপীয়দের জ্ঞানগত অপূর্ণতার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৫৪]

মোগল শাসনামলে চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ছিল। চিকিৎসা বিদ্যায় ইরানি, ইউনানি ও বৈদিক এই তিনটি উৎস ব্যবহৃত হত। মোগল আমলে প্রচুর ইরানী বাংলায় আগমন করেন এবং সাথে করে তাদের শিক্ষা সংস্কৃতিকেও বয়ে আনেন। বাংলায় ইরানী ও মধ্য এশিয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সুবাদার ইসলাম খানের চিকিৎসক হাকিম কুদসী ও মীর আলাউল মুল্ক ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ। সম্রাট আলমগীরের সময়ে ইউনানি চিকিৎসা প্রাধান্য পায় এবং এ বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ রচনা শুরু হয়। মুহাম্মদ রিজা সিরাজী 'রিয়াজ ই আলমগীর' নামে একখানা পুর্ণাঙ্গ ব্যবহারিক ঔষধ বিজ্ঞান গ্রন্থ সংকলন করেন।[১৫৫] রাজদরবারে প্রচলিত চিকিৎসাবিদ্যা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ বাংলা প্রদেশেও অনুসৃত হত। বাংলার বিখ্যাত চিকিৎসক হাকিম আল হাদীকে গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ প্লেটো ও গ্যালনের সাথে তুলনা করেছেন।[১৫৬]

১৫৩। W. Adam, Second Report, P-26-27; উদ্ধৃতঃ ড.এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ-২৩৯।

১৫৪। General Shleman, *Rambles and Recollections*, P-523; উদ্ধৃতঃ ড.এম.এ.রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৩৯।

১৫৫। S.M. Ikram, *History of Muslim Civilization in India & Pakistan*, P-473; উদ্ধৃতঃ ড. এম.এ. রহিম, পৃ-২৪০।

১৫৬। গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ, *সিয়ার*, (মূলগ্রন্থ), ২য় খণ্ড, পৃ-১০৭; দ্রষ্টব্যঃ ড. এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪০।

বার্ণিয়ার মুসলিম চিকিৎসকদের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। তারা ইবনে সিনা ও ইবনে রুশদের নিয়মাবলি অনুসরণ করতেন এবং গ্যালনের রীতি অনুযায়ী রক্তক্ষরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সূচনাতেই রোগদমনের ব্যবস্থা করতেন।[১৫৭]

মানুচি ও ইলফিনস্টোন এর বর্ণনায় জানা যায় যে, মুসলিম চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন এবং তারা কৃত্তিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন, পাথুরির চিকিৎসা, চক্ষুর ছানি অপসারণ, জরায়ু থেকে ভ্রূণ বের করে আনা ও প্রায় একশত সাতাশ রকমের অস্ত্র চিকিৎসার প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত ছিলেন। বাংলায় বৈদিক চিকিৎসাশাস্ত্র বেশ উন্নত ছিল এবং হিন্দু চিকিৎসকগণ এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। মির্জা নাথান ও ফিরিশতা এ ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। ফিরিশতা বৈদিক চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর 'দস্তর আল আত্তিবা' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন।[১৫৮]

সম্রাট আকবরের সময় থেকে জ্যোতিবির্দ্যার চর্চা বৃদ্ধি পায় এবং তা মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হয়। বাংলায় অনেক খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদের আবির্ভাব হয়। গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ নবাব আলীবর্দীর দরবারে অন্যতম পণ্ডিত মুহম্মদ হাজীনকে সে যুগের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। [১৫৯]

১৫৭। বার্ণিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩৮-৩৩৯; উদ্ধৃত: ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৪০।
১৫৮। S.M. Ikram, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৭৫।
১৫৯। গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ, *সিয়ার* (মূলগ্রন্থ) ২য় খণ্ড, পৃ-১৮১; দ্রষ্টব্য: ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

মোগল বাংলার উল্লেখযোগ্য বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল[১৬০]-

১. সৈয়দ সুলতান (কবি)

২. হাজি মুহাম্মদ (ঐ)

৩. শেখ পরান (ঐ)

৪. মীর মুহাম্মদ শফি(ঐ)

৫. নসরুল্লাহ খোন্দকার (ঐ)

৬. আলাওল (ঐ)

৭. আবদুল হাকিম (ঐ)

৮. মুহাম্মদ খান (ঐ)

৯. নওয়াজিস খান (ঐ)

১০. শেখ মনসুর (ঐ)

১১. সৈয়দ নাসির উদ্দীন (ঐ)

১২. আজমাতুল্লাহ্ (ঐ)

১৩. আলী রাজা (ঐ)

১৪. কাজি বদিউদ্দীন (ঐ)

১৫. গরীবুল্লাহ্ (ঐ)

১৬. মুহম্মদ (ঐ)

১৭. সৈয়দ হামজা (ঐ)

১৬০। তথ্যসূত্রঃ ড. এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ-২২৫-২৩০।

১৮. কাজী গোলাম মোজাফ্‌ফর (আলিবর্দীর সময়ে মুর্শিদাবাদের বিচারক)

১৯. মুহাম্মদ-সাদিক, সুবহ-ই-সাদিক গ্রন্থের লেখক।

২০. আলা উল মুলক (শাস্ত্রবিদ)। ‘মুহাদ্দার’, ‘আনয়ারুল হিদায়া’, “সিরাতুল ওয়াসিত” তাঁর রচিত বিখ্যাত তিনটি গ্রন্থ।

২১. মীর আবু আলা-মা-লী (আলাউল মূলকের ভ্রাতা, ধর্মতত্ত্ব ও আইনিবিদ)। ‘আল মুয়াজ্জাম-উল-উলুম’ তার কবিতার একটি সংকলন।

২২. মুহম্মদ ইয়াজদী, বিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তি, আবুল ফজলের বহু বছরের সাথী এবং আজমখানের সুবাদারি আমলে বাংলার কাজি।

২৩. আব্দুর রহিম, কবি ও হস্ত লিপিবিদ । তিনি খাজা এনায়েত উলল্বাহ্ এর পুত্র।

২৪. খাজা সায়েদ উদ্দীন মুহম্মদ মাশহাদী, একজন স্বভাব কবি ।

২৫. মুহম্মদ হোসেন মানেরী যাফ্‌ফারী (কবি ও হস্তলিপিবিদ)।

২৬. মাওলানা নাদিম জিলানী (কবি)

২৭. আহমেদ বেগ ইস্পাহানি (কবি)

২৮. মালিক মুবারাক, ‘জঙ্গনামা’ কাব্যের রচয়িতা

২৯. মাওলানা লোকমান, ‘জঙ্গনামা’ নামে মুসাখানের বিরুদ্ধে মোগলদের বিজয় সংক্রান্ত কাব্যের রচিয়তা ।

৩০. মির্জা নাথান, ‘বাহরীস্তান-ই-গায়বী’ এর রচিয়িতা।

৩১. মীর মুহম্মদ মাসুম, শাহজাদা শুজার পৃষ্ঠপোষকতায় ‘তারিখ ই শাহ শুজা’ নামে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে।

৩২. শিহাবউদ্দীন তালিশ, সম্রাট আলামগীরের সময়ে বাংলার প্রসিদ্ধ ইতিহাস বেত্তা। তিনি ‘ফাতহ ইয়া-ই ইবরিয়া’ নামে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন।

৩৩. গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ, 'সিয়ারুল মুতাখখিরিন' এর রচিয়তা।

৩৪. হাকিম তাজউদ্দীন, নবাব আলিবর্দী খানের চিকিৎসক।

৩৫. হাকিম হাদী আলীখান, আলিবর্দী খানের সময়ে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত চিকিৎসক। তাবাতাবাঈ তাকে প্লেটো ও গ্যালেনের সাথে তুলনা করেছেন।

৩৬. ইউসুফ আলী-'আহয়াল ই মহবৎ জঙ্গ', 'হাদীকাতুল সাফা', 'মাজমুয়া ই ইউসুফী' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

৩৭. করম আলী, 'মুজাফ্ফর নামা' গ্রন্থের রচয়িতা।

৩৮. মুহম্মদ ওয়াফা, নবাব আলিবর্দী খানের আমলের ইতিহাসবেত্তা। ১৭৪৮ সালে 'ওয়াকিয়াতই-ফতেহ-বাঙ্গালা' নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

৩৯. আজাদ হোসেন বিলগ্রামী-'নয়াবাহার ই মুর্শিদকলী খানী' নামে ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা।

নারী শিক্ষাঃ

লাইলী মজনু কাব্য ও মি. এডামের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মোগল আমলে প্রাথমিক পর্যায়ে মক্তব ও পাঠশালা কেন্দ্রিক সহশিৰা কার্যক্রম চালু ছিল। অভিজাত পরিবারের মেয়েদের জন্য অনেক সময় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। সম্রাট আকবর ফতেপুর সিক্রিতে মেয়েদের একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

মোগল রাজদরবারে অনেক উচ্চ শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। বাংলার সুবাদার, নবাব ও অভিজাত মহল কন্যাদের শিক্ষার নিমিত্ত গৃহ শিক্ষয়িত্রী রাখার ঐতিহ্য অনুসরণ করতেন। মি. এডাম পান্ডুয়ায় ধনীব্যক্তিগণ কর্তৃক তাদের পুত্র কন্যাদের শিক্ষার জন্য গৃহ শিক্ষক রাখার রীতি লক্ষ্য করেছেন।[১৬১]

১৬১। A.R. Mallick, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা কার্যক্রমে মুসলমানরা এতটা উদার ও নিবেদিত প্রাণ ছিলেন যে অবস্থাসম্পন্ন গৃহের গৃহশিক্ষকের নিকট গরীব প্রতিবেশীর সন্তানগণও শিক্ষা লাভ করতে পারতেন। নারীদের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সীমিত হলেও বাংলায় এ সময় অনেক শিক্ষিত ও রুচিশীল নারীর সন্ধান মেলে। সুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহজঙ্গের স্ত্রী রোকেয়া বেগম জ্ঞান গরিমার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কামরূপের শাসনকর্তারূপে নিয়োজিত ভ্রাতার সহায়তার জন্য মির্জা নাথানকে অনুরোধ করে একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রটিতে তাঁর দূরদর্শিতার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে।[১৬২]

শায়েস্তাখানের পাঁচ কন্যাও উচ্চ শিক্ষিতা ও গুণবতী ছিলেন। এদের মধ্যে দুজন ছিলেন বিখ্যাত। তাঁরা হলেন- ইরান-দুখত ওরফে পরীবিবি এবং তুরান দুখত ওরফে বিবান বিবি। লালবাগ কেল্লায় সমাহিতা পরিবিবির গুণাবলী সমন্ধে কিছু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। পরীবিবিকে শায়েস্তা খান এত বেশি স্নেহ করতেন যে তার আকস্মিক মৃত্যুতে হতবিহবল হয়ে যান এবং লালবাগ কেল্লার কাজ অসমাপ্ত রেখে দেন।[১৬৩] মুর্শিদকুলী খানের কন্যা ও নবাব শুজাউদ্দিনের স্ত্রী জিনাতুননিসা, শুজাউদ্দিনের কন্যা নাফিসা বেগম ও দারনামা বেগম প্রশাসন, সমাজ ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।[১৬৪]

১৬২। ড. এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ-২৫০।
১৬৩। পূর্বোক্ত।
১৬৪। ড. এম. এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৫১।

আলিবর্দী খানের স্ত্রী শরফুননিসা তার শিক্ষা ও সুরুচির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে তিনি স্বামীকে পরামর্শ দিতেন। তিনি প্রাসাদে বহু দরিদ্র ও অনাথ বালিকা এবং ক্রীতদাসীর শিক্ষা ও বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। আলিবর্দীর কন্যা ঘসেটি বেগম, মায়মুনা বেগম ও আমিনা বেগম সকলেই সুশিক্ষিতা ছিলেন। ঘষেটি বেগম উচ্চ শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং এ কারণে স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে বাংলার দিউয়ান নিযুক্ত করা হয়েছিল।[১৬৫]

আমিনা বেগম ক্রীতদাসী বালিকাকে শিক্ষিত করে স্বীয় পুত্র সিরাজদ্দৌলার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।[১৬৬] আলিবর্দী খানের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও আতা উল্লাহ খানের স্ত্রী রাজিয়া বেগম যিনি লুৎফুননেসা নামে সুপরিচিত, তিনিও শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পর্দার অন্তরালে থেকেও এসব নারী স্বীয় যোগ্যতার বলে ইতিহাসের পাতায় উদ্ভাসিত হয়েছেন। নারীদের সমন্ধে প্রচারণার অভাবে অনেকেই হয়তো ইতিহাসের অন্তরালে রয়ে গেছেন। শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাবে নারীরা এতটা মানসিক শক্তি ও বীরত্ব অর্জন করেছিলেন যে ভাগলপুরের গাউস খানের বিধবা স্ত্রী মারাঠা লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে নিজের গৃহকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[১৬৭] আবদুল হাকিমের ‘সয়ফুল্‌মুলক পুঁথি’ নামক কাব্যের নায়িকা লালামতি সকল বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন।[১৬৮]

১৬৫। করম আলী, *মুজাফ্‌ফর নামা*, পৃ-৩৭; দ্রষ্টব্যঃ ড. এম. এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৫১।
১৬৬। *সিয়ার*, মূলগ্রন্থ, পৃ-৫৮৫; দ্রষ্টব্যঃ ড.এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-২৫১।
১৬৭। *সিয়ার*, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৪; দ্রষ্টব্যঃ ড.এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-২৫১।
১৬৮। আ. হাকিম, সয়ফুলমুলক, এস এম (ঢাঃ বিঃ), পৃ-৮ ।

বাঙালী মুসলমানদের বিদ্যা শিক্ষার প্রভাব হিন্দু সমাজেও ব্যাপক ভাবে পড়েছিল। মোগল বাংলায় হিন্দুরাও ব্যাপকভাবে ফার্সি ভাষা চর্চা শুরু করে। বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র ছিলেন ফার্সি ভাষায় সুপন্ডিত। রামচন্দ্র মুনশী তাকে ফার্সি শিক্ষা দিয়েছিলেন। নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও জ্ঞান চর্চা শুরু করে। 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামক কাব্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় মুসলিম শাসনমলে হিন্দু সমাজের নিম্ন শ্রেণীর 'হরি' ও 'সউদ'গণ দলিল পত্র পড়া ও লেখার মত যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল।[১৬৯] এমনকি নাপিত, ঝাড়ুদাররাও বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্য রচনা শুরু করে। 'কড়চা' এর লেখক কবি গোবিন্দ দাস (স্বর্ণকার), 'দময়ন্তী' (১৮০৯) এর কবি মধুসূদন (নাপিত), 'দেবায়নী উপ্যাখ্যান' এর রচয়িতা রাম নারায়ণ গোপ (গোয়ালা) 'হরি বংশ' এর লেখক ভাগ্যমন্ত ধোপী, শ্রী মাঝি কায়েত, গঙ্গাদাস সেন, কালিচরণ গোপ, রামপ্রসাদ দত্ত, রামদত্ত এবং নিম্ন শ্রেণীর আরও অনেক ব্যক্তি সুশিক্ষিত ছিলেন।[১৭০]

বিদ্যা শিক্ষার প্রভাব থেকে হিন্দু নারীসমাজও দূরে ছিলেন না। নিম্ন শ্রেণীর নারী যেমন শিকারী রমণী, ফুল্লরা, খুল্লনা, বিপুলা ও রাজুদেবী হিন্দুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।[১৭১] এসময় উচ্চ শিক্ষিত রমণীদের দেখা মেলে। কবি চন্ডীদাসের প্রেয়সী ধোপা রমণী 'রামী' বাংলায় পদাবলী রচনা করেন।[১৭২] চৈতন্যের শিষ্যা মাধবীও সুশিক্ষিতা ছিলেন, কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভা সম্পন্ন কবি ছিলেন।[১৭৩] খনা জ্যোতিঃশাস্ত্রে অভিজ্ঞ একজন বিখাত মহিলা যার মন্তব্য সমূহ বাংলার ঘরে ঘরে প্রবাদে পরিণত হয়েছে।[১৭৪]

১৬৯। মানিক চন্দ্র রাজার গান, *সাহিত্য পরিচয়*, প্রথম খন্ড, পৃ-৭২; ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৫৩।
১৭০। ডি সি সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, পৃ-২৭৩-৭৫; ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৫৩।
১৭১। দ্বিজ হরিরাম, *চন্ডীকাব্য;* ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৫৩।
১৭২। *এনামুল হক রচনাবলী*, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ-২৮৫-২৮৬।
১৭৩। ডি সি সেন, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য*, পৃ-৩১০; ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৫৩।
১৭৪। পূর্বোক্ত, পৃ-২৫২।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশঃ

সুলতানী আমল ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনযুগ। মোগল আমলে এসে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশের নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। মোগল বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে অনেক নতুন উপাদান সংযোজিত হয়। সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকে ধর্মীয় নিষ্ঠাবোধের ঘাটতি দেখা দিতে থাকে। এই দু'জন সম্রাট অতিমাত্রায় Secular চিন্তার অধিকারী ছিলেন। এর প্রভাব সমাজ সংস্কৃতিতেও পড়ে। এছাড়া ইরানীদের মাধ্যমে শিয়া মতবাদ ভারত ও বাংলায় বিশেষ আসন গেঁড়ে নেয়। বাংলার অনেক শাসনকর্তা ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। শিয়া মতবাদের প্রভাবেই বাংলায় এই সময় 'মকতূল হুসেন' ও 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর কাব্য গড়ে উঠে।[১৭৫]

মোগল বাংলায় উত্তর ভারত থেকে বহু সুফী সাধকের আগমন ঘটে। এদের মধ্যে সুহরবরদী, চিশতী, কলন্দরী, মাদারী, অদহমী, নক্‌শ্‌বন্দী ও কাদিরী সম্প্রদায়ভূক্ত সুফীরাই ছিলেন প্রধান। তবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে কলন্দরী, মাদারী ও অদহমী সম্প্রদায়ের সুফিগণ। এই সব সুফী সম্প্রদায়ের প্রভাব বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে গভীরভাবে পড়ে। ফার্সি ও বাংলায় প্রচুর সুফি সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং লোকসঙ্গীত রচিত হয়। মোগল আমলের বাংলায় সমাজ-সংস্কৃতিতে নতুন আর একটি উপাদান সংযোজিত হয় তা হল পর্তুগীজ প্রভাব। পর্তুগীজ বণিকগণ এ সময় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। পর্তুগীজ হামার্দ জলদস্যুদের উৎপাত যেমন ঘটে তেমনি ধর্মপ্রচারক পাদ্রীদেরও আগমন ঘটে। এই পাদ্রীগণই মূলত সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব রাখেন। ১৫৯৯ খ্রিঃ ফাদার সোসা একটি খ্রীষ্ট-ধর্মীয় পুস্তিকা বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন। এন্তনিও দ্য রোজারিও নামে

১৭৫। *এনামুল হক রচনাবলী*, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ-২৮৫-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

একজন ধর্মান্তরিত বাঙালী ‘ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ’ নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। ম্যানুয়েল দ্য আস্ সুম্পকাও ও আর একজন পর্তুগীজ পাদ্রী ‘ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ’ নামে পুস্তকটিকে রোমান হরফে প্রকাশ করেন। এই পাদ্রী ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ নামে একটি প্রচার পুস্তিকা লেখেন। তিনি একটি বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা অভিধান সংকলন করেছিলেন যা বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ ও অভিধান। এসময় পর্তুগীজ শব্দ সম্ভার দ্বারা বাংলা ভাষার ভান্ডারও সমৃদ্ধ হয়।

মোগল বাংলার কবি সাহিত্যিক ও তাদের রচনাবলী[১৭৬]-

১. সয়্যিদ সুলতান (আনুমানিক ১৫৫০-১৬৪৮):

i. নবী বংশ
ii. শব্-ই-মিরাজ
iii. রসূল বিজয়
iv. ওফাৎ-ই-রাসূল
v. জয়কুম রাজার লড়াই
vi. ইবলিস নামা
vii. জ্ঞান-চৌতিশা
viii. জ্ঞান প্রদীপ
ix. মারফতী-গান
x. পদাবলী

১৭৬। *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ-২৮৫-৩৫৫।

২. শেখ পরান (আনুমানিক- ১৫৫০-১৬১৫) 'নুরনামা' ও 'নসীহৎ নামা' তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ।

৩. হাজী মুহম্মদ (আনু-১৫৫০-১৬২৫)ঃ 'নূর-জামাল'

৪. নসরুল্লাহ খাঁ (আনু-১৫৫০-১৬২০) এর রচনাবলী-

i. জঙ্গনামা
ii. মূসার সোয়াল
iii. হিদায়িতুল ইসলাম
iv. শরীয়ৎ নামা

৫. মুহম্মদ খান (আনু-১৫৮০-১৬৫০):

i. সত্য কবি বিবাদ সংবাদ
ii. হানিফার লড়াই
iii. আসহাব-নামা
iv. মকতূল হুসেন
v. কিয়ামৎ-নামা
vi. দজ্জাল-নামা
vii. কাসিমের লড়াই

৬. সয়্যিদ মরতুজা (আনু-১৫৯০-১৬৬২): তিনি বাংলা ও ফার্সি উভয় ভাষায় লিখেছেন। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ -

i. যোগ কালন্দর
ii. পদাবলী

৭. শেখ মুত্তালিব (আনু-১৫৯৬-১৬৬০):শেখ পরানের পুত্র। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থের কথা জানা যায়-

i. কিফায়িতুল্-মুসল্লীন
ii. কায়দানী কিতাব

৮. মীর মুহম্মদ শফী (আনুমানিক ১৫৫৯-১৬৩০ সাল): কবি হাজী মুহম্মদের শিষ্য । তাঁর রচনাবলী -

i. নূরনামা
ii. নূর কন্দীল
iii. সায়াৎ-নামা

৯. কবি আবদুল হাকীম (আনু-১৬২০-১৬৯০ সাল):

i. ইউসুফ-জলিখা
ii. শিহাবুদ্দীন-নামা
iii. লালমতী-সয়ফুল্মুল্ক
iv. নূর-নামা
v. নসীহৎ-নামা
vi. কারবালা
vii. চারি মকামভেদ
viii. শহর-নামা

১০. নওয়াজিশ খাঁ (১৬৩৮ সলে জীবিত ছিলেন) তাঁর রচনাবলী:

i. পাঠান প্রশংসা
ii. গুল্-ই-বকাওলী

iii. জোরওয়ার সিংহ কীর্তি,

iv. বয়ানাত

v. গীতাবলী

১১. কমর আলী :

i. সরসালের নীতি (ছয় রিসালার নীতি)

ii. ঋতুর বারমাস

iii. পদাবলী

১২. মঙ্গল (চাঁদ): শাহজালাল-মধুমালা

১৩. আব্দুল নবী: 'আমীর-হামজা' নামে সর্ব বৃহৎ একটি কাব্য রচনা করেন।

১৪. মুহম্মদ ফসীহ: মুনাজাৎ

১৫. মুহম্মদ জান: অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। 'নামাজনামা' (আরবী হরফে লেখা) নামে একটি গ্রন্থের রচয়িতা।

১৬. ফকীর গরীবুল্লাহ্:

i. সত্য পীর

ii. ইউসুফ-জুলেখা

iii. মক্তুল হোসেন বা জঙ্গনামা (অসম্পূর্ন)

১৭. মুহম্মদ ইয়াকুব: গরীবুল্লাহর জঙ্গনামা সমাপ্ত করেন।

১৮. শেখ মনসূর: সির-নামা

১৯. মুহম্মদ উজীর আলী: শাহনামা, সায়াৎ-কুমার

২০. শেখ সাদী: গদা মল্লিকা (১৭১৫ খ্রীঃ রচিত)

২১. হায়াত মাহমুদঃ মোগল আমলের শেষ ও শক্তিশালী কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী-

i. জঙ্গনামা মহরম পর্ব (১১৩০ বাংলা ১৭২৩ খ্রীঃ)

ii. চিত্ত উত্থান বা সর্বভেদ (১১৩৯ বাংলা ১৭৩২ খ্রীঃ)

iii. হিতজ্ঞান বাণী (১১৬০ বাংলা ১৭৫৩ খ্রীঃ)

iv. আম্বিয়া-বাণী (১১৬৫ বাংলা ১৭৫৮ খ্রীঃ)

মোগল আমলে মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে অবস্থিত দুটি স্বাধীন প্রত্যন্ত প্রাদেশিক রাজ্যেও বাংলা সাহিত্যের বিশেষ চর্চা হয়। রাজ্য দুটি হলো - রোসাঙ্গ ও ত্রিপুরা।

রোসাঙ্গ বা আরাকান রাজ্যে বাংলা সাহিত্যঃ

মোগল বাংলার পাশঘেষে চট্টগ্রামের কিছু অংশ ও আরাকান অঞ্চল নিয়ে রোসাঙ্গ রাজ্য কখনও স্বাধীন রাজ্য কখনও করদ রাজ্য হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছিল। বঙ্গের রাজশক্তির সাথে সদ্ভাব বজায় না থাকলেও শক্তিশালী বঙ্গ রাষ্ট্রের প্রভাব রোসাঙ্গের সমাজ ও রাজনীতিতে গভীর ভাবে পড়েছিল। রাজকার্যের উচ্চ পদে মুসলিমদের অবস্থান ছিল এবং জনসংখ্যার বড় একটি অংশ ছিল মুসলিম। রাজাগণ বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাজ অভিষেক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা না হয়ে মুসলিম প্রধানমন্ত্রী দ্বারা হত। কবি আলাওল তার ‘সিকান্দর নামা’ কাব্যে এর দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন।[১৭৭] আরাকান রাজসভায় বাঙালী কবিরা যে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন তা অনেক সময় বাংলার কবিদের ভাগ্যেও জোটেনি। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরকানের মুসলিম সভাসদদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব কবি সাহিত্যক সাহিত্য চর্চা করেন তাদের তালিকা নিম্নে দেয়া হল[১৭৮]-

---

১৭৭। *এনামুল হক রচনাবলী*, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ-৩৫৫।
১৭৮। পূর্বোক্ত, পৃ-৩৫৫-৩৭২।

১. দৌলত কাজী (আনুমানিক ১৬০০-১৬৩৮)-আরাকান রাজসভায় বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রাচীন। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। রোসাঙ্গ রাজ শ্রীসুধর্মের সমর সচিব আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী' নামে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন তবে তা সমাপ্ত করার পূর্বেই মারা যান। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি।

২. মরদন : দৌলত কাজীর সমসাময়িক। আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় 'নাসীরা নামা' নামে কাহিনী কাব্য রচনা করেন।

৩. কোরেশী মাগন ঠাকুর: সময়কাল আনুমানিক ১৬০০-১৬৬০ সাল। তিনি রোসাঙ্গরাজ থদোমিন্তার সাদ উমাদাদের মুখপাত্র ছিলেন। কবি আলাওলের পৃষ্ঠপোষক। মাগন তাঁর জন্মগত নাম ও ঠাকুর রাজ দরবার থেকে পাওয়া উপাধী। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'চন্দ্রাবতী'। তিনি আরবী, ফার্সি, বর্মী ও সংস্কৃতি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

৪. মহাকবি আলাওল: সময়কাল আনুমানিক ১৬০৭-১৬৮০ সাল। তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী, জলদস্যুদের কবলে পড়ে পিতাকে হারিয়ে আরাকান রাজসভায় আশ্রয় নেন এবং মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

i. পদ্মাবতী-১৬৫১ সাল রচিত হিন্দী 'পাদুমাবত' কাব্যের ভাবানুবাদ।
ii. সতীময়না-দৌলত কাজীর সতী ময়না কাব্যের অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেন।
iii. হপ্ত পয়কর
iv. তোহফা-ধর্মীয় উপদেশগ্রন্থ
v. সয়ফুল্‌মুল্‌ক-এই কাব্যের প্রথম অংশ মাগন ঠাকুরের আদেশে এবং এর শেষাংশ আরাকান রাজ আমাত্য সয়্যিদ মুসার আদেশ রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

vi. সিকান্দর নামা

৫. আবদুল করীম খোন্দকার- দুল্লা মসজিদ, হাজার মসাইল (ফিকাহ শাস্ত্র), নূরনামা প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ।

ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা সাহিত্যঃ

ত্রিপুরা রাজ্য বাংলার মিত্ররাজ্য ছিল। ফলে ত্রিপুরার সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে বাংলার প্রভাব ছিল অনেক বেশি। ত্রিপুরার রাজা চাকমা বংশোদ্ভূত হলেও জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বাংলা থেকে আগত হিন্দু ও মুসলিম অধিবাসী। বাংলা ভাষায় লেখা ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস বিষয়ক 'রাজমালা' গ্রন্থে রাজ্যটির উপর বাংলার প্রভাবের নিদর্শন বহন করছে। ত্রিপুরা রাজদরবারের বাঙালী সাহিত্যিকদের দ্বারা বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়। নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখিত হল[১৭৯] -

১. শেখ চান্দ (আনু ১৫৬০-১৬২৫): ত্রিপুরায় বাঙালী মুসলিম কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। তাঁর রচনাবলী-

i. রসূল বিজয়

ii. শাহ দৌলা

iii. কিয়ামত নামা

iv. হর গৌরী সংবাদ-যোগশাস্ত্রের বই

v. তালিব নামা-চম্পু কাব্য, বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা।

১৭৯। *এনামুল হক রচনাবলী*, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ-৩৬৭-৩৭৪।

২. সয়্যিদ মুহম্মদ আকবর (আনু ১৬৫৭-১৭২০)- ত্রিপুরা জেলা হতে তাঁর একটি মাত্র কাব্য আবিস্কৃত হয়েছে 'জেবলমুল্‌ক্‌ শামারুখ'।

৩. শুকুর মুহম্মদ (আনু ১৬৮০-১৭৫০): 'ময়নামতীর গল্প' নামে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী কাব্যের রচয়িতা। এটি ত্রিপুরার রাজা গোপীচন্দ্র ও তার স্ত্রী রাণী ময়নামতিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত গান থেকে রচিত।

৪. মুহম্মদ রফীউদ্দীন : তার রচিত কাব্যের নামও ' জেবলমুলক মূলক শামারুখ' । তবে কবি মুহম্মদ আকবরের চেয়ে রফীউদ্দীনের ভাষা মার্জিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

৫. শেখ সাদী (১৭১২): গদা-মল্লিকা নামে কাব্য রচনা করেন।

৬. শেরবাজ:

   i. ফক্কর নামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল

   ii. কাসেমের লড়াই

   iii. ফাতিমার সূরত নামা

৭. মুহম্মদ আব্দুর রাজ্জাক (১৭৭০ সাল): কবি ত্রিপুরার মহারাজ শ্রীবলরাম মানিক্যের রাজ্যে বাস করতেন। ১৭৭০ সালে 'সয়ফলমুল্‌ক্‌-লালবানু' নামে একটি উপাখ্যান কাব্য রচনা করেন।

মোগল আমলে বাংলায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বিষয় বৈচিত্র্যে বিশালতা লক্ষ্যণীয়। ইসলামী শরিয়ত সংক্রান্ত গ্রন্থ যেমন রচিত হয়েছে তেমনি মুসলমানদের গৌরবময় বীরত্বব্যঞ্জক ধর্মীয় কাহিনী নিয়েও কাব্য রচিত হয়েছে। সুফি তত্ত্বের উপর এ সময় যেসব গ্রন্থ রচিত হয় সেগুলো যোগ কলন্দর জাতীয় সাহিত্য। এ সময়ে সুফিবাদ উত্তর ভারতীয় ও পারসিক নানা উপাদান ও হিন্দু যোগীদের ভাবধারা পুষ্ট হয়ে ওঠে, যার সাথে মৌলিক ইসলামের সম্পর্ক তেমন ছিল না। মোগল আমলে মানবধর্মী প্রেমোপাখ্যানসমূহ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শিয়া মতবাদের

সংস্পর্শে এসে এ সময় বাংলা সাহিত্যে মর্সিয়া সাহিত্যের সংযোজন ঘটে, 'জয়নবের চৌতিশা' 'কারবালা,' 'জঙ্গনামা' প্রভৃতি মর্সিয়া সাহিত্যের নিদর্শন। আর সুলতানী আমলে ঐতিহাসিক কাব্য রচনার যে ধারার সূত্রপাত হয় তা মোগল আমলেও জারি ছিল। এ জাতীয় সাহিত্য রচনা বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে একেবারে অভিনব। 'পাঠান প্রশংসা', 'জোরওয়ার সিংহের কীর্তি,' 'শাহনামা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক কাব্যের নিদর্শন। মোগল আমলেই প্রথম রূপকাব্য রচিত হয়েছে। 'সত্য কলি বিবাদ সংবাদ', 'পদাবলী সাহিত্য', 'মারফতী গান', প্রভৃতি জাতীয় রচনার সংখ্যাও কম নয়। মোট কথা মোগল যুগও ছিল বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

মোগল আমলে হিন্দু কবিদের রচনাবলী-

১. নরোত্তম দাস- কীর্তনসঙ্গীত রচনা করেন-প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, সাধন ভক্তি চন্দ্রিকা, রসভক্তি চন্দ্রিকা, রাগমালা, প্রেমবিলাস, স্বরূপ কল্পচারু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
২. শ্যামাদাস- অদ্বৈত তত্ত্ব (কীর্তন সঙ্গীত)
৩. নিত্যানন্দ দাস- প্রেমবিলাস (বৈষ্ণব সাহিত্য)
৪. গোপী বল্লভদাস- রসিকমঙ্গল (বৈষ্ণব সাহিত্য)
৫. নরহরি চক্রবর্তী- ভক্তিরত্নাকর ও নরত্তোম বিলাস
৬. দ্বিজ মাধব- মঙ্গলচন্ডী (১৫৭৯)
৭. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী- চন্ডীকাব্য (মানসিংহের সুবাদারির সময়ে রচিত)
৮. রামনন্দ ঘোষ (শুদ্র)- রামায়ণ
৯. দয়ারাম- সারদামঙ্গল
১০. দ্বিজ বিরেশ্বর- স্বরস্বতীমঙ্গল, সত্যপিরের মাহাত্ম্য (বিদ্যাসুন্দর কাব্য)
১১. ভারতচন্দ্র- অন্নদামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর কাব্য)
১২. গঙ্গারাম- মহারাষ্ট্রপূরাণ

মোগল আমলে বাংলায় হিন্দু সাহিত্যিকদের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্য ও সত্যপীর বা সত্যনারায়নের মহিমা কীর্তন করে রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্য বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।[১৮০]

মোগল বাংলার অর্থনীতির হালচাল:

সুলতানী আমলে বাংলা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিল। মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার পর এই বিচ্ছিন্নতার অবসান হয় এবং উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলসহ বহির্বিশ্বের সাথে বাংলার সম্পর্কের বিস্তৃতি ঘটে। এর ফলে বাংলার অর্থনীতি নতুনমাত্রা পায়। মোগল আমলে বাংলা থেকে বেশ কিছু অর্থ কেন্দ্রীয় রাজস্ব বাবদ ও রাজকর্মচারীদের মাধ্যমে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় কিন্তু মোগল শাসনাধীনে বাংলায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যে বিপুল প্রসার ঘটে তাতে এই ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়।

কৃষির উন্নতি:

সুলতানী আমলে কৃষির উন্নয়নের যে ধারা শুরু হয় মোগল আমলে এসে তার উৎকর্ষ সাধিত হয়। বাংলার প্রধান খাদ্য শস্য ছিল চাল। বিভিন্ন প্রকারের ও বিপুল পরিমাণে চাল উৎপন্ন হত। আবুল ফজল বিভিন্ন রকমের চালের উল্লেখ করে বলেছেন, "যদি প্রত্যেক প্রকারের শস্যের একটি করে কণাও সংগ্রহ করা যায় তাহলে তাতেও একটি বিরাট ভান্ডার ভরে উঠবে।"[১৮১]

১৮০। ড. এম. এ. রহিম, ২য় খন্ড, পৃ-২৭২-২৭৫।
১৮১। *আইন ই আকবরী*, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৪; উদ্ধৃত: ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৪২।

এতবেশী পরিমানে চাল বাংলায় উৎপন্ন হত যে চালের দাম ছিল অস্বাভাবিক রকম স্বস্তা এবং বাংলার অধিবাসীদের চাহিদা পূরণ করেও উদ্ধৃত থাকত।[১৮২]

চাল ছাড়াও বাংলায় নানা রকম শাক-সবজি, ফলমুল ও মশলা উৎপন্ন হত। জনার, তিল, তিষি, শিম, বরবটি, পেয়াজ, রসুন, শসা, লাউ, নারিকেল, লঙ্কা, আদা, হলুদ, পান, সুপারি, আম, কাঁঠাল, কলা, ডালিম, খেজুর, কমলা, সানতারা প্রভৃতি দেশের চাহিদাপূরণ করে বাইরে রপ্তানি হত। ডাচ পরিব্রাজক স্ট্যাভোরিনাস (১৭৬১-১৭৭১ সালের মধ্যে বাংলা ভ্রমণ করেছেন) এর বিবরণে ঐ সময়ে বাংলায় উৎকৃষ্ট গম উৎপাদন এবং তা বাটাভিয়া পর্যন্ত রপ্তানির কথা জানা যায়।[১৮৩]

বাংলায় প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হত। বারবোসা ষোড়শ শতকে বেঙ্গালা শহরে উৎকৃষ্ট চিনি তৈরীর কথা বলেছেন।[১৮৪] এছাড়া বারথেমা ও বার্নিয়ারের বিবরণেও বাংলায় প্রচুর পরিমাণে চিনি রপ্তানির কথা জানা যায়।[১৮৫]

পাটও ছিল বাংলার গুরুত্বপূর্ণ একটি কৃষিপণ্য। আবুল ফজলের বর্ণনায় ষোড়শ শতকে বাংলায় পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৮৬] মোগল আমলে পাট বস্ত্র ও চটের থলে রপ্তানির কথা বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগর পাটের শাড়ি, ধুতি ও অন্যান্য বহু পণ্য নিয়ে একটি দেশে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন।[১৮৭] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দিকের দলিল পত্রেও পাটের চট রপ্তানির উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৮২। আলেকজান্ডার ডোউ, *ইন্দোস্তান*, পৃ-১৫১; উদ্ধৃতঃ ড. এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪২।
১৮৩। ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪৩।
১৮৪। *Hakluat Society*, vol-II, P-145; ড. এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ৩৪৩।
১৮৫। ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪৩।
১৮৬। *আইন-ই-আকবরী*, ২য় খন্ড, পৃ-১৩৪; ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪৪।
১৮৭। বিজয়গুপ্ত, *মনসামঙ্গল*, পৃ-১৩৩; ড. এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪৪।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় অল্প স্বল্প নীল চাষ হত। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে এটি ইউরোপীয় বণিকদের নজরে আসে এবং নীল বাংলার একটি রপ্তানিযোগ্য পণ্যে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ইংরেজ সরকারের অধীনে নীল চাষ বাংলার কৃষকের জীবনে নিষ্ঠুর উৎপীড়ন হয়ে

দেখা দিয়েছিল। উত্তর বাংলা ও বিহারে কিছু পরিমান আফিম চাষ হত এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে রপ্তানি হত। বারবোসা ও বারথেমার বিবরণে বাংলায় লাক্ষা চাষ ও রপ্তানির কথা জানা যায়।[১৮৮]

বাংলায় উন্নতমানের তন্তু উৎপন্ন হত যা দিয়ে সুতা তৈরী হত। ইংরেজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি জে.বি টেলর ঢাকায় পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন হওয়ার কথা বলেছেন। এর কারণ হিসেবে এখানকার মাটি ও আবহাওয়ার গুণাগুণকে চিহ্নিত করেছেন। মসলিন তৈরীর উপযোগী সূক্ষ সুতা ছাড়াও মোটা ধরণের সুতাও উৎপন্ন হত। মসলিন তৈরীর জন্য 'ফটি' নামে এক ধরনের তন্তুর কথা জানা যায়। মালদার 'বরাবুঙ্গা', 'বিয়োটা' ও 'নূরমা', রংপুরের 'চিস্তিয়া', বর্ধমানের, 'নূরমা', 'মুহুরী' ও 'বোগ্না', ধারানগরে 'কাউর', 'মুহুরী', ও 'বোঙ্গা', মেদিনীপুরে 'কুরেরা', হরিয়াল অঞ্চলের 'দেশী' প্রভৃতি নানা ধরনের সুতা উৎপন্ন হত। বীরভূমেও মোটাবস্ত্র তৈরীর সুতার উৎপাদন ছিল ব্যাপক।[১৮৯] এছাড়া বাংলার খাল-বিল নদীনালাতে প্রচুর মাছ ছিল। বাংলার মোগল নৌবাহিনীর সেনাপতি মির্জা নাথান সুবাদার ইসলাম খানকে বড় বড় চল্লিশটি মাছ উপহার পাঠিয়েছিলেন।[১৯০] গবাদি ও গৃহপালিত পশু যেমন গরু, ভেড়া, বকরী, অশ্ব ও খচ্চর এবং হাঁস, মুরগি, রাজহাঁস ও বিভিন্ন রকমের পাখি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। আবুল ফজলের বর্ণনায় এসেছে, সিলেট সরকারে ঘৃত কুমারী

১৮৮। *Hakluat Society*, Vol-V, P-40; Purcas, His Piligrams , P-9; ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪৫।
১৮৯। ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪৭।
১৯০। মির্জা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, বাংলা অনুবাদ; খালেকদাদ চৌধুরী, দিব্য প্রকাশ ৩৮/২ ক, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, প্রথম খন্ড, পৃ-৫৭।

কাঠ পাওয়া যেত যা মূল্যবান রপ্তানি পণ্য ছিল। খনিজ দ্রব্য হিসেবে লোহা ও হিরক ছিল উল্লেখযোগ্য।

শিল্পায়নঃ

সুলতানী আমলের শিল্পায়নের ধারাবাহিকতা মোগল আমলেও বজায় ছিল। বহির্বিশ্বে বাজার সম্প্রসারণের ফলে উৎপাদন আরও বৃদ্ধিপায়। বিশেষ করে বস্ত্র শিল্প তথা মসলিনের স্বর্ণযুগ হিসেবে মোগল আমলকে চিহ্নিত করা হয়। মোগল সম্রাট, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, সুবাদার ও নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় মসলিনের সমৃদ্ধি ঘটে। ভারত উপমহাদেশ, এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বহু দেশে বাংলায় উৎপন্ন পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হওয়ায় মসলিনের চাহিদা ও উৎপাদনও বেড়ে যায়। মিঃ রেনেল মসলিনের সূক্ষতা এবং ইউরোপে এর ব্যাপক চাহিদার বিষয় উল্লেখ করেছেন।[১৯১]

সুতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্প এবং এ কাজে অনেক নারী জড়িত ছিল। এখানে উৎকৃষ্ট মানের সুতা ও বস্ত্র তৈরি হত। সুক্ষ মসলিন ছাড়াও মোটা বস্ত্রও তৈরি হত। সুবাদার, নবাব ও অভিজাত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বস্ত্রকারখানাসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাঁতীরা স্বাধীনভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতেন এবং প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান। নিরাপদ ও স্থিতিশীল পরিবেশ শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। বাংলার সুতি ও রেশমী বস্ত্র ছিল উন্নতমানের। আবুল ফজল ও ট্যাভার্নিয়ারের বিবরণ থেকে কাশিমবাজারে রেশম উৎপাদনের কথা জানা যায়। ট্যাভার্নিয়ারের মতে কাশিম বাজারে বার্ষিক আড়াই মিলিয়ন পাউন্ড রেশম উৎপন্ন হত।[১৯২]

১৯১। *আইন-ই-আকবরী*, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৬; ড.এম.এ. রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪৮।
১৯২। ট্যাভার্নিয়ার, *ট্রাভেলস*, ২য় খণ্ড, পৃ-২-৩; ড.এম.এ. রহিম, ২য় খন্ড, পৃ-৩৫২।

কাশিম বাজারে ডাচ ও ইংরেজ বণিকদের কারখানায় প্রায় ৭শত বা ৮শত জন নিয়োজিত ছিল বলে বার্ণিয়ার বিবরণ দিয়েছেন। আলিবর্দী খানের সময়ে ইউরোপীয় বিনিয়োগ ছাড়াই কাঁচা রেশমের উপর ৭ লক্ষ টাকা সুল্ক ধার্য হয়েছিল। বার বার মারাঠা আক্রমণের ফলে রেশম শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মোগল আমলে সুলতানী আমলের শিল্পসমূহ যেমন কার্পেট, কাগজ, ইস্পাত দ্রব্য, কামান, বন্দুক প্রভৃতি শিল্প চালু ছিল। মোগল আমলে বাংলায় চমৎকার বন্দুক তৈরী হত এবং ইংরেজ গোলন্দাজরাও এর প্রশংসা করেছেন। তরবারি নির্মাণেও বাংলার খ্যাতি ছিল। বাংলায় উন্নতমানের শক্ত দু"ধারী তরবারি প্রস্তুত হত। বাঙালী মনিকারগণ তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতব কার্য, কাঠের কাজ, ভাস্কর্য এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত থালা বাসনের অলংকরণ কার্যে নৈপুণ্যের জন্য খ্যাত ছিল।[১৯৩]

ঢাকার সূচশিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। যবক্ষার শিল্প একটি গুরুত্বপুর্ণ শিল্প ছিল। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর নিকট এর ব্যাপক চাহিদা ছিল। তবে মোগল আমলে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অবনতি ঘটে।[১৯৪]

১৯৩। ড. এম.এ. রহিম, ২য় খন্ড, পৃ-৩৫৩।
১৯৪। ড. এম.এ. রহিম, ২য় খন্ড, পৃ-৩৫৩।

ব্যবসায়-বাণিজ্যঃ

রপ্তানিমুখী যে বাণিজ্য সুলতানী আমলে শুরু হয়েছিল তা পুরো মুসলিম আমলব্যাপী অব্যাহত ছিল। বাংলার বিপুল পরিমাণ উদ্ধৃত্ত কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের সমাহার এবং সহজলভ্য জলপথ ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারকে উন্মুক্ত করেছিল। মিঃ রেনেল গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের অসংখ্য

Dhaka University Institutional Repository

শাখা নদী ও উপনদী সমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এও জানান যে এই অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন ত্রিশ হাজার নাবিকের চাকুরির সংস্থান করে দিয়েছিল এবং প্রদেশের দশ মিলিয়ন অধিবাসীর জন্য খাদ্যসামগ্রী, লবন ইত্যাদি বয়ে নিয়ে আসত। এর সাথে বার্ষিক দু'মিলিয়ন মূল্যের রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের পরিবহনযুক্ত হত।[১৯৫]

আলিবর্দী খানের সময় বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের নানা বণিক সম্প্রদায় যেমন কাশ্মিরি, মুলতানি, পাঠান, শেখ, সুন্নি, পর্তুগীজ, ব্রিটিশ এবং অন্যান্য বহু লোক দলে দলে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশ থেকে পণ্য দ্রব্য পরিবহনের জন্য বৃষের দল নিয়ে বাংলায় প্রবেশ করত।[১৯৬]

মোগল আমলে বাংলার সাথে পর্তুগীজ, বৃটিশ, ইরানী, আবিসিনীয়, আরব, চীনা, তুর্কী, মুর, ইহুদী, জর্জিয়াবাসী, আর্মেনীয়, লাৰাদ্বীপ, মালদ্বীপ, মালয় ও ফিলিপাইন দ্বীপপঞ্জু, পেগু, সিংহল, বার্মা প্রভৃতি দেশের বণিকদের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাথেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। জল ও স্থল উভয় পথেই বাণিজ্য চলত। মোগল আমলে বাংলা বাণিজ্যে ইউরোপীয় বণিকরাই একচেটিয়া স্থান দখল করে নেয়; প্রতিযোগিতায় দেশীয় বণিকরা হেরে যায়। ইউরোপীয় বণিকগণ বাংলায় শক্ত আসন গেঁড়ে বসে এবং তাদের প্রতিনিধি স্বরূপ বানিয়া শ্রেণীর দালাল বা ফাড়িয়া বাংলা বাণিজ্যে আবির্ভূত হয়।[১৯৭]

১৯৫। ড.এম.এ. রহিম, ২য় খন্ড, পৃ-৩৫৩।
১৯৬। Rennell, *Memoirs of the Map of Indostan*, P-245; ড.এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৫৪।
১৯৭। N.K. Sinha, P-110.

সুলতানী আমলে চিটাগাং, সোনারগাঁও, সাতগাঁও, হুগলী ও গৌড় ছিল সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক নগরী। মোগল আমলে এসে গৌড়, সোনারগাঁও, সাতগাঁও এর পতন ঘটে এবং হুগলী ও কলকাতার উত্থান হয়। কলকাতার সমৃদ্ধি চিটাগাং বন্দরের প্রাধান্যকেও ম্লান করে দেয়। অবশ্য ষোড়শ শতক পর্যন্ত চিটাগাং বন্দরের প্রাধান্য বজায় ছিল।[১৯৮]

মোগল আমলেও বাংলার বাণিজ্য রপ্তানিমুখী ছিল। সামান্য কিছু পণ্য আমদানি হত। সুলতানী আমলের মত মোগল আমলেও চাল, সুতিবস্ত্র, রেশমি বস্ত্র, আফিম, লাক্ষা মরিচ, চিনি, সামুদ্রিক লবন, তেল, মাখন, শুটকি, পান সুপারি, মিষ্টান্ন, ফুল, ফল, তরকারি, ঘৃতকুমারি কাঠ, ঘি প্রভৃতি ছিল প্রধান রপ্তানি উপকরণ। এই বিপুল পরিমাণ রপ্তানির বিপরীতে বাংলা মীর্জাপুর ও গুজরাট থেকে সুতা, চীন থেকে কিছু পরিমাণ কাঁচা রেশম, চীনা মাটির বাসন, আফ্রিকার ক্রীতদাস, পারস্যের কিংখাব (কারুকাজ করা বস্ত্র), গালিচা, স্বর্ণ রৌপ ও মূল্যবান পাথর আমদানি করত।

বাংলার বাণিজ্য রপ্তানিমুখী হওয়ায় এবং বাইরের পণ্যের প্রয়োজন সামান্য হওয়ায় বিদেশী বণিকদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে বাণিজ্য করতে হত। ১৭৫০ সালে ইংরেজ বণিকগণ ৯৩ লক্ষ টাকা, ডাচ বণিকগণ ৬ লক্ষ টাকা, ফরাসি বণিকগণ ৩ লক্ষ টাকায় শুধু সুতি বস্ত্র ক্রয় করে এবং আর্মেনীয় বণিকগণ ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ঢাকাই বস্ত্র ক্রয় করে। ফলে ঢাকার বস্ত্র রপ্তানির মূল্য ছিল প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। মিঃ রেনেল অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা ধরে বাংলার বার্ষিক রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ মোট ২ কোটি টাকা ছিল বলে অনুমান করেন।[১৯৯]

১৯৮। M. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol II, P-430.
১৯৯। M. A. Rahim, Voll-II, P-434.

ব্যাংক ব্যবস্থাঃ

ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিপুল প্রসার ও অগাধ অর্থের আনাগোনা মোগল আমলে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার ঘটায়। প্রাচীন ভারতে আদিম আকারে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। মুসলিম শাসনকালে শেঠ, সাহা, মহাজন ও সাররাফ নামে ব্যাংক কারবারিদের ঋণদান, জমা রাখা,

হুন্ডি বা চেক প্রদান ইত্যাদি ব্যবসা করতে দেখা যায়।[২০০] মোগল বাংলায় ব্যাংকিং কারবার যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। মির্জা নাথান উল্লেখ করেছেন যে, যুবরাজ শাহজাহান যখন বাংলা মুল্লুকে আসেন তখন সিতাব খাঁ নামে এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাৰাৎ ও পেসকাশ দানের জন্য জাহাঙ্গীর নগরের মহাজনদের কাছ থেকে ৩০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন।[২০১] হুন্ডির মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরিত করা যেত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকারদের শাখা ও প্রতিনিধি ছিল। চার রকমের হুন্ডি প্রচলিত ছিল-

১. দর্শনী হুন্ডি– দর্শন মাত্র পরিশোধনীয়
২. মিথি হুন্ডি– নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধনীয়
৩. শাহ যোগ হুন্ডি– মুদ্রার মতো যে কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা যেত।
৪. জোহাখামী হুন্ডি– বীমা ধরণের বিক্রেতার পণ্য দ্রব্য ক্রেতার কাছে নিরাপদে পৌছে দিত।[২০২]

২০০। পূর্বোক্ত, P-436।
২০১। মির্জা নাথান, *বাহরীস্তান ই গায়বী* (অখণ্ড সংস্করণ), বাংলা অনুবাদ খালেকদাদ চৌধুরী, দিব্য প্রকাশ, পৃ-৫৯৯।

ভারতীয় হুন্ডি এশিয়া ও ইউরোপেও সমাদৃত হত। ট্যাভার্নিয়ারের বর্ণনায় এসেছে দূরত্ব অনুযায়ী হুন্ডির কমিশন নির্ধারিত হত। যেমন বেনারসে ৬%, ঢাকায় ১০%। পথে পণ্য খোয়া গেলে বিল পরিশোধ করা হত না। ভারতের বহির্ভাগে হলে মহাজনরা সমুদ্রপথে ঝুঁকি নেয়ার জন্য ১৬% থেকে ২২% কমিশন দাবি করত।[২০৩]

বাংলায় মহাজনরা সততার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। সমাজ ও রাজনীতিতে মহাজনদের প্রভাব ছিল অনেক বেশী। বাংলায় মহাজনদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মহাজন ছিলেন জগৎ শেঠ। জগৎ শেঠ নবাব, জমিদার ও ব্যবসায়ীদেরকে প্রয়োজনে ঋণ প্রদান করতেন। নবাবগণ জগৎ শেঠের ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্রাটকে রাজস্ব , কর প্রভৃতি প্রেরণ করতেন। জগৎ শেঠ নবাবের মুদ্রা অঙ্কিত করার সুবিধা লাভ করতেন। তিনি অনেক সময় জমিদারদের বকেয়া রাজস্বের জন্য জামিন থাকতেন।[২০৪] ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ জগৎ শেঠের ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৭৫৬ খ্রিঃ ডাচরা বার্ষিক ৯% সুদে জগৎ শেঠের কাছে ৪.৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে।[২০৫] এভাবে জগৎ শেঠ বাংলার অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রভাবশালী হয়ে উঠেন। পলাশীর পট পরিবর্তনে তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল।

২০২। D. Pant, *The Comercial Policy of The Moguls*, Idarah-i-Adabiat-i-Delli, Delhi- 11006, 1930, Pp-78-79.
২০৩। M.A Rahim, Vol-II, P-438.
২০৪। M.A Rahim, Vol-II, P-437.
২০৫। M.A Rahim, Vol-II, P-437.

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা বলা যায় যে, সুলতানী আমলের ধারাবাহিকায় মোগল আমলেও বাংলার অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি বজায় ছিল। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের মত কিছু শিল্পের অবনতি ঘটেছে। তবে বস্ত্র শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি সাধিত হয়েছে। সিবাস্তিয়ান মানরিক ও বার্ণিয়ারের বর্ণনায় বাংলার প্রাচুর্যের বিবরণ উঠে এসেছে। বার্ণিয়ার

ইংরেজ ও ডাচদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রবাদ উল্লেখ করেছেন- বাংলা মুল্লুকে প্রবেশের হাজারো দরজা উন্মুক্ত কিন্তু বের হবার একটি পথও খোলা নেই।[২০৬]

সুবাদার শায়েস্তাখানের আমল দ্রব্যমূল্যের কমতির কারণে কিংবদন্তী হয়ে আছে। নবাব শুজাউদ্দিনের সময়েও দ্রব্যমূল্য ছিল অত্যন্ত স্বস্তা। স্বস্তা মূল্যের কারণ ছিল একদিকে পন্যের প্রাচুর্য অন্যদিকে কঠোর মুল্য নিয়ন্ত্রন নীতি।

গোলাম হোসেন সলিম, নওয়াব জাফর খানের সময়ে কড়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন স্বস্তা মূল্যের জন্য মানুষ মাসিক এক টাকায় পোলাও ও কালিয়া খেত এবং গরিব মানুষেরা সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করত।[২০৭] পুরো মুসলিম আমল ব্যাপী বাংলার অর্থনীতি ছিল সমৃদ্ধ, দ্রব্যমূল্যের খুব একটা হের ফের হত না। প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে সাময়িক সমস্যা দেখা দিলেও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শাসক ও বিত্তবানদের জনকল্যাণকামী মানসিকতার কারণে দ্রুতই তা মোকাবেল করা যেত। সম্পদের প্রাচুর্য বাংলার মানুষকে করেছিল বিলাসী। উদ্বৃত্ত সম্পদ মজুদ করার রীতি প্রচলিত ছিল। সম্রাট বাবর বাংলার মানুষের স্বর্ণ ও রৌপ মজুত করার অভ্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন।

২০৬। পূর্বোক্ত, P-440।
২০৭। রিয়াজ, পৃ-১৪৮।

মানরিক শাহজাদা শুজার আমলে গৌড়ের এক মেষ পালক কর্তৃক তিন কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ মোহর ও মুল্যবান পাথর রাশি আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করেছেন।[২০৮] মোগল সুবাদার, নবাব ও অভিজাতবর্গ বাংলার অঢেল সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন। শায়েস্তাখান তার ১৩ বছরের সুবাদারি আমলে ৩৮ কোটি টাকার সম্পদ সংগ্রহ করেন।[২০৯] J.N. Sarker মন্তব্য করেছেন,

শায়েস্তাখান ৯ কোটি টাকা, খান জাহান ২ কোটি টাকা দিল্লীতে নিয়ে যান এবং যুবরাজ আজম খান তার সুবাদারি আমলে মোট আট কোটি টাকা উপার্জন করেন।[২১০]

বাংলার অর্থসম্পদ দ্বারা মোগল সাম্রাজ্যও সমৃদ্ধ হয়েছিল। আওরঙ্গজেব এর সময় থেকে মোগল সম্রাটগণ বাংলার রাজস্ব ও করের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তবে মোগল আমলে ইউরোপীয় বণিকদের প্রতিষ্ঠা বাংলার বণিক সমাজের পতন ত্বরান্বিত করে এবং বাংলার সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটায়।

২০৮। Manrique, S. Travels, H. Hoster, London, 1927, Pp-129-32; উদ্ধৃতঃ M.A Rahim, Voll-II, P-444.
২০৯। M.A. Rahim, Voll-II, P-443.
২১০। J. N. Sarker, *History of Bengal*, 2nd Part, Pp-375-413.

জীবন যাপন প্রণালী ও জীবনযাত্রার মান

সমাজের শ্রেণী বিন্যাস ও জীবনযাত্রার মানঃ

সুলতানী আমলের মত মোগল আমলেও বাংলার সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস একই রকম ছিল। সুলতানদের মত সুবাদার-নবাবগণও ছিলেন সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে এবং প্রজা সাধারণের

অভিভাবক স্বরূপ। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে প্রজা সাধারণ সুবাদার নবাবদেরকে শ্রদ্ধা করত ও অভাব অভিযোগ পেশ করত। এক জন নারী দুধ বিক্রেতা সুবাদার মীর জুমলার কাছে তাঁর একজন চাকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় এবং মীর জুমলা তাকে কঠোর শাস্তি দেন।[২১১] অমুসলিম প্রজাগণও তাদের ধর্মীয় বিষয় নিষ্পত্তির জন্য মুসলিম শাসকের দারস্থ হতেন। নবদ্বীপের বঙ্গীয় বৈষ্ণব ও বৃন্দাবনপন্থী বৈষ্ণবদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে তারা মুর্শিদকুলী খানের কাছে সালিশের আবেদন জানায়।[২১২]

নবাব ও সুবাদরগণ প্রজাপালন ও জনকল্যাণকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করতেন। বাংলার ঐশ্বর্যশালী অর্থনীতি সুবাদার নবাবদের জীবনকেও ঐশ্বর্যমন্ডিত করেছিল। M.A Rahim বলেছেন-

"In the palace or in the court, in the capital or in the camp, or in his march, the subadar or the nawab was surrounded by pageantry and magnificence in imitation of the Emperor. Spectacular forms and ceremonials preceded and followed him in the court and his movements as well. He built a spelendid city for his capital, lofty palaces for his harem and court. He maintained a large establishment of domestics and attendants and lived in conspicuous distinction."[২১৩]

২১১। J. N. Sarker, *Bengal Nawabs*, p-2 ;দ্রষ্টব্য: M.A Rahim, vol-II, p-136.
২১২। M.A Rahim Vol-II, P-137.
২১৩। M.A Rahim Vol-II, P-140.

মোগল আমলে সুবাদার, নবাব ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ আড়ম্বর পূর্ণ প্রাসাদ ও বিলাস ভবন নির্মাণ করেন। ক্ষুদ্র সেনা ছাওনি থেকে শাসনকর্তাদের শাসনকেন্দ্র বৃহৎ ও সুন্দর নগরীর মর্যাদা লাভ করে। ঢাকা নগরীর জন্ম, বিস্তার ও বিকাশ সবই মোগল আমলের অবদান।

সুবাদার নবাবদের দরবার অনেক জাঁকজমকপূর্ণ হত। William Hedges শায়েস্তা খানের সাথে তার সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন যেখানে নবাবদের দরবারের চিত্র ফুটে উঠেছে-

At 9 am in the morning I went to wait on the Nawab, Who after ¼ hours attendance sent officers to bring me into his presence, being sat under a large cnopy of state made of crimson velvet richly embroidered with gold and silver and deep gold and silver fringes, supported 4 bamboos plated over with gold. I was directed by the Emir Tuzuck, or Master of ceremonies, to sit over against the Nawab nearer the canopy than his Duan (diwan) or any other person.[২১৪]

২১৪। William Hedges Diary, P-43; উদ্বৃত্তঃ M. A Rahim, Vol-II, P-144.

মুর্শিদকুলী খান 'চেহেল সেতুন' নামে চল্লিশস্তম্ভের একটি জমকালো প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এখানেই নবাবের দরবার বসত এবং এই দরবার গৃহে তিনি ঐতিহাসিক মসনদ (সিংহাসন) স্থাপন করেন। এই মসনদ ছিল মার্বেল পাথরে নির্মিত গোলকৃতি ও সাড়ে তিন হাত ব্যাস বিশিষ্ট। এক হাতের বেশী উচু চারটি স্তম্ভের উপর এটি স্থাপিত ছিল। একখন্ড পাথর দিয়ে সমগ্র মসনদটি নির্মিত হয়েছিল। সোনালী রূপালী ঝালর (পাড়) বিশিষ্ট একটি

গাঢ় লাল রঙের জমকালো চাঁদোয়া দ্বারা এর উপরি ভাগ সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল। শাহজাদা শুজা 'খান নজর' নামক একজন শিল্পীর দ্বারা এটি তৈরী করেছিলেন।[২১৫] দরবারের আচার অনুষ্ঠানেও শান শওকতের পরিচয় পাওয়া যায়। চেহেল সেতুনের প্রবেশ দরজায় 'নওবত খানা' ছিল, যেখানে বারজন লোক সকাল সন্ধ্যায় নওবত বাজাতেন।[২১৬] কোন কোন নবাব মাহী বা মৎস প্রতীক চিহ্নিত আলম বা পতাকা বহনের বিশেষ অধিকার লাভ করেছিলেন। শোভাযাত্রা বা কোন অভিযানের সময় পতাকা বহনকারীরা এই উজ্জ্বল পতাকা বহন করত এবং বাদকদল নাকারা বা দামামা বাজাত।

নবাবগণ নিজেদের জন্য, পরিবারবর্গ ও আমির ওমরাহদের জন্য সম্রাটের কাছ থেকে জমকালো উপাধি ও বিশেষ অধিকার লাভের ব্যবস্থা করতেন। আলিবর্দী খান 'মহব্বতজঙ্গ' 'সুজা উল মুলক' ও 'হুসামউদ্দীন', সিরাজদ্দৌলা 'শাহ্ কুলী খান বাহাদুর' ও 'মনসুর উল মুলক' উপাধি লাভ করেছিলেন। এছাড়া তাঁরা সাত হাজারি মনসব লাভ করেছিলেন।[২১৭]

২১৫। M.A. Rahim, vol-II, P-144.
২১৬। *Muzaffar Nama*, Karam Ali, p-58; M.A. Rahim, vol-II, p-148.
২১৭। M.A. Rahim, vol-II, P-144

সুবাদার বা নবাবের দরবার ও পরিবারের রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য একদল কর্মচারী ছিল[২১৮]–

১। দিউয়ান- অর্থবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

২। বখশি- সামরিক প্রশাসন ও দরবারের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৩। বারবিক (আমির হাজিব / মীর তুজুক)- দরবারের অনুষ্ঠানাদির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও

পরিচালক।

৪। নকীব (ঘোষক)- নবাবের আগমন বার্তা ও দর্শন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতেন।

৫। আরজ বেগ- প্রজা সাধারনের অভাব অভিযোগ শ্রবণ ও দরখাস্ত পেশ করতেন।

৬। দারোগা-ই-দিউয়ান খানা - দরবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তত্ত্বাবধান করতেন।

৭। জ্যোতিষী-গুরুত্বপূর্ণ কার্যের শুরুতে শুভ দিন ক্ষণ নির্ধারন করতেন।

৮। দারোগ-ই-খান বরদার- (সিলদার) নবাবের অস্ত্র-শস্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক ।

৯। সার জানদার-দেহরক্ষী দলের প্রধান।

১০। খান আলা - অভিজাত ব্যক্তি ও কর্মচারীদের সাথে নবাবের যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

১১। আফতাবচী-নবাবের গোসল খানার দায়িত্ব পালন করতেন।

১২। মীর ই -আখুর - অশ্বশালার দায়িত্বে ছিলেন।

১৩। শাহনা-ই-ফিল - হস্তীশালার দায়িত্বে।

২১৮। দ্রষ্টব্যঃ *Muzaffar Nama*; I.H. Qureshi, *Administration of the Sultanate of Delhi*; *সিয়ার উল মুতাখখেরিন*, (বাংলা অনুবাদ)।

১৪। দারোগা-ই-ফরাশখানা - নবাব ও দরবারের প্রয়োজনীয় পোশাকের ও সাজসজ্জার

নিয়োজিত দায়িত্বে।

১৫। মশালচি-আলোকদানা ও বাতির ব্যবস্থাপনা করতেন ।

১৬। শামাদার- মোমবাতিসমূহের সংরক্ষক।

১৭। বকাউল-রন্ধনশালা ও ভোজ অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক।

এছাড়া জ্ঞানীগুণী, আলিম, ওলামা, চিকিৎসক, কবি, গল্পকথক, রসিক ও আমোদী লোক প্রমুখদের নিয়ে নবাবের দরবার ভরপুর থাকত। সিয়ার উল মুতাখখেরিন এ বর্ণিত নবাব আলীবর্দী খানের দৈনন্দিন কার্যতালিকাতে নবাবের ব্যক্তিগত ও জনজীবনের চিত্র উঠে এসেছে। এতে নবাবের নিয়মানুবর্তিতা, কর্মনিষ্ঠা, বিদ্যানুরাগ, আহারের ব্যাপারে রুচিশীলতা ও ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।[২১৯] সুলতানদের মত বাংলার সুবাদার নবাবগণও বিশাল হারেম সংরক্ষণ করতেন। মা, স্ত্রী, বোন, কন্যা, আত্মীয় স্বজন ও নির্ভরশীলা রমণীদের নিয়ে নবাবের হারেম গঠিত হত। হারেমের প্রধান ছিলেন নবাবের বেগম। তিনি নবাবের সুখ স্বাচ্ছন্দের দিকে নজর রাখতেন এবং একদল মহিলা কর্মচারী তার নির্দেশ পালনে রত থাকত। হারেমের নিরপাত্তার দায়িত্বে ছিল খোজাগণ। হারেম অনেক সময় আশ্রয়হীনা রমণী, দরিদ্র ও অনাথ বালিকাদের আশ্রয়স্থল হিসেবেও ভূমিকা রেখেছে। নবাব আলিবর্দী খানের অন্দর মহলে বিদ্রোহী আফগান সরদার শমসের খানের স্ত্রী, কন্যা, পরিজনের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যদিও এই বিদ্রোহীদের হাতে নবাবের জামাতা নিহত এবং কন্যা বন্দী ছিল, তথাপি তিনি এই আফগান মহিলাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাদের

২১৯। *সিয়ার উল মুতাখখেরিন*, (বাংলা অনুবাদ), দশম অধ্যায়।

আপ্যায়নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতেন। এই পর্দানশীল আফগান মহিলাদের সম্মানের খাতিরে নবাব বিনা নোটিশে অন্দর মহলে প্রবেশ করতেন না এবং তার প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলাকেও বিনা নোটিশে হারেমে প্রবেশ করতে মানা করেছিলেন।[২২০]

বেগমগণও সামাজিক কার্যাবলীতে ভূমিকা রাখতেন, অনাথ দরিদ্র বালিকাদের প্রতিপালন ও বিয়ে সাদির ব্যবস্থা করতেন এবং ক্রীতদাসী বালিকাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন।

শরিফুন্নেসা আফগান সরদার শামস খানের কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বিবাহিত দম্পতির ভরণপোষণের জন্য কয়েকটি গ্রাম দান করেছিলেন।[২২১]

কোন কোন নবাবের হারেমে উপপত্নী থাকত। নবাব সরফরাজ খানের হারেমে কিছু উপপত্নী ছিল এবং তার মৃত্যুর পর আলিবর্দী খানের ভ্রাতা হাজী আহমদ তাদের কয়েকজনকে গ্রহণ করেন।[২২২] করম আলীর মতে, সিরাজউদ্দৌলার হারেমে ৫০০ জন রমণী ছিল এবং পলাশীর যুদ্ধের পর তারা মীর জাফর ও মীরনের অধিকারে আসে। মীর জাফর এসব সুন্দরী রমণীর দশজনকে রবার্ট ক্লাইভকে উপহার দেন।[২২৩] কোন কোন নবাব হারেমে বহু গায়িকা, নর্তকী রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। মির্যা নাথানের মতে, সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলা থেকে সেরা গায়িকা ও নর্তকীদের দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন।[২২৪] সিরাজউদদৌলা ও নওয়াজিশ মুহম্মদ শাহমত জঙ্গ (ঘসেটি বেগমের স্বামী) এর বহু সংখ্যক গায়িকা ও নর্তকী ছিল। ইসলাম খানের অধীনে লুতি, হরকানী, কাঞ্জী ও ডোমনীদের বিশাল বহর ছিল যাদের পেছনে বছরে নয় লাখ ষাট হাজার টাকা ব্যয় করতেন।[২২৫]

২২০। পূর্বোক্ত, প্রথম অধ্যায়।

২২১ । সিয়ার, ১ম অধ্যায়।

২২২। *Ahwal-I-Muhabatjang*, p-90; M. A. Rahim, vol-2, p-151.

২২৩। Karam Ali, Muzaffarnama, Pp-77-78; M. A. Rahim, পূর্বোক্ত, p-151।

২২৪। মির্যা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*(মূলগ্রন্থ), ১ম খণ্ড, পৃ-২২৪; M. A. Rahim, পূর্বোক্ত, P-151.।

২২৫। *সিয়ার* (মূলগ্রন্থ), ২য় খণ্ড, পৃ-১৯১; M. A. Rahim, পূর্বোক্ত, P-151.

নবাবের পরেই তার পরিবারবর্গ, উচ্চ শ্রেণীর আমলাদের নিয়ে ছিল অভিজাত শ্রেণীর অবস্থান। সুলতানী আমলের মত মোগল আমলেও আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখগণ সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তবে তারা অন্যদের মত বিলাসী জীবন যাপন করতেন না।

সুবাদারদের সময়ে বেশিরভাগ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা দিল্লী থেকেই নিযুক্ত হতেন এবং দায়িত্বপালন শেষে দিল্লীতেই ফিরে যেতেন। এ সময় মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ ও

পদন্নোতি দেয়া হত। মির্জা নাথান সামান্য পদে চাকুরী শুরু করেছিলেন এবং যোগ্যতা বলে পরবর্তীতে ৪০০ মনসব (জাত) পদে উন্নীত হন।[২২৬] জাহাঙ্গীর কুলী খান, মুর্শিদ কুলী খান, মুস্তফা খান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও সামান্য অবস্থা থেকে অভিজাত অমাত্য শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন।

স্বাধীন নবাবদের আমলে মেধাভিত্তিক আভিজাত্যের বিচ্যুতি ঘটে বলে ড. এম. এ. রহিম মনে করেন।[২২৭] এ সময় দিল্লী থেকে কর্মকর্তা নিয়োগ প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। নবাবগণ স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতেন এবং স্থানীয়দের নিয়োগ প্রদান করতেন। এভাবে নবাবি আমলে হিন্দু অমাত্যদের সমন্বয়ে অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠে। নবাব শুজাউদ্দীন ইরানি বহিরগতদের বাংলায় আশ্রয় দেন এবং উচ্চ মনসব ও দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রদান করেন। এভাবে বাংলায় শিয়া অমাত্যগণও অভিজাত শ্রেণীতে প্রাধান্য বিস্তার করে। নবাব সরফরাজ খান অনেক অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিকে উচ্চ পদে আসীন করেন। আলিবর্দী খান তার বোন জামাতা মীর জাফরকে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শুধু পারিবারিক বিবেচনায় উচ্চ পদে সমাসীন করেছিলেন। অভিজাত অমাত্যবর্গ উচ্চ হারে বেতন পেতেন এবং নবাবের অনুকরণে তারাও

২৬। *বাহরীস্তান-ই-গায়বী* (বাংলা অনুবাদ), পৃ-১৬৮।
২৭। M. A. Rahim, Vol-II, P-152.

বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। নবাবের মত মনসবদারগণেরও একদল কর্মচারী ছিল। একশত সৈন্যের একজন ক্ষুদ্র মনসবদার হয়েও মির্যা নাথান প্রথম চাকুরী জীবনে একজন দিউয়ান, একজন বখশি ও অন্যান্যের ভরণ পোষণ করতেন। এরপরও তার হাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত থাকত, না হলে এত ক্ষুদ্র একজন মনসবদার ৪০০ টাকা ব্যয়ে একখন্ড দুষ্প্রাপ্য মসলিন বস্ত্র ক্রয় করতে পারতেন না।[২২৮]

২২৬। বাহরীস্তান-ই-গায়বী(বাংলা অনুবাদ), পৃ-১৬৮।
২২৭। M.A. Rahim, Vol-II, P- 152.
২২৮। বাহরীস্তান-ই-গায়বী (বাংলা অনুবাদ), পৃ-৫০।

বাংলার আমীর ওমরাহগণও মোগল সম্রাটের কাছ থেকে বাহারি উপাধি লাভ করতেন। যেমন মহব্বতজঙ্গ, শুজা উল মূলক, হুশাম-উদদৌলা, শাহামতজঙ্গ, সওলৎজঙ্গ, হায়বৎজঙ্গ, সাবিতজঙ্গ, শওকতজঙ্গ, বাবুরজঙ্গ ইত্যাদি।[২২৯] অনেক সময় খ্যাতনামা আমিরদেরকে মাহী, রাজকীয় পালকি, রাজকীয় পোষাক, নাকারা প্রভৃতি সম্মান সূচক নিশান ব্যবহার ও নওবত (মিলিত বাদ্য) বাজনোর অধিকার দেয়া হত।

মোগল আমলে বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীও অভিজাত শ্রেণীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। সুবাদারদের আমলে এই সংখ্যা ছিল নগন্য। মোগলদের কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা এবং এ সুযোগে স্বাধীন নবাবদের উত্থানে বাংলায় স্থানীয়দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সব শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভের জন্য নবাবগণ স্থানীয়দের বেশী অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন। মুর্শিদকুলী খানের সময়ে বাংলায় সরকারি দফতরের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগে হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুর্শিদকুলী খানের সময় যেসব উচ্চপদস্থ হিন্দু অমাত্য ছিলেন তাদের মধ্যে ভূপত রায় (খালসার দিউয়ান), কিষেন রায় (ব্যক্তিগত সচিব), দর্পনারায়ণ (সদর কানুনগো, পরে দিউয়ান নিযুক্ত হন), রঘুনন্দন

২২৮। *বাহরীস্তান-ই-গায়বী* (বাংলা অনুবাদ), পৃ-৫০।
২২৯। *সিয়ার*, মূলগ্রন্থ, পৃ-৫২৮; M.A. Rahim, Vol-II, Pp-144-145।

(সদর কানুনগো, পরে দিউয়ান), যশোবন্ত রায় (মুর্শিদকুলী খানের দৌহিত্র সরফরাজ খানের গৃহ শিক্ষক ও সচিব) প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।[২৩০]

নবাব শুজাউদ্দীনের সময়ে হিন্দু অমাত্যের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। ইউসুফ আলীর মতে, আলম চাঁদ, ব্যাংকার জগৎ শেঠ, আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহমেদ ছিলেন নবাব শুজাউদ্দীনের রাজ্যের তিনটি স্তম্ভ স্বরূপ।[২৩১]

নবাব আলিবর্দী খানের সময়ে তাদের উন্নতি চরম শিখরে পৌঁছে এবং তাদের প্রভাব রাজস্ব, সামরিক ও বেসামরিক সব বিভাগে ছড়িয়ে পড়ে। সিরাজদ্দৌলার সময়েও রাষ্ট্রের গুরবত্বপূর্ণ পদসমূহ হিন্দুদের অধীনে ছিল। নবাব সিরাজ মোহন লালকে 'মহারাজা' উপাধীতে ভূষিত করে প্রধানমন্ত্রীর পদ দান করেছিলেন। J.N. Sarker এর মতে নবাবদের অধীনে একাধিক বাঙালি হিন্দু 'রায় রায়ানে'র পদমর্যাদা লাভ করেন। তিনি আরো বলেন, "বর্তমানে বহু হিন্দু পরিবার রায়, তরফদার, দস্তিদার, কানুনগো, খাসনবীস প্রভৃতি উপাধি বহন করছেন। এসবই বাংলার নবাবদের অধীনে মুসলমান শাসনকার্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের এবং সে সময়ে তাদের উচ্চ পদমর্যাদায় উন্নীত হবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"[২৩২] কিন্তু এই অমাত্যবর্গ পরবর্তীতে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেয় এবং বাংলার স্বাধীন নবাবী আমলের পতনে ইংরেজদের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তবে ঢালাও ভাবে সকল হিন্দু অমাত্য এই অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন না। যাই হোক মোগল বাংলার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল অভিজাতবর্গের জীবন যাপনে বিলাসিতা ও আড়ম্বরতা একটি প্রধান বিষয় ছিল।

২৩০। M.A. Rahim, vol-II, P-146.

২৩১।Yusuf Ali, *Ahwal-I-Muhabbatjang*, P-84; M.A. Rahim, Vol-II, P-170.

২৩২। J.N. Sarker, *History of Bengal*, vol-II; M. A. Rahim, Vol-II, P-171.

এ প্রসঙ্গে Dr. M.A. Rahim বলেন-

"There was a keen competition among these nobles in the display of attainments, refinement, distinction in service as well as in gorgeus living."[২৩৩]

মোগল আমলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বড় বড় বনিকগণও অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হন। মুহম্মদ সাদিক হাজি গিয়াসকে বণিক সমিতির সভাপতি ও বাংলার সেরা ধনী হিসেবে উল্লেখ করেছেন[২৩৪]।

হিন্দু বণিকগণও এ সময় সমৃদ্ধি লাভ করে সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বাংলায় এ সময় ব্যাংকার বা মহাজন এবং ইউরোপীয় বণিকদের প্রতিনিধি হিসেবে দালাল শ্রেণীর আবির্ভাব হয় এবং সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মহাজনী ব্যবসায়ের মাধ্যমে উঠে আসা অভিজাতদের মধ্যে জগৎ শেঠের পরিবার ও উমিচাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবার্ট ওর্ম এর মতে জগৎ শেঠের বার্ষিক আয় ছিল চলিৰশ লক্ষ টাকা।[২৩৫] জগৎ শেঠের প্রভাব প্রতিপত্তি যে কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সমতুল্য ছিল। উমিচাঁদ সম্পর্কে ওর্ম বলেছেন, "বিভিন্ন কক্ষে বিভক্ত তার বাসভবনের পরিধি, অবিরামভাবে বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত তার কর্মচারী ও ভৃত্য এবং নিয়মিত বেতনভুক্ত সশস্ত্র অনুচরবৃন্দ এসব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উমিচাঁদের সাদৃশ্য বা তুলনা বণিক অপেক্ষা রাজার সঙ্গে বেশি ছিল।"[২৩৬]

অভিজাত শ্রেণীর আর একটি অংশ শেখ, সৈয়দ, আলিম, উলামা, পীর, দরবেশ প্রমুখ সম্পদশালী না হয়েও মর্যাদা প্রাপ্তির দিক থেকে সমাজে অনেক বেশী প্রভাবশালী ছিলেন।

২৩৩। M.A. Rahim, vol-II, P-162.
২৩৪। মুহম্মদ সাদিক, *সুবহ-ই- সাদিক;* উদ্বৃতঃ M.A Rahim, পূর্বোক্ত, P-181।
২৩৫। M.A. Rahim, Vol-II, P-50।
২৩৬। পূর্বোক্ত, P-50।

নবাব, সুবাদার থেকে শুরু করে সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আইন ও নীতিশাস্ত্রীয় বিষয়াদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদসমূহে যেমন সদর (ধর্মীয় প্রধান), কাজি (বিচারক), মির-ই-আদল, মুহতাসিব (সমাজে নৈতিকতার সংরক্ষক) প্রভৃতি পদে আলিম-ওলামাগণকেই নিয়োগ দেয়া হত। সুলতানী ও মোগল আমলের কাজিগণ অনেক বেশী

নীতিনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও সাহসী ছিলেন। রায় দেয়ার ক্ষেত্রে তারা পক্ষপাতিত্ব করতেন না, কোন কিছুর পরওয়া করতেন না। শাসককেও তাদের রায়ের কাছে মাথা নত করতে হত। আকবরের মত শক্তিশালী একজন সম্রাটের ধর্মনীতির সাথে এক মত না হওয়ায় আলিম-ওলামাগণ আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

ঐ সময়ের সাহিত্যেও আলিম-ওলামাগণের সামাজিক অবস্থানের চিত্র উঠে এসেছে। আলাওল তার 'তোহফা' কাব্যে বলেছেন যে, একজন বিদ্বান ব্যক্তি হাজার ভক্তের চেয়ে শ্রেয়। তিনি দোজখ থেকে মুক্তি এবং বেহেস্ত লাভের উপায় হিসেবে বিদ্বান ব্যক্তির সেবা করার উপদেশ দিয়েছেন। অন্য দিকে উজির বাহরাম তার 'লাইলী মজনু' কাব্যে বলেছেন, "সে পিতা নিজেকে সম্মানিত ব্যক্তি মনে করে, যদি তার পুত্র শিক্ষিত হয়। বিদ্যা মানুষের অলংকার, গলায় হার ও শিরোভূষণ রূপে পরিগণিত হয়। বিদ্যাহীন একজন সুন্দর পুরুষকে মূল্যহীন মনে করা হয়।"[২৩৭]

সুলতানী আমলের শেষাংশে ভূস্বামী ও জমিদারগণ শক্তিশালী হতে শুরু করেন এবং মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে এরা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। বার ভূঁইয়াদের প্রভাব প্রতিপত্তি আজও কিংবদন্তী হয়ে আছে। ধন সম্পদ মর্যাদা ও ক্ষমতা লাভের দিক থেকে তারাও অভিজাত শ্রেণীর অংশে পরিণত হন। মোগল আমলে বিদ্রোহী জমিদারদের পতন ঘটে

২৩৭। দৌলত উজির বাহারাম, *লাইলী-মজনু*, সম্পাদিত-আহমদ শরীফ, ঢাকা ১৯৫৫, পৃ-১৮।

এবং নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এ নতুন জমিদার শ্রেণীতে হিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব জমিদারগণ আড়ম্বর ও বিলাসিতার ক্ষেত্রে নবাবদের অনুকরণ করতেন। কবি ভারতচন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ দরবারের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়,

মহারাজা নবাবের মতই তার দরবারে দিউয়ান, বখশি, মুনশি, পন্ডিত, জ্যোতিষী, কবি, কালায়ান্ত (গায়ক), নৃত্য দলের প্রধান, বিদূষক, রক্ষীদল প্রধান, আমিন, পেশকার, কোতয়াল, অশ্ব ও হস্তী বাহিনীর প্রধান, তীরন্দাজ প্রধান, সেনাপতি ও অন্যান্য সভাসদবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। তারা পরিবার পরিজনের আরাম আয়েশের জন্য বহু সংখ্যক চাকর-নফর, ক্রীতদাস-দাসী রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কৃষ্ণচন্দ্র একটি বানরের বিয়েতে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন।[২৩৮]

এ থেকে বোঝা যায় জমিদারগণ কত বিলাসপরায়ণ ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। তাদের হারেম নবাবের হারেমকেও হার মানাত। তবে জমিদারগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতাও দিয়েছেন। নরসিংহবসু (ধর্ম্মমঙ্গল প্রণেতা) বীরভূমের জমিদার আসাদউল্লাহ্ খানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন।[২৩৯] 'অন্নদামঙ্গল' এর কবি ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের, 'ধর্মমঙ্গল' প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্তী বর্ধমানের জমিদার মহারাজা কৃতিচন্দ্রের, 'কৃষ্ণমঙ্গল' প্রণেতা কবি শংকর চক্রবর্তী বিষ্ণুপুরের জমিদার গোপাল সিংহ দেবের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন।[২৪০]

সুলতানী আমলে বুদ্ধিবৃত্তিক পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি মোগল আমলেও বজায় ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পকলার প্রসারে এই শ্রেণীটির বিস্তৃতি ঘটে।

২৩৮। M. A. Rahim, Vol-II, P-207.
২৩৯। কে.পি.সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ-১১৫।
২৪০। কে.পি. সেন, পূর্বোক্ত, পৃ-৮৯৯,৮০১,৬১৪।

মসলিনের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িতরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশে পরিণত হয়। এ সময় শিল্পকলার সমাদর ছিল, চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হত। আইনজীবী, চিকিৎসক, লেখক, কবি, ভাস্কর, মোল্লা মৌলভীগণ সমাজে বিশিষ্ট স্থান দখল

করেছিলেন। সামরিক, বেসামরিক বিচার ও রাজস্ব বিভাগের নিম্ন পদস্থ কর্মচারীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ক্ষুদ্র জমিদার গোষ্ঠীও মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এই শ্রেণীটি রাজনীতিতে সরাসরি সক্রিয় না থাকলেও তাদের মেধা ও যোগ্যতা দ্বারা রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন। কবি সাহিত্যিকদের রচনায় রাজনীতি সচেতনতার প্রমান পাওয়া যায়। কবি ও লেখকগণ তাদের রচনায় শাসকের সুশাসনের প্রশংসা যেমন করেছেন তেমনি সমালোচনাও করেছেন। কবি মুকুন্দরাম রাজা মানসিংহের সুবাদারির সময়ে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় কর্মচারী, রাজস্ব দালাল ও রাজস্ব আদায়কারীর অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেছেন।[২৪১]

যা হোক, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি বিত্তশালীদের মত বিলাসী জীবন যাপন না করলেও স্বচ্ছল ভাবেই জীবন কাটাতেন। তাদের কর্মব্যস্ত দিনগুলো হাসি আনন্দে কাটত, কারণ সমাজে নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর মোগল বাংলায় দিল্লীর সাথে বিরোধের অবসান হওয়ায় রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুলতানী যুগের নিম্নশ্রেণীর মর্যাদা ও সীমারেখা মোগল যুগেও একই ছিল। মুসলিম শাসনাধীনে সাধারণ মুসলিমদের চাকুরীর অনেক সুযোগ সুবিধা ছিল। তারা সেনাবাহিনী বা প্রশাসনে ছোট ছোট চাকুরীতে যোগদান করতে পছন্দ করত। তারা সুবাদার, নবাব, জমিদারদের নৌবহর, নৌসেনা দলে যোগদান করত। এছাড়া অফিস আদালতে পেয়াদা এবং অভিজাত শ্রেণীর অনুচর ও পরিচারকের চাকুরি করত।[২৪২] এছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে

২৪১। চন্ডীকাব্য, উদ্ধৃতঃ M.A Rahim, Vol-II, P-121.
২৪২। ষষ্ঠীবর, *মনসামঙ্গল*, পৃ-২৫৪ ; উদ্বৃতঃ M.A. Rahim, Vol-II, P-218.

বাণিজ্য জাহাজসমূহে নাবিক ও অন্যান্য কর্মচারী হিসেবে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ চাকুরী পেত। দর্জির পেশা মুসলিমদের জন্য একচেটিয়া ছিল, বয়ন শিল্পেও মুসলিম তাঁতীরা একচেটিয়া প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। খোজাকরণ ও ক্রীতদাস ব্যবসা মোগল আমলেও বজায় ছিল।

বাংলার অন্যতম প্রধান আমদানি পণ্য ছিল দাসদাসী। ক্রীতদাস আমাদানির বড় উৎস ছিল আবিসিনিয়া, পারস্য, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, আর্মেনীয়া। জর্জিয়া এবং ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দাস-দাসী সরবরাহ করা হত। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে শ্রমিকের চাহিদা পূরণে ক্রীতদাস আমদানি করা হত। এছাড়া সুবাদার, নবাব, অভিজাতবর্গ ও বিত্তশালীদের গৃহকর্ম ও গৃহের পাহারাদার হিসেবে দাসী ও খোজা নিযুক্ত করা হত। আবুল ফজলের বর্ণনা মতে, সম্রাট আকবর জোর করে ধরে এনে দাস বানানোর রীতি বন্ধ করার আদেশ দেন[২৪৩]।

সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় প্রচলিত খোজাকরণ প্রথা এক আদেশ জারি করে নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু তার পরেও দাস প্রথা বন্ধ হয় নি। পর্তুগীজ, আরাকানের মগ, ইংরেজ ও অন্যান্য বণিকদের মাধ্যমে দাস ব্যবসা আরও বিস্তার লাভ করে। তবে ইতিবাচক দিক ছিল বাংলার দাসরা নির্যাতনের স্বীকার না হয়ে বরং মুসলিম পরিবার গুলোতে নিরাপত্তা ও মর্যাদা পেয়েছে। ক্রীতদাসদেরকে পরিবারের সদস্য মনে করে লালন পালন করা হত। অনেকেই নিজের যোগ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে ক্ষমতার উচ্চাসনেও আসীন হয়েছিলেন। বাংলার হাবশি ক্রীতদাসগণ সিংহাসনে পর্যন্ত আসীন হয়েছেন। যোগ্যতা অনুযায়ী ক্রীতদাসদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হত। হারেমে দাসীদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা হত। সারা, গুল ও লালা নামে তিনজন ক্রীতদাসী গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের হারেমে সম্মান ও প্রতিপত্তির আসন দখল করেছিল। লুৎফুন্নেছা ছিলেন নবাব সিরাজের মা আমিনা বেগমের একজন ক্রীতদাসী । তাকে উত্তরসূরিরূপে লালন পালন করে আমিনা বেগম পুত্রের সাথে বিয়ে দেন।[২৪৪]

২৪৩। *আকবর নামা*, ৩য় খণ্ড; M. A. Rahim, পূর্বোক্ত, P-221.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য:

বাঙালি মুসলিম সমাজে ধর্মনিষ্ঠার চর্চা ষোড়শ শতক পর্যন্ত বজায় ছিল। সমসাময়িক সাহিত্যে এর যথেষ্ট প্রমান মেলে যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সপ্তদশ শতক থেকে সামাজিক চরিত্রের অবনিত হতে শুরু করে। উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের মত বাংলায়ও এ সময় নানা মতের সংমিশ্রণে ধর্মমতের বন্ধন ও মুসলিম ঐক্য শিথিল হয়ে যায়। ইসলাম বিরোধী নানা ভাবধারা মুসলিম সমাজে শক্ত আসন গেঁড়ে বসে। হিন্দু যোগী ও তান্ত্রিকদের প্রভাবে পীর দরবেশগণ প্রভাবিত হয় এবং পীর পূজা ও কবর পূজাসহ নানা শিরক-বিদাত সমাজে বিস্তার লাভ করে।

আলিম-ওলামা ও ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জযবা (স্পৃহা) কমতে থাকে, ফলে সমাজে চারিত্রিক অধঃপতন শুরু হয়। সম্রাট আলমগীর অভিযোগ করেন তার সাম্রাজ্যে সৎ ও সরল লোক একান্ত বিরল এবং প্রশাসনে দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহের জন্য উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না।[২৪৫] এ সময়ে বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থায় সৎ ও কর্তব্যপরায়ন কর্মচারীর অভাব ছিল। উচ্চ শ্রেণীর কর্মচারীদের অসাধুতা ও বিশ্বাসহীনতা সর্বজনবিদিত হয়ে পড়ে। নবাব আলিবর্দীর একজন সামরিক কর্মচারী যুদ্ধের সময় দল ত্যাগ করে মারাঠাদের পক্ষে যোগদান করে।[২৪৬] মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাস বিখ্যাত। তিনি সেনা বিভাগের বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেন এবং নবাব আলিবর্দী খানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন।[২৪৭] এছাড়া তিনি অবাধ্য জার্মান বণিকদের কাছ থেকে ১০০০০/- টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে

২৪৪। *সিয়ার* (মূলগ্রন্থ), পৃ-৫৮৫; M. A. Rahim, Vol-II, P-244.
২৪৫। M.A. Rahim, Vol-II, P-231.
২৪৬। *সিয়ার* (বঙ্গানুবাদ), পৃ-১৩৪।
২৪৭। পূর্বোক্ত, পৃ-২৫২।

তাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন।[২৪৮] তবে মীর জাফর ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছেন পলাশীর যুদ্ধে তার ভূমিকার জন্য। হিন্দু অভিজাতবর্গ ও ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়ে তিনি বাংলার স্বাধীন নবাবীর পতনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। হাজী আহমদের জামাতা

আতাউল্লাহ খান, আফগান সেনাপতি মুস্তফা খান ও শমসের খানও নবাব আলীবর্দী খানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং শেষোক্ত দু'জন, নবাবের জামাতা জৈনুদ্দিনকে হত্যা করে।[২৪৯] মোহাম্মদী বেগ নবাব সিরাজের পিতার অধীনে লালিত পালিত হয়েও নবাবকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।[২৫০]

স্বাধীন নবাবী আমলে হিন্দুদেরকে সবেচেয় বেশী পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়েছে কিন্তু বিশ্বাস ঘাতকতা ও স্বার্থপরতায় তারাই সবচেয়ে বেশী এগিয়েছিল। মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে (দিলৱীতে) যেমন বিশ্বাসঘাতক আমলা শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল তেমনি বাংলা প্রদেশেও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে দেশের স্বার্থ পর্যন্ত বিকিয়ে দিতেন।

সমাজে নারীর অবস্থানঃ

সুলতানী আমলের মতো মোগল আমলেও নারীরা পরিবার ও সমাজে নিরাপত্তা, সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন । গৃহের অন্তরালে অবস্থান করেও মোগল বাংলার অনেক নারী যোগ্যতা ও দক্ষতায় ইতিহাস বিখ্যাত হয়েছেন। বাংলার অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর নারীদের তুলনায় মুসলিম নারীগণ যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতেন। পর্দা প্রথা সমকালীন সমাজে অভিজাত্য ও সামাজিক শালীনতার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ প্রথা

২৪৮। M.A. Rahim, vol-II, P-232.
২৪৯। *সিয়ার (বঙ্গানুবাদ)*, পৃ-২৭১-২৭২।
২৫০। পূর্বোক্ত, পৃ-৫০২।

হিন্দু সমাজেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে পর্দার অন্তরালে থেকেও নারীরা মেধা ও যোগ্যতার বলে সমাজ ও রাজনীতিতে তাদের অবস্থান তৈরী করে নিতেন। মুর্শিদকুলী খানের কন্যা ও নবাব শুজাউদ্দিনের স্ত্রী জিন্নাতুন্নেসা এবং উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্তা দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

মুর্শিদকুলী খানের স্ত্রী দারদানা বেগম প্রশাসনে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন।[২৫১] নবাব শুজাউদ্দিনের কন্যা নাফিসা বেগম সংস্কৃতিমনা ও প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন। আলিবর্দী খান তাঁর (নাফিসা বেগম) ভাই সরফরাজ খানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করলেও তিনি নাফিসা বেগমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। আলিবর্দীর জামাতা নওয়াজিশ মুহম্মদ খান নাফিসা বেগমকে নিজ গৃহে স্থান দিয়ে মাতা রূপে গ্রহণ করেন এবং গৃহের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর হাতে তুলে দেন।

নাফিসা বেগমও তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন কিন্তু কঠোর পর্দা প্রথা মেনে চলতেন বিধায় কখনও নওয়াজিশ মুহম্মদকে দেখা দিতেন না। নাফিসা বেগম নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের তালুক ও পারিবারিক সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করতেন।[২৫২] মির্যা নাথানের বোন বাংলায় আগমন করলে এখানকার জমিদার ও সিকদারগণ বিরাট সম্বর্ধনা ও উপহার উপঢৌকন দেন। সুবাদার ইব্রাহিম খানের স্ত্রী তাকে আতিথেয়তা প্রদান করেন।[২৫৩]

নবাব আলিবর্দী খানের স্ত্রী শরফুন্নেসার প্রভাব প্রতিপত্তির কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তিনি দরবারে, যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় স্বামীর একজন উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা রাখতেন। নবাবও তার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং বেগমের পরামর্শেই সিরাজুদ্দৌলাহকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।[২৫৪] নবাব সিরাজুদ্দৌলার উপরও শরফুন্নেসার অনবদ্য প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এই মহিয়সী নারী বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পাশাপাশি জনকল্যাণকামীও ছিলেন এবং উদারহস্তে দান করতেন। আলিবর্দী খানের জেষ্ঠ্য কন্যা ও নওয়াজিশ মুহাম্মদের স্ত্রী ঘষেটি বেগম উচ্চ শিক্ষিতা ও প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন।

২৫১। *সিয়ার*, বঙ্গানুবাদ, পৃ-৯০।
২৫২। *সিয়ার* (বঙ্গানুবাদ), পৃ-৯৬।
২৫৩। *বাহরীস্তান-ই-গায়বী* (বাংলা অনুবাদ), পৃ-৫৫৪-৫৫৫।
২৫৪। *সিয়ার* (বঙ্গানুবাদ), পৃ-২৯৫।

স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দেওয়ানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী ছিলেন। নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে পলাশীর ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করায় ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছেন।[২৫৫]

আলিবর্দী খানের কনিষ্ঠা কন্যা ও নবাব সিরাজের আম্মা আমিনা বেগম রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার না করলেও শিষ্ঠাচার ও সুরুচির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয় এবং গরীব দুঃখীর আশ্রয়স্থল।

দোষী ব্যক্তিদের প্রতি কঠোরতাও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগরের দিউয়ান রাজভল্লব এবং নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ইন্ধন যোগাবার অভিযোগে মি. ওয়াটস কে বন্দী করলে আমিনা বেগমের অনুরোধে নবাব তাদের মুক্তি দেন। আমিনা বেগম মি. ওয়াটসের স্ত্রী পুত্রকে নিজের জেনানা মহলে আশ্রয় দেন এবং তাদের সাথে অত্যন্ত উদার ব্যবহার করেন।[২৫৬]

নবাব সিরাজের স্ত্রী লুৎফন্নেসা সামান্য পরিচারিকা থেকে বেগমের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্তশীলা ও স্বামীর অনুগামী ছিলেন। সিরাজের পতনের পর মীর জাফর ও মীরন তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "পূর্বে হাতির পীঠে চড়ে এখন আমি গাঁধার পীঠে চড়তে নিচু হতে পারি না।"[২৫৭] এই রমণী ১৭৯০ খ্রিঃ পর্যন্ত নানা দুঃখ কষ্টের

২৫৫। পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮৮-৪৯১।
২৫৬। M.A. Rahim, Vol-II, P-244.
২৫৭। Karam Ali, *Muzaffarnama*, P-78; M.A. Rahim Vol-II, P-246.

মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য ভাতার উপর নির্ভর করেও ক্বারী ও একটি লঙ্গর খানার ব্যয়ভার বহন করতেন। মীরজাফরের স্ত্রী মুনী বেগমও সামান্য একজন নর্তকী থেকে প্রধান মহিষীর মর্যাদা লাভ করেন। প্রশাসনে তার বিরাট প্রভাব ছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর তার নাবালক দুই পুত্রের অভিভাবক হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। গোলাম হোসেন তবাতবায়ি এর মতে এই রমণী বিবেকহীন হলেও উচ্চাভিলাসী, কর্মক্ষম ও দৃঢ়চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে তার অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল এবং কোম্পানীর কর্মচারীরাও তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। মুনী বেগম প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল নিজের রাজনৈতিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখেন। মারাঠাদের বিরুদ্ধে বীরত্বের জন্য সেনাপতি গাউস খানের বিধবা পত্নী ইতিহাস নন্দিত হয়ে আছেন। তার সাহসিকতা ও সম্ভ্রম বোধে মুগ্ধ হয়ে মারাঠা সেনাপতি বালাজিরাও তাকে উপহার পাঠিয়ে ছিলেন।[২৫৮]

এ সময় হিন্দু সমাজেও প্রতিভাময়ী নারীর জন্ম হয় এবং জমিদারির মত গুরত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়। নাটোরের জমিদার রানী ভবানী তার বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও বদান্যতার দ্বারা সে যুগের সমাজে উচ্চ আসন লাভ করে ছিলেন।[২৫৯] রংপুরের জমিদার জয়দূর্গা চৌধুরানী অত্যাচারী জমিদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তৎকালীন সমাজে পর্দা প্রথার প্রচলন সত্ত্বেও নারীরা সমাজ ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

তবে বাল্য বিবাহ, কৌলিন্য প্রথা ও সতীদাহ প্রথার কারণে হিন্দু সমাজের নারীগণ অনেকটা অসহায় অবস্থায় ছিলেন। পুনর্বিবাহের অনুমতি না থাকায় বিধবা যুবতী মেয়েদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এ তুলনায় মুসলিম নারীদের অবস্থা ভাল ছিল এবং উচ্চ শ্রেণীর নারীরা মত প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকটাই স্বাধীন ছিলেন। আফগানদের বিপর্যয়ের পর মুহম্মদ আমিনের

২৫৮। *সিয়ার* (বঙ্গানুবাদ), পৃ-১৬৮-১৬৯।

২৫৯। K.K. Datto, *Alibardi and his times, p*-245; M.A. Rahim, Vol-II, P-249.

স্ত্রী তাকে নিরাপত্তা দানে স্বামীর অযোগ্যতার প্রশ্ন তুলে স্বামীর সাথে একত্রে বসবাসে অস্বীকৃতি জানান। উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্তা শুজাউদ্দিনের স্ত্রী স্বামীর মাত্রাতিরিক্ত নারী আসক্তিতে বিরক্ত হয়ে পৃথকভাবে মুর্শিদাবাদে বসবাস শুরু করেন।[২৬০] অভিজাত পরিবারের

মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর উপরও প্রভাব খাটাতেন । দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের স্ত্রী দারদানা বেগম তার ভাইয়ের হত্যাকারী আলিবর্দী খানের বিরুদ্ধে স্বামীকে যুদ্ধ ঘোষণায় বাধ্য করেন। স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মেয়েদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হত।

আনন্দ বিনোদন ও সামাজিক উৎসবসমূহ:

সুলতানী আমলের মত মোগল আমলেও ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবে রমজান, ঈদ উল ফিতর, ঈদ উল আযহা, খাৎনা, বিবাহ প্রভৃতি ছিল প্রধান উৎসব। মোগল আমলে এসে নতুন কিছু উৎসব উদযাপন শুরু হয়। শব-ই-বরাত, মুহররম, বেড়া উৎসব (ভেলা ভাসান), ঈদ-ই-মিলাদুন নবী প্রভৃতি উৎসবের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। আর্থিক প্রাচুর্য এবং হিন্দুদের উৎসবের প্রভাবে মুসলিমদের উদসবসমূহও মহা সমারোহে পালিত হতে থাকে। মির্যা নাথান মোগল সৈন্যদের রমজান উৎযাপনের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রত্যেক সৈন্য পর্যায়ক্রমে প্রতি রাতে কোন এক অভিজাত বন্ধুর তাবুতে রাত কাটাত।[২৬১] মির্জা নাথানের বর্ণনা থেকে ঈদ উৎসবের বিবরণও পাওয়া যায়। তিনি উলেৱখ করেছেন-

"দিনের শেষে সন্ধ্যা নাগাদ নতুন চাঁদ দেখা দেয়ার সাথে সাথে রাজকীয় নাকারা বেজে উঠে এবং গোলন্দাজ সেনাদলের সকল আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ক্রমাগত তোপ দাগানো হয়। রাত্রির শেষ ভাগে, কামানের অগ্ন্যুদগীরণ শেষ হয় এবং এরপর শোনা যায় ভারি কামানের আওয়াজ। এটা ছিল দস্তর মতো একটা ভূমিকম্প।"[২৬২] ঈদ মুসলিমদের সবচেয়ে বড় আনন্দের উৎসব। দরিদ্র থেকে অভিজাত সবার গৃহ আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠত। অবস্থাসম্পন্ন ও সাধারণ মুসলিমরা এদিন দান সাদকা করতেন। আজাদ বিলগ্রামীর বর্ণনায় এসেছে, নবাব

২৬০। *সিয়ার* (বঙ্গানুবাদ), পৃ-১।
২৬১। *বাহরীস্তান-ই-গায়বী* (বাংলা অনুবাদ), পৃ-৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

শুজাউদ্দিনের অধীনে ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা ঈদগাহ ময়দানের দিকে শোভা যাত্রা করে যাওয়ার সময় দুর্গ থেকে এক ক্রোশ পথে প্রচুর পরিমানে টাকা পয়সা ছড়িয়ে যেতেন।[২৬৩]

ঈদ উল আজহার দিনে সবাই সুন্দর পোশক পরিধান করে উচ্চস্বরে তকবির বলতে বলতে শোভাযাত্রা সহকারে ঈদগাহে যেত, সেখানে জামাত সহকারে সালাত আদায় ও আলিঙ্গন সম্ভাষণ শেষে গৃহে ফিরে গরু, ছাগল, মহিষ বা উট কোরবানি করত এবং গরিব, দুঃখী, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মাংস বিতরণ করত ও গৃহে ভোজের অনুষ্ঠান করত। ঈদ উল আজহা উদযাপনের বর্ণনা দিয়ে মীর্জা নাথান লিখেছেন যে নামাজান্তে খতিবের খুতবাহ পাঠ শেষ হলে লোকেরা তাকে কাপড় চোপড় ও টাকা পয়সা উপহার দিত, গরিব দুঃখীদের সাহায্যের জন্য তাঁর সম্মুখে টাকা পয়সা ছড়িয়ে দেয়া হত। দুঃস্থ লোকদের অনেকে এর দ্বারা অভাব দূর করে পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণে আকাশ পাতাল মুখরিত হয়ে উঠত। কোরবানি সম্পন্ন হবার পর বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হত। সুন্দর গায়ক, মোহিনী নর্তকী এবং নম্র স্বভাবের গল্প কথকদের মধুর আপ্যায়নের সঙ্গে দিনরাত ভোজানুষ্ঠান চলত। শিল্প কারখানার শ্রমিকদের উপহার সামগ্রী প্রদানে সন্তুষ্ট করা হত।[২৬৪]

২৬২। পূর্বোক্ত, পৃ-৯৮।
২৬৩। *নওবাহার-ই মুর্শিদকুলী খান*; উদ্বৃতঃ M. A. Rahim, Vol-II, P-251.
২৬৪। *বাহরীস্তান-ই-গায়বী* (বাংলা অনুবাদ), পৃ-৬১৯।

ঈদ-ই-মিলাদুননবী উদযাপনেও শান শওকতের পরিচয় পাওয়া যায়। শিয়া মতাবলম্বী নবাব মুর্শিদকুলী খান এদিনটি বিশেষ আড়ম্বরের সাথে পালন করতেন। পহেলা রবিউল আউয়াল থেকে বারো দিন ব্যাপী উৎসব, আলোকসজ্জা, অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন চলতে থাকত।

সেনাপতি নাজির আহমদের অধীনে এক লক্ষ লোক আলোক সজ্জার কাজে নিয়োজিত হতো। কামান গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সড়ক ও নদী তীরের সমস্ত আলোক জ্বলে উঠত এবং সারা শহর ও ভাগীরথী এক আনন্দময় রূপ ধারণা করত।[২৬৫]

সুলতানী আমল থেকেই শব-ই-বরাত পালনের রীতি ছিল। মির্জা নাথানের বর্ণনা থেকে নবাবদের জাঁক জমকের সাথে শব-ই-বরাত উদযাপনের কথা জানা যায়। বাড়ি ঘর আলোকমালায় সজ্জিত করা হতো এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে মসজিদে ও বাড়িতে সারারাত নামাজ আদায় করতেন। মোগল আমলে বাংলায় মুহররম উৎসবের প্রচলন শুরু হয়। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলিতে ইমামবাড়া নির্মিত হয়। মহরমের দশ দিন ব্যাপী নওবত বাজানো, মর্সিয়া বা শোক সঙ্গীত, আতশ বাজি পোড়ান, তাজিয়া মিছিল, তীর, তরবারি ও লাঠি খেলার আয়োজনের মধ্যে দিয়ে কারবালার ঘটনার চিত্রায়ণ ও শোক প্রকাশের ব্যবস্থা করা হত। তবে সুন্নী মুসলিমগণ মহরমকে নিরবেই পালন করতেন। বেড়া উৎসব শরিয়তী কোন বিষয় না হলেও মোগল আমলে বাংলায় এটি জনপ্রিয় একটি উৎসবে পরিগণিত হয়। নদীমাতৃক বাংলায় জাহাজডুবি থেকে রক্ষার নিমিত্তে খিজির (আঃ) এর স্মরণে এই বিদয়াতী অনুষ্ঠান সরকারিভাবে উদযাপিত হত। সুবাদার মুকাররম খান, মুর্শিদকুলী খান ও সিরাজদ্দৌলাহ নিজে ভেলা ভাসিয়ে উৎসব উপভোগ করতেন। কে.পি. সেন এর বর্ণনায় এসেছে, মুর্শিদকুলী খান ৩০০ কিউবিক দৈর্ঘ্যের বিশাল একটি ভেলা তৈরী করে তার উপর কাগজের ঘর ও মসজিদ নির্মাণ করে আলোক মালায় সজ্জিত করেন এবং ভাগীরথী নদীতে

২৬৫। কে.পি. সেন, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ-২০; M. A Rahim, Vol-II, P-252.

ভাসিয়ে দেন।[২৬৬] সিরাজউদ্দৌলা ভাগীরথী নদীতে শত শত ভেলা ভাসাতেন এবং নদী তীরে মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা বিপুল ভাবে জড়ো হত।[২৬৭]

শিশুর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। মির্জা নাথানের শিশু পুত্রের জন্ম উপলক্ষে বাংলায় মোগল সেনাবাহিনী সারাদিন আনন্দে অতিবাহিত করে।[২৬৮] ইটালীয় পর্যটক মানুচীর বিবরণেও শিশুর জন্ম উপলক্ষে উৎসবের কথা জানা যায়। তিনি বলেছেন, জন্ম মুহূর্ত থেকে ছয় সাতদিন ব্যাপী পরিবারের সাধ্যমতো উৎসব অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা হতো। এই অনুষ্ঠানের ভোজ পর্বকে বলা হতো ছটি (ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান)।[২৬৯] এছাড়া সন্তানের আকিকা (ক্ষৌরকর্ম ও নামকরণ) ও বিসমিল্লাহ খানি (শিশুর শিক্ষা সংক্রান্ত), খাৎনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হত। তবে সন্তানের নামকরণে ইসলামিক নামকেই বেছে নেয়া হত।[২৭০] বিবাহ উৎসবও মহা ধুমধামের সাথে অনুষ্ঠিত হত। মুসলিম সমাজেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল। তবে মুসলমানদের মধ্যে বর পক্ষই কনে পক্ষকে পণ (মোহরানা) দিত। মোগল আমলে বিয়ের পূর্বে সাচক (গায়ে হলুদ) অনুষ্ঠান খুব আমোদ প্রমোদের সাথে পালিত হত। বিয়ে উৎসবে অপরিমিত ব্যয় করা হত। নবাব সিরাজদ্দৌলা ও তার ভাই আকরামউদ্দৌলার বিয়েতে আলিবর্দী খান মহাধুমধামের আয়োজন করেন। আকরামদ্দৌলার বিয়েতে সকল শ্রেণীর লোকদেরকে পোষাক দেয়া হয়েছিল। সুগন্ধ দ্রব্য, আলোকসজ্জা ও আতশবাজীর জন্য ব্যয় হয়েছিল বার লক্ষ টাকা । পুরো তিনমাস ধরে দিন রাত এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য, এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য এবং এক কোটি প্রজা আনন্দ

২৬৬। কে.পি. সেন, *বাংলার ইতিহাস* , পৃ-৭০; M. A. Rahim, Vol-II, P-259।

২৬৭। J.Waise, *Notes on the Races and Customs of East Bengal*, London,1883, P-12.

২৬৮। মির্জা নাথান, *বাহরীস্তান-ই-গায়বী* (বাংলা অনুবাদ), পৃ-১৪০।

২৬৯। স্টোরিয়া ডুমগোরা, ৩য় অধ্যায়, পৃ-৩৮; M. A. Rahim, Vol-II, P-260.

২৭০। *John Marshall in India-Observation,* শাফাত আহমেদ খান সম্পাদিত, পৃ-৪০৫; উদ্বৃত: M.A. Rahim, প্রাগুক্ত, Vol-II, P-261.

উৎসব, গান বাজনা ইত্যাদি আমোদ প্রমোদ উপভোগ করে।[২৭১] নবাব সিরাজের দ্বিতীয় বিয়ে তার ভাইয়ের বিয়ে অপেক্ষাও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। বিয়েতে নানা রকম আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিল।

এছাড়া মৃতের জন্য শোক অনুষ্ঠানও ভাবগম্ভীর ও আড়ম্বরতার সাথে পালিত হত। কুরআন তেলাওয়াতকারীদের বস্ত্র উপহার ও খাদ্য দ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করা হত। আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, গরীব দুঃখীদের জন্য ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। মির্জা নাথান তার পিতার মৃত্যুর পর বিশাল ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।[২৭২] এই প্রথা সম্ভবত হিন্দুদের প্রভাবেই প্রচলিত হয়েছিল।

অভিজাত মুসলমানগণ আমোদ প্রমোদের জন্য আরও নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। চৌগান (হকি জাতীয়), চৌপর (পাশাখেলা), তাস, মোরগ লড়াই, পারাবত উড়ান, সাঁতার কাটা, নৌকা বাইচ, প্রভৃতি খেলাধুলা প্রচলিত ছিল।

খাবার দাবারঃ

সুলতানী আমল থেকেই মুসলিমরা মাছ, মাংস, ঘি প্রভৃতি উচ্চ খাদ্যগুণ সম্পন্ন খাবারে অভ্যস্ত ছিল। মুরগী, মেষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, উট প্রভৃতি নানা ধরনের মাংসের উপাচার তারা অত্যন্ত পছন্দ করত। নদীমাতৃক ও কৃষি ভিত্তিক বাংলার মাছ ও শাক-সবজিও মুসলিমদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। তবে মোগল আমলে বাহারি নানারকম খাবারের প্রচলন হয়।

২৭১। M. A. Rahim, Vol-II, P- 290.
২৭২। *বাহরীস্তান-ই-গায়বী* (বাংলা অনুবাদ), পৃ-১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানেও বিরিয়ানি, খিচুড়ী, মোগলাই পরোটা, নানা রকম শরবত মোগলদের খাদ্য রীতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। খিচুড়ী ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের একটা পছন্দের খাবার। বার্নিয়ারের বিবরণ মতে, সম্রাট শাহজাহানের পছন্দের খাবার ছিল খিচুড়ী। আবার ইউসুফ আলীর বিবরণ থেকে জানা যায়, নবাব আলিবর্দী ও তাঁর আমির ওমরাহ প্রায়ই তৃপ্তির সাথে খিচুড়ী খেতেন। অন্যদিকে হিন্দুরা মাছ, শাকসবজি ও মিষ্টান্ন জাতীয় খাবারে অভ্যস্ত ছিল।

মোগল আমলে ব্রিটিশ বণিকদের মাধ্যমে চা ও কফির প্রচলন ঘটে। পর্তুগীজদের মাধ্যমে ধুমপানের রীতি প্রচলিত হয়ে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। হুক্কা রাজ দরবারেও বিশিষ্ট স্থান করে নেয়, তবে পান সুপারি আবহমান বাংলার প্রাচীনরীতি হিসেবে নিম্ন শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত আপ্যায়নের একটি বিশিষ্ট রীতি হিসেবে প্রচলিত ছিল।

স্থাপত্য শিল্পঃ

মোগল বাংলায় সুলতানী স্থাপত্য রীতির পরিবর্তে রাজকীয় মোগলরীতির প্রচলন শুরু হয়। ইমারত নির্মাণের উপাদান, যেমনঃ লাল বেলে পাথর ও মার্বেল বাংলায় পাওয়া যেত না। ফলে মোগল নির্মাতাগণকে ইট ব্যবহার করতে হয়। তবে এ সময় টেরা কোটা অলঙ্করণ রীতির পরিবর্তে চুন বালির প্লাস্টারের কাজের প্রচলন শুরু হয়। মোগল আমলে বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের পরিবর্তে এক বা তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের প্রচলন দেখা যায়। স্কন্ধ ভিত্তিক গম্বুজ, চারকোন বিশিষ্ট সুঁচালু খিলান, জমকালো দরওয়াজা বা তোরণ দ্বার প্রভৃতি মোগল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। সুলতানী আমলের সরাই খানা মোগল যুগে এসে কাটরা নামে পরিচিতি লাভ করে। কাটরা মোগল স্থাপত্য শিল্পের একটি বিশেষ নিদর্শন। কাটরা নির্মাণে ফতেপুর সিক্রির নির্মাণরীতি অনুসরণ করা হত।

Dhaka University Institutional Repository

মোগল বাংলার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যসমূহ[২৭৩]:

১. সলিম নগর (বগুড়া) ।

২. মুরাদ খান কাফসাল মসজিদ (বগুড়া)।

৩. বিবি মসজিদ (১৬২৮) ও খন্দকার তোলা মসজিদ (১৬৩২), বগুড়া।

৪. বিনাত বিবির মসজিদ (ঢাকা)।

৫. লালবাগ মসজিদ (লালবাগ কেল্লার ভেতরে অবস্থিত)। যুবরাজ আজম কর্তৃক নির্মিত কেন্দ্রীয় গম্বুজের উপর গুরুত্ব প্রদান করে নির্মাণ রীতি এ মসজিদ থেকে শুরু হয়।

৬. চক বাজারে চুরিহাট্টা মসজিদ। শাহজাদা শুজার সুবাদারি আমলে এর নির্মিত।

৭. আল্লাকরী মসজিদ। এটি মোহাম্মদপুরে অবস্থিত এবং একগম্বুজ বিশিষ্ট ।

৮. হাজী খাজা শাহবাজ মসজিদ। হাইকোর্ট দালানের সন্নিকটে ত্রিগম্বুজ বিশিষ্ট রীতি অনুসরণ করে নির্মিত। নির্মাণ কাল ১৬৭৯ খ্রিঃ।

৯. সাত গম্বুজ মসজিদ- মোহাম্মদপুর কলোনীর সন্নিকটে শায়েস্তাখান কর্তৃক নির্মিত।

১০. বিবি মরিয়ম মসজিদ (নারায়নগঞ্জ)।

১১. বেগম বাজার মসজিদ/ করতলব খান মসজিদ ঃ ১৭০৫ খ্রিঃ মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক নির্মিত উচ্চ মঞ্চের উপর নির্মিত ত্রিগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পঞ্চ-গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ।

১২. বিবি চম্পা স্মৃতিসৌধঃ ছোট কাটরার আঙিনায় অবস্থিত। অনুমান করা হয় শায়েস্তা খান এটি নির্মাণ করেছেন।

২৭৩। দ্রষ্টব্যঃ A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca, 1961; M. A. Rahim Vol-II, Pp-390-411.

১৩. হযরত চিশতি বিহিস্তির সমাধি স্তম্ভঃ হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে অবস্থিত উঁচু ভিটির উপর দন্ডয়মান এবং খন্ডিত চৌকা (চারকোনা) ছাদ দিয়ে আবৃত।

১৪. দারা বেগম সমাধি স্তম্ভঃ মোহাম্মদপুর কলোনির কাছে একটি পুকুরের পাশে অবস্থিত।

১৫. পরি বিবির সমাধি সৌধঃ লালবাগ কেল্লার ভেতরে অবস্থিত বাংলার মোগল যুগের সমাধি স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নির্দশন। কিংবদন্তী অনুসারে শায়েস্তা খান স্বীয় কন্যা পরিবিবির সমাধির উপর এই স্থাপত্য নির্মাণ করেছিলেন।

১৬. বড় কাটরাঃ চকবাজারের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদীর কাছে অবস্থিত। যুবরাজ শুজার বাস ভবনের নিমিত্তে ১৬৪৪ খ্রিঃ এটি নির্মিত হয়। কারাভাঁ সরাই রীতিতে নির্মিত মোগল স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন।

১৭. ছোট কাটরাঃ বড় কাটরার প্রায় ২০০ গজ পূর্বে বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। নবাব শায়েস্তা খান ১৬১৩ খ্রিঃ বড় কাটরার অনুকরণে ছোট পরিসরে নির্মাণ করেন।

১৮. চেহেল সেতুনঃ মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

১৯. কাটরা মসজিদঃ মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। এটিও নবাব মুর্শিদকুলী খান নির্মাণ করেন। এটি বসবাসের সুবিধাসহ একটি মসজিদ।

২০. মতিঝিল প্রাসাদ ও মসজিদঃ শাহামতজঙ্গ (ঘসেটি বেগমের স্বামী) মতিঝিলে একটি প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ক. ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচয়, বাংলায় আগমন ও ক্ষমতা লাভঃ

১৫৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখে জনৈক টমাস স্মাইথের সভাপতিত্বে আশি জন অংশীদার নিয়ে গঠিত হয় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী। প্রাথমিক পুঁজি ছিল মাত্র ত্রিশ হাজার পাউন্ড। ১৬০০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বৃটেনের রানী এলিজাবেথ এই কোম্পানীকে ভারত ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপুঞ্জে ইংরেজ জাতির পক্ষে একচেটিয়া বাণিজ্য করার জন্য ১৫ বছরের নবায়ন যোগ্য চার্টার বা বাণিজ্য সনদ প্রদান করেন। চার্টারে কোম্পানী নাম দেয়া হয় The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies। চার্টার লাভের সময় সদস্য সংখ্যা ছিল ২১৭ জন এবং গভর্নর ছিলেন টমাস স্মাইথ, কোম্পানীর পুঁজি ছিল ৬৮০০০ পাউন্ড।[১]

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম দূর প্রাচ্যের মসলাসমৃদ্ধ দ্বীপসমূহে ব্যবসা শুরু করে, সেখানে ব্যর্থ হয়ে ভারতের দিকে নজর দেয়। কোম্পানীর প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয় ভারতের পশ্চিম উপকুল বন্দর সুরাটে (১৬১৩ খ্রীঃ)। ১৬৩৩ সালে বাংলার সাথে নামমাত্র বাণিজ্য শুরু হয়। তবে প্রথম দিকে মুনাফা তেমন ছিল না।[২]

সম্রাট শাহজাহান প্রথম ১৬৫১ সালে ইংরেজদেরকে হুগলীতে কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। এবছরই তারা বাংলার নবাব শাহ সুজার কাছ থেকে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার সম্বলিত একটি নিশান লাভ করে।[৩]

১। সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপানিবেশিক শাসন কাঠামো ১৭৫৭-১৮৫৭*, বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা ১৯৮৪, পৃ-৩।

২। Susil chawdhuri, *Trade and commercial organization in Bengal*, 1650-1720 (calcutta, 1975) P-20-28; সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৫।

৩। Susil Chawdhuri, *The Myth of the English East India Company's Privileges in Bengal*, 1651-86; উদ্বৃতঃ সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৮।

হুগলীতে কুঠি স্থাপনের পর থেকেই কোম্পানির বাণিজ্যে সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায় এবং ১৬৫৭ সালে কোট অব ডিরেক্টর্স এর নির্দেশে বাংলায় পৃথক একটি স্বাধীন বাণিজ্য এজেন্সী প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ঠিক একশত বছর পরেই কোম্পানী এদেশে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[৪] পুঁজি বৃদ্ধির সাথে সাথে কোম্পানী বাংলায় বাণিজ্য সম্প্রসারণ অভিযান শুরু করে। ১৬৫৮ সালে বাংলার রেশম কেন্দ্র ও শিল্প নগরী কাশিম বাজারে কুঠি স্থাপন করে। মসলিন সংগ্রহের জন্য ১৬৬৮ সালে ঢাকায়, ১৬৫৯ সালে সোরা (Salf Petre) সংগ্রহের জন্য পাটনায়, ১৬৭৬ সালে মালদহে এবং ১৬৯০ সালে কলকাতায় প্রধান বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে।

সম্রাট ও নবাবদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে নানা ফরমান ও নিশান লাভ এবং সরকারি আমলা ও অভিজাতবর্গকে ঘুষ ও কুটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে কোম্পানী শুল্ক মুক্ত ব্যবসার প্রসার ঘটায়। কোম্পানীর নামে বরাদ্দকৃত নিশান ব্যবহার করে অনেক সময় কোম্পানীর কর্মচারীরাও ব্যক্তিগতভাবে শুল্কমুক্ত ব্যবসায় পরিচালনা করত।[৫] ফলে মোগল সরকার যেমন কোম্পানীর উপর রুষ্ট হয় তেমনি বাংলার অন্যান্য বণিক শ্রেণীও কোম্পানীর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। অন্যদিকে কোম্পানী সরকারী আমলাদের বিরধদ্ধে নানা হয়রানির অভিযোগ উত্থাপন করে। ফলে সরকারের সাথে কোম্পানীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

৪। সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ-৫।

৫। Brijen k. Gupta, *Sirajuddullah and the East India company* , 1756-1757: Background to the foundation of British Power in India (Leiden, 1966) P-12; সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৮।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ওলন্দাজদের সাথে বিরোধের কারণে কোম্পানীকে দূরপ্রাচ্যের ব্যবসা গুটাতে হয় এবং ভারতেও এ পরিণতির ভয় থেকে সামরিক শক্তি অর্জনের প্রয়োজন বোধ করে। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে এবং একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী ভারতে প্রেরণ করে। ফলে কোম্পানী যুদ্ধংদেহী মনোভাব ধারণ করে। ১৬৮৬ সালে হুগলীতে আক্রমণের মাধ্যমে কোম্পানী মোগল সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।[৬]

চার বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করে অবশেষে কোম্পানী সম্রাটের কাছে মাথা নত করে। ১৬৯০ সালে কোম্পানী সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড জরিমানা দেয়ার শর্তে কোম্পানী পুনরায় বাণিজ্য করার অনুমতি পায়। ১৬৯৫ সালে শোভা সিং ও রহিম খানের বিদ্রোহের ফলে বাংলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে সুবাদার ইব্রাহিম খান বিদেশী কোম্পানীগুলোকে তাদের প্রধান প্রধান কুঠিতে দুর্গ স্থাপন করে নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করার অনুমতি দেন। এ সুযোগে কোম্পানী ১৬৯৬ সালে সুতানুটি কুঠিতে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠা করে। এ দুর্গ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে কোম্পানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ১৬৯৮ সালে সুবাদার যুবরাজ অজিম উশ শান ১৬০০০ টাকা নজরানা পেয়ে বার্ষিক ১১৯৪ টাকা ১৪ আনা ৪ পয়সা রাজস্ব দানের শর্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা এ তিনটি গ্রামের জমিদারি সনদ প্রদান করেন।[৭]

৬। C.R Wilson, *Annals of the Early English in Bengal*, vol-1, Book III (London, 1893-1917); উদ্বৃত, সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ-১০।

৭। W.K. Firiminger, Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report Indian Studies Series, 1962, P-11; দ্রষ্টব্যঃ সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-১০।

এ জমিদারি লাভের মধ্যদিয়ে কোম্পানী এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে এবং শাসক শ্রেণীর একটি অংশে পরিণত হয়। কোম্পানী বাণিজ্যের পাশাপাশি ভূমির দিকে নজর দিয়েছিল, কারণ বাংলায় ভূমি রাজস্ব ছিল একটি উজ্জ্বল ক্ষেত্র। সিরাজুল ইসলামের মতে,

"বলাবাহুল্য যে, তিনটি গ্রাম নিয়ে এ ক্ষুদ্র জমিদারী ধীরে ধীরে সম্প্রাসারিত হয়ে কালে সমগ্র দেশই কোম্পানীর জমিদারীতে পরিণত হয়। পলাশীযুদ্ধের পর ১৭৬৫ সনে কোম্পানী কর্তৃক বাংলা বিহার উড়িষ্যার দিওয়ানী লাভ, বস্তুতঃ ১৬৯৮ সনের জমিদারী স্বত্বেরই পুর্ণ বিকাশ মাত্র।"[৮]

তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা শহর দ্রুতই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং কোম্পানীর প্রভাব প্রতিপত্তিও অপরিসীম মাত্রায় বর্ধিত হয়। ফলে অচিরেই বাংলার নবাব ও জমিদারদের সাথে কোম্পানীর বৈরী সম্পর্ক তৈরী হয়। কোম্পানী কলকাতা শহরের পরিসর বাড়ানোর চেষ্টা করে। তবে দীউয়ান মুর্শিদুকলী খান ও স্থানীয় জমিদারদের বিরোধিতার দরুন তা পারে নি।[৯] ১৭১৫ সালে কোম্পানী জন স্যারমেনের নেতৃত্বে দিল্লীতে ডেলিগেশন প্রেরণ করে সম্রাট ফররুখ শিয়ারকে ত্রিশ হাজার টাকা নজরানা প্রদান করে নানা সুযোগ সুবিধা হাছিলের আবেদন করে। ১৭১৭ সালে সম্রাট এক ফরমান জারি করেন। ফরমানে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ছিল-

এক. বাৎসরিক তিন হাজার টাকা পেশকাশ (পুরস্কার) দানের শর্তে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার।

৮। পূর্বোক্ত, পৃ-১১।
৯। পূর্বোক্ত, পৃ-১১।

দুই. তিনটি গ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী আরও আটত্রিশটি গ্রামের উপর জমিদারী স্বত্ব কেনার অনুমতি।

তিন. কোম্পানির মালামাল চুরি হলে তা ফেরত পাওয়ার অধিকার এবং চোরকে শাস্তি দেয়ার বিধান।

চার. মাদ্রাজের টাকা বিনা বাটায় বাংলায় প্রচলন।

পাঁচ. মূল সনদ স্থানীয় কর্মচারীদের না দেখানোর অধিকার ।

ছয়. কোম্পানীর পলাতক খাতককে কোম্পানীর নিকট প্রত্যার্পণের অধিকার ।

সাত. মুর্শিদাবাদ টাকশালে কোম্পানীর মুদ্রা তৈরীর অধিকার।[১০]

কিন্তু এই ফরমান কার্যকর করতে যেয়ে কোম্পানী বাংলার নবাবদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। নবাব মুর্শিদকুলী খান এই ফরমান বাস্তবায়নে সরাসরি অস্বীকৃতি জানান। কোম্পানী নবাবের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গকে কেন্দ্র করে নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়াতে থাকে। ফরমান মোতাবেক আটত্রিশটি গ্রামের উপর জমিদারী স্বত্ব লাভে ব্যর্থ হয়ে কোম্পানী নামে বেনামে কলকাতার আশে পাশে জমি কিনে শহরের পরিধি বাড়াতে থাকে।[১১] অবৈধ জমিদারী থেকে কোম্পানীর আয় অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৭১৭ সালে কলকাতা জমিদারীর আয় ছিল ১১০৭১ টাকা। ১৭৫৪ সালে এ আয় বেড়ে ১০৭১৩১ টাকায় উন্নীত হয়।[১২]

১০। S. Bhattacharya, *The East India Company and The Economy of Bengal*, 1954; সিরাজুল ইসলাম, পৃ. ১২।

১১। Brijen K. Gupta, *Sirajuddaullah and The East India Company* (1966) p. 9; সিরাজুল ইসলাম, পৃ- ১৩।

১২। J. Z. Holwell, *India Tracts* (1774) p. 210; সিরাজুল ইসলাম, পৃ. ১৩।

কিন্তু কোম্পানীর আয় বাড়লেও প্রদত্ত রাজস্বের পরিমাণ বাড়ায় নি, ১১৯৫ টাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। সরকার বাড়তি আয়ের জন্য বাড়তি রাজস্ব দাবী করলে কোম্পানী তা দিতে অস্বীকার করে। ফলে কোম্পানী ও সরকারের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অন্য দিকে কোম্পানীর নামে বরাদ্দকৃত দস্তক কোম্পানীর কর্মকর্তা - কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় অবৈধভাবে ব্যবহার করত। ফলে সরকার বড় অংকের শুল্ক আয় থেকে বঞ্চিত হত। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজদ্দৌলাহ দাবী করেন, দস্তক অপব্যবহার করে কোম্পানী বিগত চল্লিশ বছরে সরকারকে যে শুল্ক ফাঁকি দেয় তার মোট পরিমাণ ১৮৭৫০০০ পাউন্ড।[১৩]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম দিকে নিছক ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসলেও ব্যবসায় অভাবনীয় সাফল্য ক্রমেই তাদের উচ্চাভিলাষী করে তোলে। Susil Chowdhuri কোম্পানীর সুবিধা ও মুনাফার হিসেব দিতে গিয়ে বলেছেন, ১৬৫২ সালে কোম্পানী বাংলা বাণিজ্যে যে পুঁজি বিনিয়োগ করে তার পরিমাণ ছিল মাত্র সাত হাজার পাউন্ড। ধীরে ধীরে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং ১৬৮০ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় এক লক্ষ থেকে এক লক্ষ পনের হাজার পাউন্ডে। অষ্টাদশ শতকে কোম্পানীর বিনিয়োগ বহুগুণে বেড়ে যায়। ১৭৫৭ সালের পূর্বে পঞ্চাশ বছরে কোম্পানীর বার্ষিক গড় বিনিয়োগ ছিল এক লক্ষ আশি হাজার পাউন্ড।[১৪] কোম্পানীর এই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ বিশাল অংকের মুনাফা লাভের কারণেই সম্ভব হয়েছিল।[১৫]

১৩। Brijen K. Gupta, P. 14; সিরাজুল ইসলাম, পৃ. ১৩-১৪ ।

১৪। Susil Chowdhuri, *Trade and Commercial Organization in Benga*l 1650–1720 (Calcutta 1975), P – 52 ; সিরাজুল ইসলাম, পৃ-১৪।

১৫। House of Commonce Sessional Papers, 1812-13, Vol. VIII, No. 152; উদ্ধৃতঃ সিরাজুল ইসলাম, পৃ-৬।

একদিকে কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থ, অন্যদিকে জমিদারি লাভের মাধ্যমে বাংলার ভূমিও কোম্পানীর কাছে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে ধরা দেয়। ভূমি ও বাণিজ্যে মজবুত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোম্পানী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। তবে রাজনৈতিক সমর্থন বা রাষ্ট্রের অনুমোদন ছাড়া তাদের কোন অবস্থানই বৈধতা পাবে না বা স্থায়িত্ব লাভ করবে না; এ অনুভূতি থেকে তারা ভারত ও বাংলার রাজনীতিতে দ্রুত জড়িয়ে পড়ে। স্বাধীন নবাবদের আমলে কোম্পানীর সাথে বাংলার সম্পর্ক বরাবরই বৈরী ছিল। কোম্পানীর অন্যায়ভাবে আধিপত্য বিস্তার নীতিকে নবাবগণ মেনে নেননি। এমনকি সম্রাটের অনুমোদিত ফরমানও কোম্পানী নবাবদের বিরোধীতার কারণে কার্যকর করতে পারত না। নবাব মুর্শিদকুলী খানের বিরোধীতার কারণে কোম্পানী ফররুখশিয়ারের ফরমান কার্যকর করতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের পেক্ষাপটে কোম্পানী বাংলায় তাদের সমর শক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিলে নবাব আলিবর্দী ঘোরতর আপত্তি তোলেন। কোম্পানী নবাবের এ নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে তার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়।[১৬]

পরবর্তিতে কোম্পানীর নানা রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের কারণে তরুণ নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাথে কোম্পানীর দ্রুতই বিরোধ বাঁধে। এ প্রেক্ষাপটে কোম্পানী নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ নির্বিঘ্ন করতে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ও তাদের স্বার্থ বান্ধব নবাবের প্রয়োজন অনুভব করে। এ উদ্দেশ্যে তারা নানা অপকৌশলে জড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন পরিস্থিতিও কোম্পানীর স্বার্থ সিদ্ধির অনুকূল হয়ে দেখা দেয়।

১৬। Bengal Correspondence, Court of Directors to Fort William Council, 17 June, 1948; উদ্ধৃত: সিরাজুল ইসলাম, পৃ. ১৭৬।

নবাব মুর্শিদকুলী খান ও নবাব আলিবর্দী খানের মত শক্তিশালী নবাবদের মৃত্যুর পর কম বয়স্ক ও অদূরদর্শী নবাবদের হাতে নবাবীর ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। স্বাধীন নবাবী আমলে যে হিন্দু অমাত্য ও অভিজাত শ্রেণী তৈরী হয় তা এতদিনে শক্তি অর্জন করে নবাবদের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে যায়। ভোগ বিলাসী নবাবগণ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দেন নি এবং এর জন্য অত্যাবশ্যকীয় সমর শক্তি সংরক্ষণেও নজর দেন নি। এছাড়া এ সময়ে যোগ্যতা, দক্ষতা, বিশ্বাসপরায়ণতা তথা নৈতিক চরিত্রের যে সংকট দেখা দিয়েছিল তা রাষ্ট্রের ভিত্তিকেই দুর্বল করে ফেলে। উপরন্তু বিদেশী বণিকদের উত্থান ও দেশীয় বণিকদের পতনে বাণিজ্য নির্ভর বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদন্ডই দুর্বল হয়ে যায়। বহির্দেশে সম্পদের পাচার সমৃদ্ধশালী বাংলাকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে ফেলে। এর সাথে নবাব পরিবারের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। নবাব সিরাজের বিরোধী মহলকে নিয়ে কোম্পানী-প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে এবং ১৭৫৭ সালের ২৩ই জুন পলাশীর প্রান্তরে সাজানো নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে স্বাধীন নবাবী আমলের পতন ঘটায়। দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী মুসলিম শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এর পেছনে ইংরেজ শক্তির ভূমিকা যেমন ছিল তেমনি মুসলিম শাসক ও আমলা শ্রেণীর ব্যর্থতার দায়ভারও কম ছিল না। তাদের অযোগ্যতাই সুযোগ সন্ধানী ইংরেজদের পথকে সহজ করে দিয়েছিল। মুসলিম শাসনের পতনের কারণ হিসেবে ঐতিহাসিক বিশ্লেষকগণ অনেক দিককে চিহ্নিত করেছেন। তবে মূল কারণ ছিল- রাষ্ট্রের সংহতি ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অভাব । নবাবগণ আমলাদের হাতে শাসনকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন কিন্তু নজরদারীর ব্যবস্থা করেননি। এই আমলা শ্রেণীর চারিত্রিক অধঃপতন রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করে তোলে । সামান্য ঘুষ পেয়েই তারা বিদেশী কোম্পানীর অন্যায় স্বার্থ চরিতার্থ করত। রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে মজবুত কোন নীতি

Dhaka University Institutional Repository

নবাবগণ গ্রহণ করেননি। মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে যেমন ইসলামকে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সংহতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং একে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে ওঠেছিল। কিন্তু নবাববী আমলে এসে রাষ্ট্র স্থানীয়দের নিয়ে একটা জাতীয় রাষ্ট্রে রূপ পেলেও তার নির্দিষ্ট কোন আদর্শ বা নীতি গড়ে ওঠেনি। ধর্মনিষ্ঠার ঘাটতি দেখা দিলে ইরানি, তুরানি, আফগান, আবিসিনিয়গণ, শিয়া, সুন্নী প্রভৃতি নানা দল উপদল মুসলিমদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এছাড়া মসনদের উত্তরাধিকার নিয়েও ব্যক্তি কেন্দ্রিক নানা গ্রুপ তৈরী হয়। বিদেশী বণিক কোম্পানিগুলো এ সময় লবিং গ্রুপিং এ যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর ক্ষমতার পট পরিবর্তনে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে হিন্দু অভিজাত শ্রেণী, যারা নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফুলে ফেঁপে উঠেছিল এবং নিজেদের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছিল। Brijen K. Gupta ও M. M. Ali মনে করেন এ সময় হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় এবং হিন্দু পুঁজিপতি শ্রেণী মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়।[১৭] এ ছাড়া অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির অবনতিও ইংরেজদের উদ্ধত করে তোলে। আর এই অবনতির প্রধান কারণ ছিল পর্তুগীজ হার্মাদ জলদস্যুদের উৎপাত, উপর্যুপরি মারাঠা আক্রমণ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইউরোপে অর্থ পাচার। যাই হোক, কোম্পানী এই সব সার্বিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষী হিন্দু অভিজাত গোষ্ঠীর মদদে এবং মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর নবাব বিরোধী মহলকে সাথে নিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্যকে অস্তমিত করে। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত এদেশীয়রা শাসন ক্ষমতায় থাকলেও মূল কলকাঠি নেড়েছেন ইংরেজরা। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনীতি, শাসন ক্ষমতা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা ছিল না।

১৭। Brijen K. Gupta, Ibid, P-29-30, M.M. Ali, *The Fall of Sirajuddaulah* (1975), P-9.

কিন্তু স্বার্থ বান্ধব নবাবগণও যখন তাদের স্বার্থ পূরণে ব্যর্থ হল তখন তারা নিজেরাই ক্ষমতার দৃশ্যপটে হাজির হল। ১৭৬৫ সালে সম্রাট শাহ্ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দিউয়ানী লাভের মাধ্যমে কোম্পানী আইনী বৈধতা পায়। পলাশী ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী হিন্দু মুসলিম বিশ্বাসঘাতক অভিজাতবর্গ যেমন দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়নি, তেমনি সম্রাটও কোম্পানীর স্বরূপ বুঝতে ব্যর্থ হলেন। সম্রাটের দৃষ্টিতে দীউয়ানী রাজস্ব আদায়ের ক্ষুদ্র একটি দায়িত্ব হলেও কোম্পানীর কাছে তা ছিল ক্ষমতার মূল কেন্দ্র বিন্দু। এ কারণে দীউয়ানী লাভে উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্লাইভ কোর্ট অব ডাইরেক্টার্সকে জানান যে-

“কোম্পানী ও নবাবের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের চির অবসান ঘটলো। নবাব এখন বস্তুত কোম্পানীর পেনশনার মাত্র, বাদশাও তাই। সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে... দীউয়ানীর ফলে কোম্পানীর যে আয় হবে তা দিয়ে কোম্পানীর সমস্ত খরচ কুলিয়ে ব্যবসার সমস্ত পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব।”[১৮]

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর এদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না। আর্থিক সুবিধাভোগী হিসেবে তারা দিউয়ানী প্রার্থনা করেছে। কিন্তু ১৭৫৭-৬৫ পর্যন্ত তাদের স্বার্থ বান্ধব নবাবগণও তাদের চাহিদা মেটাতে পারেনি। উপরন্তু কোম্পানী নবাব মীর কাসিমের স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি দমন করতে যেয়ে স্বাধীন বাংলার সার্বভৌমত্বকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেয় এবং মোগল শাসনের ভিতকেও নড়বড়ে করে দেয়। অর্থনীতি দেশের মূল চালিকাশক্তি হওয়ায় দিউয়ানীর সাথে সাথে নিজামত শাসনও কোম্পানীর ঘাড়ে এসে পড়ে। কোম্পানীর ডেপুটি দিউয়ান রেজা খানের উপর নাবালক নবাবের অভিভাবক হিসেবে নিজামত শাসনের ভারও অর্পিত হয়। ফলশ্রুতিতে সকল ক্ষমতা কোম্পানীর হাতেই এসে পড়ে।

১৮। W.K. Firminger, Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report (Indian Studies edition, 1962), pp 162-63; সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ - ৫৮।

তবে নিজামত শাসনকে কোম্পানী উটকো ঝামেলা হিসেবেই দেখে এবং রাজস্বের দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। ফলে শাসনভার হাতে নিয়েও তারা মুনাফালোভী ব্যবসায়ীই থেকে যান, শাসক হয়ে উঠতে পারেননি। তবে বাংলার ঐতিহ্যবাহী মুসলিম শাসকগণ স্বৈরাচারী ও বিলাসী হওয়া সত্ত্বেও জনকল্যাণকামী ছিলেন। রেজা খানের মতে, মোগল শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল-

ক. দেশের রীতিনীতি, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান মাফিক রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

খ. আইনের চোখে সাধারণ ও সরকারী কর্মচারীদের এক রাখা।

গ. ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষির উন্নতিতে সাহায্য করা ।

ঘ. সমস্ত অভিযোগ কালক্ষেপণ না করে শ্রবণ করা ও সমাধা করার চেষ্টা করা।

ঙ. রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহের ব্যাপারে স্থানীয় প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখা।[১৯]

রেজা খান আরও মন্তব্য করেছেন, “রায়ত বা কৃষকরা তখন ধনী ছিল না বটে, তবে তারা সন্তুষ্ট ছিল। জমিদার ও তালুকদারেরা ছিলেন জনগণের মা-বাপ বন্ধুতুল্য। তাঁরা (জমিদারেরা) শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ মোতায়েন রাখতেন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ দায়ী ছিল। সব জমিতে তখন চাষাবাদ হতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে কৃষি, শিল্পের উন্নতির জন্য জমিদার শ্রেণী ছিলেন সচেষ্ট। জমির উৎপাদন শক্তির উপর নির্ভর করত খাজনার হার। জমি আবাদে নবাগতদের দেয়া হতো প্রারম্ভিক পুঁজি ও অন্যান্য সামগ্রী।”[২০] এছাড়া রেজাখান সমসাময়িক কালে কারিগর ও ব্যবসায়ীদের সুযোগ - সুবিধা লাভ ও অবাধ স্বাধীনতা ভোগের কথাও উল্লেখ করেছেন।

১৯। Philip Francis Papers, I.O. R., Eur.E. 28, Pp – 345-56; উদ্বৃত: সিরাজুল ইসলাম,পূর্বোক্ত.পৃ-৬১।
২০। পূর্বোক্ত, পৃ-৬১।

রেজাখান মোগল শাসনের এই বৈশিষ্ট্যকে মেনে চলার চেষ্টা করলেও তার হাত পা বাঁধা ছিল, তিনি ছিলেন কোম্পানীর একজন কর্মচারী মাত্র। ফলে কোম্পানীর দায়িত্বহীন মুনাফালোভী শাসনে বাংলা দ্রুত অবনতির দিকে ধাবিত হয়। কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের শাসন-শোষণ, অবৈধ ব্যবসা বাংলার অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয় এবং এর সাথে যোগ হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যার ফলশ্রুতিতে বাংলা ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। উপরন্তু মন্দাকালীন সময়ে রাজস্ব আদায়ে কোম্পানীর নির্মম পদক্ষেপ তাদের কসাই হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালের এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুমান অনুযায়ী এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক না খেয়ে মারা যায়। কিন্তু ননী গোপাল চৌধুরীর অনুমান অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক।[২১] অথচ এ পরিস্থিতিতেও কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণে কোন ঘাটতি দেখা যায় না। N. K. Sinha এ সংক্রান্ত একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন[২২]-

সাল	**রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ**
১৭৬৮-৬৯	১৫,৮৭৩,৪৫৩/- টাকা
১৭৬৯-৭০	১৪,৩৪১,১৬৮/- টাকা
১৭৭০-৭১	১৪,০০৬,০৩০/- টাকা
১৭৭১-৭২	১৫,০২৩,২৬০/- টাকা

২১। Nani Gopal Chaudhuri, *Cartier : Governor of Bengal*, 1769-1772, (1970), p. 67; সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৭০।

২২। N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol. II, (1968), P. 55; সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত.পৃ- ৬১ ।

এক দিকে নির্মমভাবে রায়তের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় অন্যদিকে মঙ্গাকালীন সময়ে চালের মজুতদারী অবস্থাকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। ঐ সময়ে চালের মূল্য তালিকার দ্রুত অবনতিই মজুতদারীর প্রমাণ দেয়। এ সংক্রান্ত একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল–

সাল	চালের বাজার দর
১৭৬৯ সালের প্রথম দিকে	টাকায় চার থেকে পাঁচ মন
১৭৬৯ সালের শেষের দিকে	টাকায় আট থেকে বার সের
১৭৭০ সালের জুন মাসে	টাকায় ছয় থেকে সাত সের
১৭৭০ সালের জুলাই মাসে	বাজার থেকে চাল সম্পূর্ণ উধাও হয়ে যায়। কালো বাজারে টাকায় তিন সের দরে চাল পাওয়া গেলে ও তা ছিল শুধু প্রভাবশালীদের জন্য।[২৩]

চালের মূল্য বৃদ্ধিতে সরকার, ব্যবসায়ী, ফটকাবাজ, মজুতদার, সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ সবাই চাল মজুত করতে প্রতিযোগিতায় নেমে যায়। এর ফলেই বাজার চাল শূন্য হয়ে যায়। এ অবস্থায়ও রায়তকে বন্দোবস্ত মাফিক রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করা হয়। অনেক রায়ত লাঙ্গল, গরু, পুত্র, কন্যা বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করেন। যার এ অবস্থাও ছিল না সে রাজস্বের ভয়ে গৃহ ত্যাগ করে চলে যায়। এ অবস্থায় কোম্পানী 'নাযাই পলাতকা' প্রথা অর্থাৎ পলাতক রায়তের অপলাতক প্রতিবেশীর কাছ থেকে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করে।

২৩। 'Abdul Majed Khan, *Transition* , P– 217, N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol. 11, (1968) p – 49.

এ অবস্থায় গণহারে মৃত্যু শুরু হলে কোম্পানী মাত্র পৌনে দুই লক্ষ টাকা রিলিফের জন্য অনুমোদন করে যার সিংহ ভাগ এ দেশীয় ধনাঢ্য পরিবার থেকে আদায় করা হয়।[২৪]

দুর্ভিক্ষের কারণে এক দিকে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য ধরাশায়ী হয়ে অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, অন্য দিকে দুর্ভিক্ষের কারণে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বেড়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং সামাজিক অনুশাসন ভেঙ্গে যায়। এ অবস্থার জন্য কোম্পানী যৌথ শাসনকে দায়ী করে এবং ১৭৭২ সালে দীউয়ানী শাসন সরাসরি নিজের হাতে তুলে নেয়। ধীরে ধীরে ভূমি প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, কৃষি-শিল্প সব কিছুই কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর মোগল শাসন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে সারা ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন চালু হয়। দীর্ঘ প্রায় ২০০ বছর ব্যাপী বৃটিশ শাসন জারি থাকে। ১৯৪৭ সালে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে।

খ. বৃটিশ শাসনের প্রথমার্ধে মুসলিম বিরোধী নীতি ও বাঙালী মুসলিমদের পতন:

প্রায় ৮০০ বছর ব্যাপী শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণকে মুসলিম জাতি মেনে নিতে পারেনি। শাসকের অবস্থান থেকে শাসিতের অবস্থানে নিজেদের মানিয়ে নিতে মুসলমানদের দীর্ঘ ১০০ বছর সময় লেগেছে। এই ১০০ বছরে নিজেদের অবস্থানকে ফিরে পেতে তারা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে নিজেদের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে। ফলে তাদের অবস্থার চরম অবনতি ঘটে এবং সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের উচ্চ স্তর থেকে নেমে সর্বনিম্ন স্তরে যেয়ে পৌছেছে। অন্যদিকে হিন্দু জাতির কাছে ইংরেজ শাসন প্রভু পরিবর্তন মাত্র।

২৪। Bengal Public Consultations, 13 February, 1770; Majed Khan, *Transition* , P – 216 .

ইংরেজদের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে হিন্দুরা দ্রুতই নিজেদের উন্নতির পথকে সুগম করে নেয়। মুসলিমরা যেমন ইংরেজ শাসনকে মেনে নিতে পারে নি, ইংরেজরাও তেমনি মুসলিমদের পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই দেখেছে এবং ক্ষমতার সর্বস্তর থেকে সচেতনভাবে তাদের দূরে সরিয়ে রাখে। কোম্পানী সরকার এমন সব নীতিমালা গ্রহণ করে যা এই জাতিটির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়, ধ্বংস করে তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে। সমৃদ্ধশালী বাংলা বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় উপনীত হয়।

প্রাক বৃটিশ বাংলার সমাজের সমৃদ্ধি ও উন্নতির মূলে ছিল শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা, আমীর ওমরাহ- অভিজাতবর্গের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ; সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, আলিম-ওলামা ও সুফী-সাধকের নিরলস নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা। বাংলার মুসলিমদের জন্য কোম্পানী শাসনের প্রথম আঘাত ছিল সমাজের নেতৃত্ব দানকারী এই শ্রেণীটির পতন। পলাশীর ঘটনার পরে নবাব ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। G.B. Mallson এর ভাষায়, নবাবের অবস্থা ছিল-“was allowed to govern never to rule”[২৫]।

১৭৬৫ সালে দীউয়ানী হস্তান্তরের পর নবাব সম্মানিত পদবী ধারী ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাঁর নিজের কোন স্বাধীনতা বা ক্ষমতা ছিল না। অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তার মত ৫৩,৮৬,০০০ টাকার পেনশন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হত। ১৭৭০ সালে নবাবের ভাতা কমিয়ে ৩২ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয় এবং ১৭৭২ সালে এই ভাতা ১৬ লাখে নেমে আসে।[২৬]

২৫। Mallson, G.B. *The Decisive Battles of India*, P- 70; A. R. Mallick, *British Policy and The Muslims in Bengal*, 1757 – 1856, Bangla Academy, Dacca, 1977, P-35.

২৬। Sinha, S. C., *Economic Annals of Bengal*, P-97; A.R. Mallick, পূর্বোক্ত, P- 35।

১৭৯০-৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে শাসনতন্ত্র রচনা করেন সেখানে নবাবকে তার নিজামত সংক্রান্ত ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এভাবে বাংলার নবাবীর পতন ঘটে। যে সামান্য পরিমাণ ভাতা তাদের দেয়া হত তাতে আত্মীয়, স্বজন, আশ্রিত ও সাধারণ মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া দূরের কথা, নিজেদের জীবন যাপনই কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়েছিল। উপাধিধারী শেষ নবাব ফরীদুনজাকে ১৮৮০ সালে ঋণ পরিশোধের বিনিময়ে 'নবাব নাযিম' উপাধি ও শাসন ক্ষতার দাবি ছেড়ে দিয়ে সরকারের সাথে চুক্তি করতে হয়। তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকাভুক্ত হয়ে সরকারের প্রদত্ত ভাতা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। এভাবে বাংলার মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতার মূল উৎস, যা তাদের জীবন যাত্রার সার্বিক স্তরে বাড়তি জৌলুসের যোগান দিত তা শূন্য হয়ে যায়। কোম্পানী সরকার এই শূন্যতাকে পূরণ করে নি। নবাব পরিবারের কিছু সদস্যকে ভাতা প্রদান ছাড়া সাধারণ জনগণকে এক রকম অভিভাবকহীন অবস্থায়ই ছেড়ে দেয়া হয়। জনগণের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেও কোম্পানী সরকার জনগণের প্রতি যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে জনগণের দুর্ভোগের প্রতি সরকার ন্যাক্কার জনকভাবে যে নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করেছে তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণ সম্পর্কে তারা কতটা উদাসীন ছিলেন। এ কারণে দীর্ঘ ২০০ বছর শাসন করেও ইংরেজগণ এদেশবাসীর কাছে বিদেশী ও বিজাতিই রয়ে গেছেন। ঢাকার নায়েব নাযিম পরিবারও মুর্শিদাবাদের নবাবদের মতই পরিণতি বরণ করে । নবাবদের পতনের সাথে সাথে তাদের অনুগত অনুগ্রহ ভাজন আশ্রিত বিশাল একটি শ্রেণীরও পতন হয়।

প্রাক বৃটিশ যুগে প্রশাসনিক পদসমূহে উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত মুসলিমদের এক চেটিয়া প্রাধান্য ছিল। মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে রাজস্ব বিভাগসহ কিছু পদে হিন্দুদের নিয়োগ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেলেও সার্বিকভাবে প্রশাসনে মুসলিমরাই প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। কিন্তু নতুন

সরকার পুরানো কর্মচারীদের সরিয়ে তাদের অনুগত লোকজনকে বসায়। যেহেতু ইংল্যান্ড থেকে এত লোকবল সরবরাহ সম্ভব ছিল না, তাই মুসলিমদের বিপরীতে হিন্দুদেরকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। ১৭৭২ সালে নায়েব দীউয়ানের পদ তুলে দেয়া হয় এবং রেজাখানকে বরখাস্ত করা হয়। রাজস্ব প্রশাসনের সমস্ত কার্যালয় মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। দীউয়ানী ও নিযামত আদালত কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। প্রত্যেক জেলায় একজন করে ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত করা হয়।

সামরিক বিভাগ শুধু মুসলিমদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। স্বাধীন নবাবদের আমলে অল্প কিছু হিন্দু নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। নবাবের পতনের পর তার সেনাবাহিনীকেও ভেঙ্গে দেয়া হয়। কোম্পানী সরকারের সামরিক বাহিনীতে উচ্চ পদে মুসলিমদের নিয়োগ নিষিদ্ধ ছিল।[২৭] ফলে নবাবের বিশাল সৈন্য বাহিনী ও তার পরিবারবর্গের ভদ্রভাবে জীবন যাপনের কোন পথ খোলা ছিল না।

সুলতানী ও মোগল আমলে বিচার ব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক হওয়ায় (হিন্দুদের ধর্মীয় বিষয় বাদে) বিচার বিভাগের সকল পদ শুধু মুসলিমদের জন্যই নির্ধারিত ছিল। ইংরেজগণ প্রথম দিকে জনরোষের ভয়ে আর লোকবলের অভাবে বিচার বিভাগে তেমন রদবদল করে নি। কিন্তু দিউয়ানী ও ফৌজদারী আদালত কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ায় এবং সর্বোপরি ১৮৩৭ সালে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজী সরকারী ভাষা হিসেবে চালু হওয়ায় বিচার বিভাগ থেকেও মুসলিমরা বিতাড়িত হয়। ১৮৫২-৬৮ সালের মধ্যে ২৪০ জন ভারতীয়কে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়, এদের মধ্যে হিন্দু ২৩৯ জন এবং মুসলিম মাত্র ১ জন।[২৮]

২৭। W.W. Hunter, *The Indian Musalmans*, Barnalipi Mudrayan, Dacca, P-142.
২৮। ড. এম এ রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* , ১৭৫৭-১৯৪৭, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ-২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু প্রশাসন নয় ভূমি থেকেও মুসলিমরা বিতাড়িত হয়। অবশ্য মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকেই মুসলিম জমিদারদের সংখ্যা কমতে থাকে এবং নতুন নতুন হিন্দু জমিদারির উত্থান ঘটে। মুসলিম জমিদারির অবনতির পেছনে জমিদারদের বিলাসিতা, ঠিকমত রাজস্ব প্রদান না করা এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে জমিদারি নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। কোম্পানী আমলে কঠোর রাজস্ব নীতির কারণে উদীয়মান হিন্দু বেনিয়া, মুৎসুদ্দি, উজির ও দীউয়ানদের কারসাজিতে অনেক জমিদারি নিলাম হয়ে যায়। কোম্পানী নতুন করে মুসলিমদের সাথে কোন জমি ইজারা চুক্তি করেনি। ফলে ভূমির সাথে জড়িত বিশাল একটি অংশের পতন ঘটে। পূর্ব বাংলায় মুসলিমরা হিন্দু জমিদারদের অধীনে নির্বিচারে প্রজায় পরিণত হয়। কোম্পানী আমলে একটি মাত্র মুসলিম জমিদারির উত্থান হয়, তা হল ঢাকার নবাব পরিবারের জমিদারি।

এভাবে রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রসমূহ থেকে মুসলিমদের বিতাড়নের ফলে মুসলিম শাসক পরিবার ও মুসলিম অভিভাবক শ্রেণীটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। এর সুদুর প্রসারী প্রভাব পড়ে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে। সংস্কৃতির পরিচর্যা ও সমাজের উন্নয়নে নেতৃত্ব দেয়ার মত আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না।

দ্বিতীয় আঘাতটি ছিল অর্থনীতিতে। বাংলা মধ্যযুগে সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু কোম্পানী সরকারের হাতে বাংলার অর্থনীতি চরম দৈন্য দশায় পতিত হয়। বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় এবং ইংল্যান্ডে অর্থ স্থানান্তরের বিষয়টি আগেই আলোচিত হয়েছে। ইংরেজরা শুধু যে অর্থ সম্পদ আহরণ করেছে তা নয়, উৎপাদনের উৎসসমূহ ধ্বংস করেছে। বাংলার অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষি ও বাণিজ্য। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় এবং নতুন জমিদার শ্রেণীর শোষণ ও প্রজাদের প্রতি দায়িত্বহীনতা প্রজাদের বিপর্যস্ত করে তোলে। উপরন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে ব্যাপকহারে কৃষকের মৃত্যু কৃষির মেরুদন্ড ভেঙ্গে

দেয়। কৃষক ও কৃষি ঋণের অভাবে কৃষি জমি অনাবাদী হয়ে জঙ্গলে পরিণত হয়।[২৯] এ অবস্থায় কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করে কৃষির পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা তেমন হয়নি বললেই চলে। যে সামান্য তাকাভী ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা দূর্নীতির কারণে কৃষকের হাত অবধি পৌঁছেনি।[৩০] এ সময় বাংলার ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্প পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। এক দিকে দুর্ভিক্ষ অন্য দিকে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব এ ধ্বংসের অন্যতম কারণ। অভিজ্ঞ শ্রমিকদের মৃত্যু ও জীবিত শ্রমিকদের অনাহারে অর্ধাহারে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা রেশম ও তাঁত শিল্পের উৎপাদনকে অর্ধেকে নামিয়ে আনে। অন্যদিকে বাংলা এ সময় ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে, মেশিনে তৈরী দ্রব্যের বাজারে পরিণত হয়। উপরন্তু এদেশীয় সুতা ও কাঁচামালের উপর ৭৫% হারে শুল্ক আরোপের ফলে এদেশীয় বস্ত্র শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁতী শ্রেণীটি জীবিকার উৎস থেকে বঞ্চিত হয়। ১৮২৮ সালের মধ্যে দেশীয় সুতার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে এবং বিলেতি সুতার ব্যবহার শুরু হয়।[৩১] পৃথিবী বিখ্যাত মসলিন ব্যবসায়ও ধস নামে। মসলিনের রপ্তানি মূল্যের পরিমাণ দিন দিন কমতে থাকে। জেমস টেলর এ সংক্রান্ত একটি তালিকা প্রদান করেছেন–

১৭৮৭ সালে ইংল্যান্ডে মসলিনের রপ্তানি মূল্যের পরিমাণ–	৩০ লক্ষ টাকা
১৮০৭ সালে ইংল্যান্ডে মসলিনের রপ্তানি মূল্যের পরিমাণ–	সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা
১৮১৩ সালে ইংল্যান্ডে মসলিনের রপ্তানি মূল্যের পরিমাণ–	সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা
১৮১৭ সালে ইংল্যান্ডে মসলিনের রপ্তানি মূল্যের পরিমাণ–	শূন্য ।[৩২]

২৯। সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার উপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, পৃ-৭২।
৩০। সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৭২।
৩১। জেমস টেলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, বাংলা অনুবাদ-মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ-২৯৫।
৩২। পূর্বোক্ত, পৃ-২৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৮১৭ সালে কোম্পানী তার বাণিজ্যিক প্রতিনিধির পদই বাতিল করে দেয়। এভাবে শিল্প ও ব্যবসায়, বাণিজ্যের সাথে জড়িত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষদেরকে জীবিকার সংস্থান থেকে বঞ্চিত করা হয়। সুলতানী ও মোগল আমলে তাঁতী শ্রেণীটি নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হয়েও বেশ স্বচ্ছল জীবন যাপন করত। তারা নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ করত এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু কোম্পানী আমলে তাদের শর্তাধীনে কাজ করতে হত। ব্যবসায়ী বা তাদের প্রতিনিধি পাইকারদের কাছ থেকে তাঁতীরা সুতা ও অগ্রিম টাকা গ্রহণ করত এবং অনেকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করত।[৩৩]

ভূমির সাথে জড়িত রায়ত বা কৃষক ও মজুর শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রায়ও পরিবর্তন ঘটে। কোম্পানী আমলে পূর্বের বনেদী জমিদারিসমূহের ভাঙন বা পতনের পর ইংরেজ সরকার নতুন যে শ্রেণীটির সাথে ইজারা চুক্তি করে, তারা ছিল উঠতি পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী, বেনিয়া, মুৎসুদ্দি, কোম্পানী কর্মকর্তাদের চাটুকার শ্রেণী। এদের বেশির ভাগের বসতি ছিল কলকাতায়। রায়তের কাছ থেকে আদায়কৃত রাজস্ব দিয়ে কলকাতায় বিলাসী জীবন যাপন করত, প্রজাদের সুখ-দুঃখের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। পূর্বের বনেদী জমিদারদের মত প্রজার কল্যাণের কোন মানসিকতা তাদের ছিল না। কোম্পানীর তিনজন কাউন্সিলর (ফিলিপ ফ্রান্সিস, কর্নেল মনসন ও জেনারেল ক্লেভারিং) মন্তব্য করেছিলেন-

“যে সব ইজারাদার জমিদারদের স্থলাভিষিক্ত হয় তারা ছিল জনগণের মধ্যে জঞ্জাল জাতীয়। কলকাতাস্থ বেনিয়া বা তাদের আশ্রীত লোকেরা তাদের ইংরেজ প্রভুদের ছত্রছায়ায় যে কোন মূল্যে ইজারা গ্রহণ করে। এরা বন্দোবস্তের কিস্তি শোধ ও মুনাফার জন্য রায়তের শেষ

৩৩। জেমস টেলর, প্রাগুক্ত, পৃঃ-২৫২।

কপর্দকটি পর্যন্ত আদায় করে। রায়তের সর্বস্ব হরণ করার পর লুণ্ঠন করার আর যখন কিছু বাকী থাকে না তখন এলাকাকে সম্পদশূন্য ও জনশূন্য রেখে কেটে পড়ে। এটাই দেশের মহা দুর্দশা ও দারিদ্র্যের কারণ।"[৩৪]

তবে জমিদারদের উপর সব দায় চাপিয়ে কোম্পানী সরকারের দায়মুক্ত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কারণ সরকারের অতিরিক্ত হারে রাজস্ব ধার্যের কারণে একদিকে বনেদী জমিদারিসমূহের পতন এবং অন্যদিকে নতুন জমিদারগণ রাজস্ব আদায়ে জুলুম নিপীড়নে বাধ্য হতেন। এভাবে অবস্থার পরিবর্তনে বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে ৯০ ভাগ মানুষের জীবনমানের চরম অবনতি ঘটে। ভদ্রভাবে জীবন যাপনের রাস্তা তাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। জীবন ধারণের নিতান্ত মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই উইলিয়াম হান্টার ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুধু মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর পতন ঘটেছে এবং সাধারণ জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার পথ তৈরী হয়েছে বলে যে মন্তব্য করেছেন, তার সাথে বাস্তবতার মিল নেই।[৩৫] এ অবস্থায় মানুষ বাঁচার তাগিদে ন্যায় অন্যায় যাবতীয় পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। সমাজের দুঃসাহসিক ব্যক্তিরা, যেমনঃ সেনাবাহিনী থেকে ছাটাইকৃত সিপাই, ভাগ্যহত জমিদার ও লাঠিয়াল, পালোয়ান, গ্রামের সর্বশান্ত মোড়ল, মন্ডল, ভবঘুরে যুবক সবাই জীবিকার তাগিদে নিজের হাতে আইন তুলে নেয় এবং চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুট তরাজের পথ বেছে নেয়। কেউবা গ্রামে কৃষিকার্যে নিয়োজিত হয়, কেউবা সন্যাস জীবন গ্রহণ করে। সমাজের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। বাঙালী মুসলমানের চারিত্রিক অধঃপতন এখান থেকেই শুরু হয়।

৩৪। Sixth report of the select committee, 1782, P-3, উদ্ধৃতঃ সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ-২০৮-২০৯।

৩৫। W.W. Hunter, *The Indian Musalmans,* chapter- IV.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতির রূপান্তর

● শিক্ষা ব্যবস্থার পতন ও পরবর্তীতে উত্থান প্রচেষ্টা

মুসলিম শিৰা ব্যবস্থার পতনঃ

মুসলিম সংস্কৃতির অধঃপতনে বৃটিশ সরকারের যে পদক্ষেপটি মরণাঘাত হিসেবে কাজ করেছে তা হল নিষ্কর জমির উপর পুনরায় করারোপ পদ্ধতি বা Resumption Proceedings। এর মাধ্যমে মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থা বলতে গেলে পুরোটাই ধবংস হয়ে যায়। প্রাক বৃটিশযুগে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় পুরোপুরি ওয়াক্‌ফকৃত লাখেরাজ সম্পত্তি নির্ভর ছিল। পড়াশোনার জন্য একজন ছাত্রের ব্যয় করতে হত না বললেই চলে। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, অলিম-ওলামা, অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ (হিন্দু পুরোহিত, সাধু সন্যাসীসহ) অসহায় বৃদ্ধদের জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি বরাদ্দ করা হত। এ ব্যবস্থায় কিছু দূর্নীতিও ঢুকে পড়ে ছিল। বৃটিশ রাজস্ব বিশেষজ্ঞ জেমস গ্রান্ট লক্ষ্য করেন, বাংলার মোট ভূমির প্রায় এক চতুর্থাংশ নিষ্কর। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মত একটি মুনাফালোভী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জনকল্যাণের নামে এ বিশাল পরিমাণ ভূমি ছেড়ে দেয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। তাই বাঙালী মুসলিমদের এই উদার নীতি তাদের চোখে অন্যায় সাব্যস্ত হয়েছে। Hafeez Malik উল্লেখ করেছেন-

"The British authorities discovered that one fourth of all the land in the province of Bengal had been transferred to the educational institutions. In 1772 Warren Hastings declared that this was a fraud, perpetrated by the Moslems to deprive the state of a due share of the revenue."[১]

১। Hafeez Malik, *Moslem Nationalism in India and Pakistan*,Public Affairs Press, 419 New Jersey Avenue S.E., Washington 3, D.C, 1963, P-150.

১৭৯৩, ১৮১১, ১৮১৭, ১৮১৯ ও ১৮২৮ সালে নানাবিধ প্রবিধান জারি করে লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্তির ব্যবস্থা করা হয়। বৈধ-অবৈধ নানা উপায়ে ভূমি বাজেয়াপ্তির কারণে এদেশীয়রা যেমন ক্ষুদ্ধ হয় তেমনি কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তীব্র গণঅসন্তোষ ও লোকসানের ভিত্তিতে ১৮৫২ সালে সরকার বাজেয়াপ্তকরণ নীতি বন্ধ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ততদিনে বাঙালী মুসলমানের সর্বনাশের শেষ ডঙ্কা বেজে গেছে। Hafeez Malikও এই মতের সমর্থনে বলেছেন-

"The educational system of the Moslems which had been almost entirely maintained by revenue free lands, received its death-blow."[২]

অভিজাত শ্রেণীর পতনও মুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের অন্যতম একটি কারণ। অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হওয়ায় তাদের পক্ষে পূর্বের মত নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতো দূরের কথা প্রচলিত মাদ্রাসাসমূহ টিকিয়ে রাখাও সম্ভব হয়নি। উচ্চ শিক্ষা প্রায় পুরোপুরি ধবংস হয়ে যায়। ১৮৩৫-৩৮ সালে মি. এডাম বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সেখানে দেখা যায় মুসলিম আমলে জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে যে সব অঞ্চল খ্যাতি লাভ করেছিল কোম্পানি আমলে অর্থাভাবে ও তদারকির অভাবে সেগুলোর চরম অবনতি ঘটে। এডাম রাজশাহীর বাঘা মাদ্রাসার দূর্দশার কথা উল্লেখ করেছেন। এ সময় হাওদামিয়ার উত্তরাধিকারীগণ মাদ্রাসার সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিলেন এবং মাদ্রাসায় আরবী ও ফার্সি শিক্ষা দানের জন্য দুজন মাত্র শিক্ষক অবশিষ্ট ছিল।[৩]

২। পূর্বোক্ত, পৃ-১৫০।

৩। ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ-১০০।

মি. এডাম চট্টগ্রামের একটি মাদ্রাসার উল্লেখ করেছেন যা আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন ভগ্ন দশায় পতিত হয়েছিল। হুগলীর পান্ডুয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল। লাখেরাজ জমির উপর নির্ভরশীল এসব মাদ্রাসাসমূহ কোন রকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। এডাম উল্লেখ করেছেন- "এখানকার (হুগলীর) ভূস্বামীগণ দরিদ্র প্রতিবেশীদের ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা করতেন এবং সেখানে এমন কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল না যার বাড়িতে শিক্ষক রাখা হত না। এই শ্রেণীর মুসলমান ও এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা এখন নেই বললেই চলে।"[৪]

হাজী মুহম্মদ মুহসীনের দানে সীতাপুরে একটি মাদ্রাসা ছিল। গভর্নর কার্টিয়ার সেখানে সাড়ে পাঁচ টাকা দান করেছিলেন। হাজী মুহসীন মুসলিমদের শিক্ষা কার্যক্রমে তাঁর সকল সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে গিয়েছিলেন। ১৮১৭ সালে সরকার এই সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে এবং এর অর্থ দিয়ে হুগলীতে যে কলেজ স্থাপন করে সেখানে হিন্দু ছাত্রদেরই প্রাধান্য ছিল। এ থেকে মুসলিমরা উপকৃত হয়নি। জেমস টেলরের বর্ণনায় এসেছে, পুরো ঢাকা অঞ্চলে ইসলামী উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন সরকারী বিদ্যালয় ছিল না। লালবাগ মসজিদ কেন্দ্রিক একটি মাত্র বিদ্যালয় ছিল, যেখানে মৌলভী আসাদুল্লাহ শিক্ষা দান করতেন। মোগল সরকারের কাছ থেকে তিনি মাসিক ৬০ টাকা বেতন পেতেন এবং শহরের যুবকদের আরবী ভাষা, যুক্তি শাস্ত্র, সাধারণ দর্শন শাস্ত্র ও আইন সম্পর্কে শিক্ষা দান করতেন। ১৭৫০ সালে তার মৃত্যুর পর এখানে সরকারিভাবে আর কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি।[৫]

৪। ড. এম.এ.রহিম, প্রাগুক্ত; পৃ: ১০০।
৫। জেমস টেলর, প্রাগুক্ত, পৃ-২১৬।

বর্ধমান জেলায় ৯৩টি ফার্সি ও ৮টি আরবী বিদ্যালয়, বীরভূম জেলায় ৭১টি ফার্সী ও ২টি আরবী বিদ্যালয়, মেদেনীপুরে ১টি মাদ্রাসা ও ৪৮টি ফার্সি বিদ্যালয় এবং মুর্শিদাবাদে ১টি মাদ্রাসা, ১৭টি ফার্সি ও ২টি আরবী বিদ্যালয় ছিল। এসব প্রতিষ্ঠান নিষ্কর জমি নির্ভর ছিল। শিক্ষকদের জন্য নিষ্কর জমি বরাদ্দ দেয়া হত এবং ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেয়া হত।[৬] নিষ্কর ভূমিতে পুনরায় করারোপ নীতিমালার কারণে এসব প্রতিষ্ঠান যে দিনে দিনে বিলুপ্তির পথে ধাবিত হয় । তবে এই চরম দূর্দিনেও মুসলিমগণ ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বেসরকারী উদ্যোগে মসজিদ ও ইমামবাড়া ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা কিছুটা বজায় রেখেছিল। এডাম উল্লেখ করেছেন- তখন বাংলা ও বিহারের ৪০,০০,০০০ জন অধিবাসীর জন্য ১,০০,০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এডামের মতে, মুসলিম আমলে প্রাথমিক শিক্ষা আরও ব্যাপক ছিল।[৭]

প্রাথমিক শিক্ষা কোন রকমে টিকে থাকলেও অর্ধ শিক্ষিত শিক্ষকদের হাতে পড়ে গুণগত মানে অবনতি ঘটে। এডাম মন্তব্য করেছেন “এই আরবী বিদ্যালয়গুলি এরূপ হীনদশায় পৌঁছেছে, এগুলো লক্ষ্যেরও অযোগ্য হয়ে পড়েছে।”[৮] তিনি আরও মন্তব্য করেছেন- “যদি বাঘা, বোহার, চাঙ্গারিয়া ও মুর্শিদাবাদের মাদ্রাসাগুলি ভালভাবে পরিচালিত হত তা হলে এগুলো উচ্চমানের শিক্ষা কেন্দ্রে উন্নীত হত।”[৯]

৬। এডামস থার্ডরিপোর্ট; উদ্ধৃত, ড. এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত; পৃ- ১০০।
৭। উদ্ধৃতঃ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-৯৯।
৮। ড. এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-১০১।
৯। ড. এম. এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-১০০।

এ সময়ে একদিকে মুসলিমদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস হয়েছে, অন্যদিকে উদীয়মান হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রচুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এদের সাথে যুক্ত হয়েছে ইংরেজ মিশনারীদের

স্কুলসমূহ। শেষোক্ত দু ধরনের প্রতিষ্ঠানে মুসলিমদের কোন অংশগ্রহণ ছিল না। ধর্মনাশের ভয়ে মুসলিমগণ সচেতনভাবেই এসব প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে থেকেছে। এভাবে একটি জাতির শিক্ষার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোম্পানী সরকারও তাদের প্রতিষ্ঠার অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত এদেশীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে কোন দায়িত্ববোধ অনুভব করেনি। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে কোম্পানী সরকার প্রজাদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে দায়িত্ব অনুভব করে, তবে তা অত্যন্ত সীমিত পরিসরে। জনশিক্ষা সাধারণ সমিতির নেতৃত্বে সরকার যে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে তা মুসলিমদের উপযোগী ছিল না।[১০] ফলে মুসলিমদের ক্ষুদ্র একটি অংশ এই শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। বৃহৎ অংশটি থেকে যায় আলোক বঞ্চিত। ফলে মুসলিম জাতি অশিক্ষা কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। জাতীয় চরিত্রে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয় এবং স্থবির হয়ে পড়ে তাদের অগ্রযাত্রা।

প্রাক বৃটিশ যুগে সমাজ ও রাজনীতিতে আলিম-ওলামা ও শিক্ষকদের যে মর্যাদা ও বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল তার অবসান ঘটে। শিক্ষা ব্যবস্থাই যখন ধবংস হয়ে যায় তখন আলেম তৈরী হবে কোথা থেকে? শাসকের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন যে শ্রেণীটি, আর্থিক দৈন্যতা ও জ্ঞানের ঘাটতি তাদের সুযোগ সন্ধানী ও জীবিকার অন্বেষণে অনুগ্রহ প্রার্থীর কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সমাজের নেতৃত্বের আসন থেকে তাঁরা বিদায় নেন। অর্ধশিক্ষিত মোল্লা মৌলভীগণ নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপর কিছু প্রভাব বজায় রেখেছিলেন।

১০। Hunter, প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৪-১৪৯।

তবে এ দূর্দিনে ক্ষনজন্মা দু' একজন আলিম ও জাতির কান্ডারীর জন্ম হয়েছিল যেমন- শাহ ওয়ালিউল্লাহ, সৈয়দ আহমদ বেরলভী, তিতুমীর, শরিয়তুল্লাহ প্রমুখ, যারা নিরাশার ভিতরেও জাতিকে আশার আলো দেখিয়েছেন।[১১]

শিক্ষা ক্ষেত্রে জাগরণ বা উত্থান প্রচেষ্টাঃ

ব্রিটিশ শাসনাধীনে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার পতন সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। মসজিদ মক্তব কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা ছিল এ সময় মুসলিমদের একমাত্র অবলম্বন। অথচ বিপরীতি দিকে উদীয়মান হিন্দু গোষ্ঠী ও খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে প্রচুর বাংলা ও ইংরেজী বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এসব স্কুলের পাঠ্যসূচী ও পাঠদান পদ্ধতি ছিল মুসলিমদের চাহিদার বিপরীত। মিশনারি স্কুলসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার। এ উদ্দেশ্যেই তাদের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচিত হয়েছিল। শুধু কোলকাতা নগরীর আশেপাশেই তারা ২০২টি স্কুল চালু করেছিল।[১২] এসব স্কুলে সংস্কৃত, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মান্তরকরণ। মিশনারী রিপোর্টে প্রকাশ পায়- "যদি আমরা দক্ষতার সাথে অবৈতনিক শিক্ষা দান করতে পারি তাহলে শত শত লোক ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করার জন্য ভীড় জমাবে। আশা করি তা আমরা এক সময়ে করতে সক্ষম হবো এবং এর দ্বারা যীশু খ্রিষ্টের বাণী প্রচারের এক আনন্দদায়ক পথ উন্মুক্ত হবে।"[১৩]

১১। মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারী: মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমানঃ ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবা-একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ (অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি.অভিসন্দর্ভ), জুন-২০০৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-৪০-৫৫।

১২। আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬২।

১৩। M. Fazlur Rahman, *Bengali Muslim & Eglish Education*, P-353.

১৮১৮ সালে উইলিয়াম কেরী শ্রীরামপুরে যে কলেজ চালু করেন সেখানে ১০১ জন ছাত্রের মধ্যে একজনও মুসলিম ছাত্র ছিল না।[১৪] ধর্মনাশের ভয়ে মুসলিমরা এসব প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা থেকে বিরত থেকেছে। আর বাংলা স্কুলগুলিতে সংস্কৃত ভারাক্রান্ত এমন বাংলায় শিক্ষা দেয়া হত যা মুসলিমদের বোধগম্য ছিলনা। আর পাঠ্যসূচী ছিল সম্পূর্ণ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি নির্ভর। এসব স্কুলে গুরু দক্ষিণা, অমর সিংহ, চানক্য, স্বরস্বতী বন্দনা, মানভঞ্জন, কলঙ্ক ভঞ্জন প্রভৃতি ছিল পাঠ্য বই যা মুসলিমদের জন্য গ্রহণ অসম্ভব ছিল। ফলে মুসলিমদের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মুসলিম সমাজ নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অসমর্থ হওয়ায় এবং কোম্পানী সরকারের প্রথম দিকে প্রজা সাধারণের শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব গ্রহণ না করায় মুসলিমরা পিছিয়ে পড়ে। একটি শিক্ষানুরাগী জাতি দীর্ঘ দিন এ অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে না। জীবন জীবিকার তাগিদে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণেও তারা আগ্রহী হয় কিন্তু ইংরেজী স্কুলে পড়ার মত সামর্থ তাদের ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে মুসলিমদের অনীহা থাকার কথা নয়, কারণ আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞান কেন্দ্রসমূহে পাশ্চাত্য জ্ঞান চর্চা অনেক পূর্বেই শুরু হয়েছিল কিন্তু ভারতে তা ধর্মীয় মোড়কে উপস্থাপন করায় মুসলিমরা বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল, তা না হলে জাগতিক প্রয়োজনে ইংরেজী শেখায় মুসলিমদের কোন আপত্তি ছিল না। ১৭৮০ সালে কোলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের আবেদনে ওয়ারেন হেস্টিংস ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সরকার কিছু বরাদ্দ দেয়, কিন্তু যথাযথ তদারকি ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কোলকাতা মাদ্রাসা বেহাল দশায় উপনীত হয়। Dr. M. Lamsden মাদ্রাসা কমিটির প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। তিনি মাদ্রাসায় ইংরেজী বিভাগ চালুর প্রস্তাব দিলে জনশিক্ষা কমিটি তা মেনে নেয় নি। অথচ পাশাপাশি কোলকাতার হিন্দু

১৪। পূর্বোক্ত, P-40।

কলেজটি ১৮১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দ্রুতই উন্নতি লাভ করে। বেনারস সংস্কৃত কলেজে ১৮১৫ সালে ইংরেজী বিভাগ চালুর প্রস্তাব দিলে জনশিক্ষা কমিটি তা উৎসাহের সাথেই গ্রহণ করেন। অথচ কোলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী বিভাগ চালু হতে সময় লাগে আরও ১৪ বছর। ১৮২৯ সালে ইংরেজী বিভাগ চালু হলেও শিক্ষক সংকট ও অর্থাভাবে তা ফলপ্রসূ হয়নি। ১৮৩৭ সালে সরকারি ভাষা হিসেবে ফার্সীর স্থলে ইংরেজী চালু হলে সরকার মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ করে দেয় এবং মেধার ভিত্তিতে কিছু বৃত্তি চালু করলেও মাদ্রাসা ছাত্রদের সামান্য ইংরেজী জ্ঞান নিয়ে ইংরেজী স্কুলের ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতায় বৃত্তি লাভ সম্ভব ছিল না। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন কলেজ ছিল না। ইংরেজী শিখতে কলকাতা মাদ্রাসার দারস্থ হতে হত। ১৮৫০-৫১ সালের একটি তদন্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায় কলকাতা মাদ্রাসায় ৯০ জন ছাত্রের জন্য মাত্র ১জন ইংরেজী শিক্ষক ছিল।[১৫] অথচ হুগলীর হাজী মুহম্মদ মুহসীনের ওয়ক্ফকৃত বিশাল সম্পত্তি থেকে হুগলী কলেজের ব্যয় ভার বহন করা হত যার বেশীর ভাগ ছাত্র ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের; সরকার অভিযোগ এড়াতে ছোট্ট একটি মুসলিম স্কুলকে কলেজের সাথে জুড়ে দিয়েছিল। অথচ এই অর্থ দিয়ে মুসলিমদের উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হলে মুসলিমরাও শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রগতি লাভ করত। বাধ্য হয়ে সামর্থবান মুসলিমরা প্যারেন্টাল একাডেমী ও সেন্টপলস স্কুলে সন্তানদের পাঠাতে শুরু করে।[১৬]

১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করে সকল ধর্মবর্ণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু আর্থিক দৈন্য ও উদীয়মান প্রভাবশালী হিন্দু গোষ্ঠীর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে মুসলিমরা সেখানেও খুব বেশী জায়গা করে নিতে পারেনি।

১৫। ড.এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-১১০।
১৬। আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬১।

কোম্পানী সরকার প্রথম দিকে ভারতীয় প্রজা সাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও ১৮১৩ সালের দিকে এসে সরকার প্রজা সাধারণের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ সমন্ধে চিন্তা ভাবনা শুরু করে। ১৮১৪ সালে ডিরেক্টর সভা শিক্ষা খাতে প্রথম এক লাখ রুপি ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়।[১৭] দেশীয়দের শিক্ষার জন্য এই অর্থব্যয়ের যে পরিকল্পনা সরকার হাতে নেয় তাতে হিন্দু জনগোষ্ঠীই উপকৃত হয়। A.R Mallick উল্লেখ করেছেন:

"The Despatch (3 June 1814) also recommended Sanskrit learning and drew the attention of the Government in an exceptional manner to Banaras as the seat of Hindu learning. ....No mention was made in the Despatch of Arabic and persian learning."[১৮]

সীমিত পরিমান বরাদ্দ দিয়ে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার সম্ভব না হওয়ায় সরকার 'Downward filtration theory' (পরিস্রাবণ নীতি) নামে একটি নীতি গ্রহণ করেন, এর উদ্দেশ্য ছিল সরকার উচ্চ শ্রেণীর একটি অংশকে শিক্ষিত করবে, তাদের মাধ্যমে নিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার বিস্তার ঘটবে। এ শিক্ষা নীতির ফলভোগ করেছে কলকাতার ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ী শ্রেণী। এটি ছিল অত্যন্ত ধীর গতির একটি নীতি এবং এ দ্বারা মুসলিমতো দূরের কথা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরাও উপকৃত হয় নি।

১৭। A.R Mallick, প্রাগুক্ত, P-197.
১৮। A.R. Mallick, পূর্বোক্ত, P-198.

রেভারেন্ড লাল বিহারী দে মন্তব্য করেছেন, "ভারতে উচ্চ শ্রেণীর পরিস্রাবক, কোন দিক দিয়েও পরিস্রাবক নয়। এ এমন এক মৃন্ময় পাত্র যার মুখ এমন ভাবে বন্ধ যাতে করে বাইরের কোন আলো-বাতাসও ঢুকতে না পারে। এক দিকে এক জন ব্রাহ্মণ পেট ভরে তর্কশাস্ত্র, অধিবিদ্যা ও ধর্ম শাস্ত্রের জ্ঞান আহার করছে, অপর দিকে কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ শুদ্র অযথাই লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কখন তার প্রভুর আহারের টেবিল থেকে এক টুকরো খাদ্য তার ভাগ্যে জুটবে।"[১৯]

কোম্পানী সরকারের শিক্ষা কার্যক্রম মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। আর এর দ্বারা কলকাতার অধিবাসী, বণিক শ্রেণী, কোম্পানীর বেনিয়া, মুৎসুদ্দি ও হিন্দু অভিজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই উপকৃত হয়েছে। বাঙালী মুসলমান শ্রেণীটি, যার বড় অংশ ছিল কৃষিজীবী, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বহুদূরে অবস্থান করছিল । এতদিন অবস্থাসম্পন্ন মুসলিমদের পরিচালিত মক্তবসমূহে তাদের সন্তানরা অক্ষর জ্ঞান শিখলেও এই শ্রেণীটির পতনে মক্তব মাদ্রাসা পরিচালনাও দুষ্কর হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় হিন্দুদের পাঠশালাতেই কিছু ছাত্র লেখাপড়া করত। আবুল মনসুর আহমদের বাল্যশিক্ষাও এমনি হিন্দু নায়েবের কাচারিতে অবস্থিত পাঠশালাতেই সম্পন্ন হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে সরকারের শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তৃত হয় নি। তবে জেলা পর্যায়ে জিলা স্কুল চালু করলে বাংলার মুসলিমরা উপকৃত হয়। ধীরে ধীরে সরকারের শিক্ষা কার্যক্রমের পরিধি বাড়তে থাকে এবং মিশনারি কার্যক্রমের পরিধি সীমিত হয়ে আসে। সরকার পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বিস্তারে উদ্যোগ নেয়। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার নেতিবাচক দিক সত্ত্বেও মুসলমানরা জীবন জীবিকার তাগিদে এই শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসে।

১৯। L.B. Dey in reply to Babu Kishori Chand Mitter of a meeting of British Indian Association, 1868, উদ্বৃত: আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৭।

আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত কলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসা ছিল মুসলিমদের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। তখন পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় উচ্চ শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে নি। নওয়াব আব্দুল লতিফের মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি, আমীর আলীর সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন ও স্যার সৈয়দ আহমদের আলিগড় মহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তারের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং সরকারের সাথে সুসম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে দাবি দাওয়া আদায়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু এ তিনজন মনীষীর একজনও বাংলা ভাষাকে তাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্থান দেননি। এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দ্বারা বাঙালী মুসলমানের ব্যাপক উন্নয়ন না হলেও তারা উজ্জীবিত হন। নওয়াব আব্দুল লতিফের প্রচেষ্টায় মুহসিন ফান্ডের টাকা মুসলিমদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ঢাকা, হুগলী ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসা আলিমগণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে মুসলিমগণ তাদের দাবি দাওয়া ও অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার নবতর যাত্রা শুরু হয় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। নতুন প্রদেশের আর্থিক অগ্রগতিতে কৃষক পরিবারের সন্তানরাও স্কুল কলেজের সাথে পরিচিত হতে শুরু করে। ১৯০৭ -১৯১২ সালের মধ্যে সারা বাংলায় ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩৭%, এর মধ্যে শুধু পূর্ব বাংলায় বৃদ্ধি পায় ৮২.৯% যা সমগ্র ভারতে সর্বোচ্চ।[২০] প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়। স্থানীয় শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পায় ৪৭,৮১৮৩৩ টাকা থেকে ৭৩,০৫,২৬০ টাকায়।[২১] নারী শিক্ষার বিপুল অগ্রগতি হয়। ১৯০৮-১৯০৯ সালে ৮১৯টি নতুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

২০। এফ. বি ব্রাডলি বার্ট, *রোমান্স অব এন ইস্টার্ন ক্যাপিটাল;* মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ*, পৃ-১৯১।

২১। মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ-১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,৪৯৩ জনে দাঁড়ায়। ১৯১০-১১ সালে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫৫০ টি এবং ছাত্রী সংখ্যা ১৩১,১৩৯ জন।[২২] প্রাথমিক শিক্ষারও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। ১৯০৭-০৮ সালে পূর্ব বাংলার মক্তব ছিল ১২৯৯ টি। ১৯১১-১২ সালে তা ১৬৪৮টি তে বৃদ্ধি পায়।[২৩] এ সময় মক্তবগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪০১৮৮ থেকে ৫৪৭০৩ তে উন্নীত হয়। এ সময় মাধ্যমিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় সকল স্কুল কলেজে এসময় মুসলিম ছাত্রবাস নির্মিত হয়। পূর্বে বাংলার স্কুল কলেজগুলিতে শিক্ষকদের প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু। লে. গর্ভনর ফুলার এক আদেশের মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষকের সংখ্যা ৩৩% এ উন্নীত করার লক্ষ্য ঠিক করেন। প্রত্যেক জেলায় মুসলিম উপপরিদর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। মুন্সিগঞ্জের এক সভায় নওয়াব সলীমুল্লাহ্ উল্লাস প্রকাশ করেন, "বঙ্গভঙ্গ আমাদের নিস্ক্রিয় জীবন থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং সক্রিয় জীবন ও সংগ্রামের পথে ধাবিত করেছে।[২৪]

কিন্তু ১৯১১ সালে আকস্মিকভাবে বঙ্গভঙ্গ রদ বাঙালী মুসলিমদের মনে প্রচন্ড ক্ষোভ ও হাতশার জন্ম দেয়। বঙ্গভঙ্গের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল তাকে অব্যাহত রাখার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ ও সৈয়দ নওয়াব আলীর নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের মুসলিম প্রতিনিধি দল লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। সরকার এতে নীতিগতভাবে সম্মতি দিলেও নানা গড়িমসি এবং কলকাতার স্বার্থান্বেষী মহলের প্রবল প্রতিরোধের মুখে মুসলিম নেতৃবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় প্রথম একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। পরে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

২২। পূর্বোক্ত, পৃ-১৯২।
২৩। পূর্বোক্ত, ১৯২।
২৪। পূর্বোক্ত, পৃ-১৯৩।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে বাংলায় উচ্চ শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটে এবং একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ ঘটে, যারা পরবর্তীতে সর্বক্ষেত্রে জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপান্তরঃ

প্রাক বৃটিশ যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এক কেন্দ্রিক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। পলাশী পরবর্তী যুগে সমাজ ও রাজনীতিতে যে বিভাজন সৃষ্টি হয় তা সাহিত্যাঙ্গনেও প্রবেশ করে। পূর্বে বাংলার মানুষের ভাষাগত ভিন্নতা ছিল না। বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সির প্রভাব বেশী ছিল, তবে সংস্কৃত ভাষা ও দেশীয় অন্যান্য ভাষার প্রভাবও বিদ্যমান ছিল। মুসলিম কবিগণ যেমন হিন্দু কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, হিন্দু কবিগণও মুসলিম ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। জায়েজ-নাজায়েজ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন তখন আসেনি। সাহিত্যের শৈল্পিক বিকাশে, ভাষার সমৃদ্ধি অর্জনে সবরকম উপাদান দ্বিধাহীন চিত্তে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজদের হিন্দু তোষণ ও মুসলিম বিরোধী নীতিমালা হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে পরস্পর বিরোধী ভাবধারা তৈরী করে দেয়। এর প্রভাবে বাংলা ভাষার মধ্যে একটা বিভাজন তৈরী হয়- হিন্দুয়ানী বাংলা ও মুসলমানী বাংলা। উদীয়মান হিন্দু গোষ্ঠীটি সংস্কৃত ভাষাকে তাদের নিজস্ব ভাষা ও ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং সংস্কৃতের সংমিশ্রণে বাংলা ভাষার হিন্দুয়ানী ধারার জন্ম দেয়। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে জাতিগত ও ধর্মীয় বিভেদকে এমনভাবে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে সংক্রমিত করে যে, প্রচলিত ফার্সি শব্দের ব্যবহারকে হিন্দু সমাজ ধর্মীয় ও স্বীয় সংস্কৃতির অবমাননা বলে মনে করে এবং সচেতনভাবে ফার্সির ব্যবহার এড়িয়ে চলে। প্রচলিত অনেক সহজ শব্দের পরিবর্তে দূর্বোধ্য জটিল সংস্কৃত শব্দ দ্বারা ভাষাকে ভারাক্রান্ত করা হয় এবং এক সময় বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতায় রূপান্তরিত হয়। অথচ ইতিহাসের নিরিখে বাংলার জন্ম প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতের প্রভাব যে খুব সামান্যই ছিল, তা আমরা পূর্বেই জেনেছি।

অন্যদিকে এর প্রতিক্রিয়ায় এবং হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের প্রতিবাদ স্বরূপ মুসলিমরা ফার্সি, উর্দু, হিন্দি ভারাক্রান্ত এক স্বতন্ত্র বাংলা ভাষার জন্ম দেয়, যাকে Hunter 'মুসলমানী বাংলা' নামে অভিহিত করেছেন। Hunter উল্লেখ করেছেন-

"To this day the peasantry of the Delta is Muhammadan. So firmly did Islam take hold of lower Bengal, that it has developed a religious literature and a popular dialect of its own. The 'patois' known as *Musalman Bengali* is as distinct from the Urdu of upper india, as urdu is different from the persian Herat."[২৫]

বাংলা সাহিত্যেও এই বিভাজন সৃষ্টি হয়। ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮২৬ সালের মধ্যে এ কলেজ থেকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়। এর পূর্বে মুসলিম আমলে চিঠি পত্রের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের একটা আদিরূপ তৈরী হয়েছিল। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কেন্দ্রিক গদ্য সাহিত্য পাশ্চাত্য ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম দেয় এবং এর নেতৃত্ব দান ও বিকাশ সাধন করেন হিন্দু সাহিত্যিকগণ। এ সময় রাজা রাম মোহন রায় (মৃত্যু ১৮৩৩), ইশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৯১), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২১-১৮৮৭), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ শক্তিশালী সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে।[২৬] অন্যদিকে মুসলিম সাহিত্যিকগণ তখনও মোগল ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছেন। পাশ্চাত্য ভাবধারার সাথে তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না।

২৫। Hunter, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৮।
২৬। *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, পৃঃ ৩৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৬৯ সালে মীর মোশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী' উপন্যাসের মাধ্যমে মুসলমানরা আধুনিক ভাবধারায় প্রবেশ করে। প্রাচীন ভাবধারায় মুসলমানী বাংলায় যেসব সাহিত্য রচিত হয়েছিল তা কলকাতার বটতলা থেকে মুদ্রিত হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তবে এসব সাহিত্য এক সময় শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক 'বটতলার পুঁথি' হিসেবে নিন্দিত হয়েছে। এনামুল হক একে অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক ভাষার অনুবর্তন মনে করেন। তাঁর মতে- "ইহাতে সাহিত্য আছে, রস আছে, শিল্পও আছে। তবে, তাহার বেশির ভাগই মোগলাই।"[২৭]

বৃটিশ শাসনামলের প্রাচীন ধারার মুসলিম কবিগণ ও তাদের রচনাবলী[২৮]–

১। মুহম্মদ রজা (১৬৯১-১৭৬৭): মোগল ইংরেজ যুগ সন্ধিক্ষণের কবি। 'তামীম গোলাল' ও 'মিসরী-জমাল' তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থ। 'তামীম গোলাল' বটতলা থেকে মুদ্রিত হয়ে পূর্ব বাংলার মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রাচীন ধারায় রচিত হলেও কাব্যগ্রন্থ দুটির বিশেষ নতুনত্ব হচ্ছে সেখানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দীর্ঘ মঙ্গলাচরণ ও ভণিতা ছিল না।

২। আলী রজা (১৬৯৫-১৭৮০): তিনি একজন সাধক কবি এবং কালু-ফকির নামে পরিচিত ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থাবলী (ক) কবিরাজ কুলুব, (খ) জ্ঞান সাগর, (গ) আগম, (ঘ) ধ্যানমালা, (ঙ) যোগ কালন্দব, (চ) ষটচক্রভেদ। এছাড়া তিনি অসংখ্য মারফতী গান ও পদাবলী রচনা করেন। তিনি যোগশাস্ত্র ও হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের কথা প্রচার করেছিলেন।

২৭। *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, পৃ: ৩৮৬।
২৮। পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৭-৪০১।

৩। মুহম্মদ মুকীম (আনু- ১৭০০-১৭৭৫) : কবি আলী রজার শিষ্য ছিলেন। 'গুল-ই-বকাওলী', 'ফায়দুল মুকতদী', 'কলাকাম', 'মৃগাবতী' ও 'আয়ুব নবীর কথা' প্রভৃতি তাঁর রচনাবলী। 'গুল-ই-বকাওলী' গ্রন্থে কবি তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কবিদের নাম উল্লেখ করে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন।

৪। মুহম্মদ আলী (১৭৭৩ খ্রীঃ জীবিত): তিনি মুহম্মদ মুকীমের সমসাময়িক। তিনি চট্টগ্রামের আজিমনগরের ইদিলপুরের অধিবাসী। তিনি 'হয়রতু-ল্-ফিক্াহ্' নামে একটি ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া 'শাহাপরী মল্লিক জাদা' ও 'হাসনবানু' নামে দুটি উপাখ্যান কাব্য রচনা করেন।

৫। মুহম্মদ কাসিম (১৭৩০-১৮০৭): নোয়াখালী জেলার 'যুগদিয়া' রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। কবি 'হিতোপদেশ', 'সুলতান জমজমা' ও 'সিরাজুল কুলুব (১৭৯০)' এ তিনটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। মাতৃভাষায় ইসলামের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যেই কবি কলম ধরেছিলেন।

৬। সয়্যিদ নূরুদ্দীনঃ এনামুল হকের মতে, ধর্মগ্রন্থ রচয়িতা কবিদের মধ্যে সয়্যিদ নূরুদ্দীন (১৭৩০-১৮০০) অবিসংবাদিত রূপে শ্রেষ্ঠ।[২৯] তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী। কবির রচিত গ্রন্থের সংখ্যা চারটি- (ক) দকায়িক বা দকায়িকুল্ হকায়িক্, (খ) মূসার সওয়াল (গ) রাহাতু-ল্-কুলুব বা কিয়ামৎ-নামা এবং (ঘ) হিতোপদেশ বা বুরহানুল্- আরিফীন। কবির রচিত গ্রন্থাবলী বাংলা ও আরবী উভয় হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। 'দকায়িক' কবির বৃহৎ ফিকহ শাস্ত্রীয় অনুবাদ গ্রন্থ। এটি ২২টি অধ্যায়ে সমাপ্ত।

২৯। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯৪।

৭। সয়্যিদ হামজা (১৭৫৫-১৮১৫): হুগলী জেলার অধিবাসী। 'মধুমালতী', 'আমীর হামজা', 'জৈগুনের পুঁথি', 'হাতিম তাই' ও 'সোনাভান' কবির রচিত গ্রন্থাবলী। এসব গ্রন্থ বটতলায় মুদ্রিত হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হত।

৮। কবি চুহর (১৮০৪-১৮৩৫): গৌড়ের অধিবাসী পরে চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উকিল জাফর আলী চৌধুরী ছিলেন তার পৃষ্ঠপোষক। তিনি চারটি কাব্য লিখেছিলেন-'আজর শাহ্ সমনরুখ', মনোহর মধুমালতী, 'দিলারাম' ও 'সুজান চিত্রাবতী'। পীর মুতীউল্লাহও তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৯। হামীদুল্লাহ খান (১৮০৮-১৮৭০): চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। সিপাহী বিদ্রোহের সময় কোম্পানিকে সাহায্য করার জন্য তিনি 'খান বাহাদুর' উপাধি লাভ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় তার রচিত দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে-'ত্রাণপথ' ও 'শাহাদতুদ্যান' বা 'গুলজার-ই-শাহাদৎ'। তিনি একটি গদ্যগ্রন্থ লিখেছিলেন বলে জানা যায় তবে তার পান্ডুলিপি হস্তগত হয়নি। এনামুল হকের মতে, "হামিদুল্লাহ খানের গ্রন্থগুলি মুঘল প্রভাবের অবসান ও বাংলা কাব্যে নব্য ধারার সূচনা এই দুই যুগের সন্ধি সময়ের নিদর্শন।"[৩০]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিমদের প্রবেশ: ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর ব্রিটিশ ও মুসলমানদের পরস্পর বিরোধী মনোভাবে যে পরিবর্তন আসে তার প্রভাব সাহিত্যাঙ্গনেও পড়ে। অর্ধশতাব্দী পূর্বে থেকে হিন্দু সাহিত্যিকগণ পাশ্চাত্য প্রভাব দীপ্ত গদ্যরীতি ও কাব্য রীতির সাহিত্য রচনার মাধ্যমে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছেন, সেখানে মুসলিমগণ বিলম্বে প্রবেশ করায় হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে যান। তখনও মুসলিম

৩০। পূর্বোক্ত, পৃ: ৪০১।

উচ্চবিত্ত পরিবারে ফার্সি ও উর্দু এবং নিম্নবিত্ত পরিবারে মুসলমানি বাংলার চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি জীবিকার তাড়নায় ইংরেজী শিক্ষার দিকে ধাবিত হয়। যদিও গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, তবুও এই শ্রেণী থেকেই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। আধুনিক মুসলিম কবি সাহিত্যিকগণের তালিকা ও তাঁদের রচনাবলী[৩১]:

১। মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২): মীর মোশাররফ হোসেনের রচনার মাধ্যমে মুসলিম সাহিত্যিকগণ আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। তিনি নদীয়া জেলার অধিবাসী এবং খুব অল্প বয়সে সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দেন। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করলেও তা খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। তিনি প্রায় ৩০টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ :

(i) রত্নবতী-২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯ (উপন্যাস)
(ii) গৌরীসেতু- ১৮৭৩ (কাব্য)
(iii) বসন্তকুমারী- ১৮৭৩ (নাটক)
(iv) জমিদার দর্পন- ১৮৭৩ (নাটক)
(v) এর উপায় কি?- ১৮৭৬ (প্রহসন)
(vi) বিষাদ সিন্ধু- ১৮৮৫-১৮৯১ (মহরমের ঘটনা ভিত্তিক উপন্যাস)
(vii) সঙ্গীত লহরী- ১৮৮৮ (গান)
(viii) গো-জীবন- ১৮৮৯ (প্রবন্ধ)
(ix) বেহুলা-গীতাভিনয়-১৮৮৯ (গীতিনাট্য)

৩১। পূর্বোক্ত, পৃ-৪০৫-৪৩৭।

(x) উদাসীন পথিকের মনের কথা- ১৮৯০-১৮৯১ (উপন্যাস)

(xi) টালা-অভিনয়-১৮৯৯ (যাত্রা)

(xii) তহমিনা-১৮৯৯ (উপন্যাস)

(xiii) গাজী মিঞার বস্তানী- ১৮৯৮-১৮৯৯ সমাজ চিত্র (রস রচনা)

(xiv) মৌলুদ শরীফ- ১৯০২, গদ্য ও পদ্য, ধর্মীয় গ্রন্থ

(xv) মুসলমানের বাংলা শিক্ষা- ১৯০৩-১৯০৮ (শিক্ষা বিষয়ক গদ্য গ্রন্থ)

(xvi) বীবী খোদেজার বিবাহ- ১৯০৫ (কাব্য)

(xvii) হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ- ১৯০৫ (ঐ)

(xviii) হযরত বেলালের জীবনী- ১৯০৫ ঐ

(xix) হযরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ- ১৯০৫ (ঐ)

(xx) মদীনার গৌরব- ১৯০৬ (ঐ)

(xxi) মোসলেম বীরত্ব-১৯০৭ (ঐ)

(xxii) ইসলামের জয় ১৯০৮ গদ্য পদ্য (ধর্মীয় গ্রন্থ)

(xxiii) বাজীমাৎ ১৯০৮ (কবিতা)

(xxiv) আমার জীবনী- ১৯০৮-১৯১০ (আত্মজীবনী)

(xxv) বীবী কুলসুম-১৯১০ (উপন্যাস)

রত্নবতী উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ আধুনিকযুগে প্রবেশ করে। তবে মীর সাহেবের যে গ্রন্থটি সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করে তা হচ্ছে ‘বিষাদ-সিন্ধু’।

Dhaka University Institutional Repository

২। কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২): তাঁর পুরো নাম কাজেম আল কুরেশী। তিনি ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এন্ট্রান্স পাশের পূর্বেই লেখাপড়া ত্যাগ করে চাকুরী ও সাহিত্য সাধনায় আত্ম নিয়োগ করেন। কবির কাব্যসমূহ গীতি মধুর। তার রচিত গ্রন্থসমূহ :

(i) বিরহ বিলাস- কবিতা সঙ্কলন
(ii) কুসুম কানন- ঐ
(iii) অশ্রুমালা- কাব্যগ্রন্থ
(iv) মহাশ্মশান (১৯০৪)- মহাকাব্য
(v) শিব মন্দির (১৯১৭)- কাহিনী কাব্য
(vi) শ্মশান ভস্ম- ঐ
(vii) মহরম শরীফ (১৯৩৩)- মহাকাব্য
(viii) অমিয় ধারা (১৯২৩)- গীতিকাব্য

এছাড়া তার অপ্রকাশিত কিছু গ্রন্থ ছিল- প্রেমের ফুল, প্রেমের রানী, প্রেমের তীর্থ, মন্দকিনী-ধারা, অনুতপ্ত মুসলমান, প্রেমকুঞ্জ বা বড় পীর, প্রেম পরিজাত ও উপদেশ রত্নাবলী। জাতিকে উজ্জীবিত করে তোলা কবির কাব্য সাধনার উদ্দেশ্য ছিল।

৩। শেখ আবদুর রহীম: চব্বিশ পরগনা জেলার অধিবাসী। টাকীর জমিদার রাধামাধব বসুর অর্থানুকূল্যে এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তাঁর সম্পাদনা ও প্রকাশনায় ‘সুধাকর’, ‘মিহির ও সুধাকর’ এবং ‘মোসলেম হিতৈষী’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে পত্রিকাগুলি সরকারের রুদ্র দৃষ্টির ফলে বন্ধ করে দেয়া হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী-

১.	হজরত মোহাম্মদ (দঃ)- জীবন চরিত ও কর্মনীতি-১৮৮৭

২. ইসলাম তত্ত্ব- ১৮৮৭

৩. নমাজ তত্ত্ব-১৮৯৮

৪. হজ বিধি-১৯০৩

৫. ইসলাম ইতিবৃত্ত-১৯১০

৬. প্রণয় যাত্রী (অনুবাদ)-১৯২০

৭. ইসলাম নীতি (প্রথম ভাগ)-১৯২৫

৮. কোরান ও হাদীসের উপদেশাবলী-১৯২৬

৯. ইসলাম নীতি (দ্বিতীয় ভাগ)-১৯২৭

১০.	রোজা তত্ত্ব-১৯২৭

১১.	খোৎবা-১৯২৮

৪। দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬): নদীয়া জেলার কবি। উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নি। তবে অল্প বয়সে কাব্য প্রতিভার পরিচয় দেন। ‘ভাঙ্গা প্রাণ’, ‘শান্তিকুঞ্জ’, ‘আশেকে রসূল’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), ‘আখেরে মওত’ বা অন্তিম মৃত্যু তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ। এর মধ্যে ‘আশেকে রসূল’ কাব্যখানি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

৫। মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩): নদীয়া জেলার শান্তিপুরের কবি। উচ্চ শিক্ষা লাভ করেননি। তবে বাংলা, ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় দক্ষতা ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

(i) কুসুমাঞ্জলি-কবিতা

(ii) প্রেমহার- ঐ

(iii) জাতীয় ফোয়ারা- ঐ

(iv) অপূর্ব দর্শন- কবিতা

(v) হজরত মোহাম্মদ চরিতামৃত- ঐ

(vi) মহর্ষি মনসুর- জীবনী

(vii) তাপস কাহিনী- ঐ

(viii) বড়পীর চরিত- ঐ

(ix) ফেরদৌসী চরিত- ঐ

(x) টিপু সুলতান- ইতিহাস

(xi) শাহনামা- কাব্য কাহিনী

(xii) হাতেম তাই- কাহিনী

(xiii) জোহরা- উপন্যাস

(xiv) দারাফ খান গাজী-ঐ

(xv) রঙ্গিলাবাঈ- ঐ (অপ্রকাশিত)

(xvi) খাজা ময়ীন উদ্দীন চিশতি

(xvii) লহরী- কবিতা পত্রিকা।

কবির রচনায় তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির চিত্র ফুটে উঠেছে এবং তিনি মুসলিমদের নব প্রেরণা ও জাতীয় গৌরবে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

৬। আবদুল করীম সাহিত্য- বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩): চট্টগ্রামের অধিবাসী এফ.এ পর্যন্ত পড়াশোনা করে বিভাগীয় ইন্সপেক্টর স্কুলে কেরানীর কাজ করতেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও গবেষণার কাজে তিনি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি প্রায় দুই হাজার বাংলা পুস্তকের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন যার মধ্যে মুসলিম লেখকের লেখা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ১২০০। এনামুল হক মনে করেন, "তাঁহারই (আবদুল করিম) সাধনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, মধ্যযুগে, এমনকি ইংরেজ আমলের প্রথম একশত বৎসর পর্যন্ত, বাংলা সাহিত্য সাধনায় মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে অগ্রগামী ও উন্নত ছিলেন।"[৩২] তিনি প্রায় ছয় শতাধিক মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। তার সম্পাদনায় শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ বিজয়', রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' ও আলী রজার-'জ্ঞান সাগর' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) বাংলা সাহিত্যে অমূল্য দান। এছাড়া ড. এনামুল হকের সাথে যুগ্মভাবে 'আরাকান রাজ সভায় বাংলা-সাহিত্য' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তা তাঁর মৌলিক গবেষণার উজ্জ্বল নিদর্শন।

৭। মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০): চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবী, ফারসী ও উর্দুতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি সাংবাদিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির চর্চায় ব্যস্ত থেকেও সাহিত্য সেবা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ:

(i) খগোল শাস্ত্রে মুসলমান

(ii) ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান

(iii) ভারতে মুসলমান- সভ্যতা

(iv) ভারতে ইসলাম প্রচার

(v) মুসলিম জগতের অভ্যুত্থান

৩২। *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, পৃ-৪০৯।

(vi) কনষ্টানটিনোপল

(vii) কোরান ও রাজনীতি

(viii) কোরআন ও স্বাধীনতার বাণী

(ix) নিজামুদ্দীন আউলিয়া (জীবনী গ্রন্থ)

(x) সমাজ সংস্কার

(xi) সুদ সমস্যা

(xii) নিম্নশিক্ষা

(xiii) শিক্ষাকর

(xiv) কোরান ও বিজ্ঞান (প্রবন্ধ গ্রন্থ)

(xv) আল ইসলাম (তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা)

আধুনিক যুগের প্রথম পর্বের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে আরও ছিলেন রিয়াজুদ্দীন মাশহাদী (মৃত্যু-১৯১৯), মুনসী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) মওলভী মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন (১৮৩২-১৯১৬), মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), ডাক্তার আবুল হোসেন (১৮৬০-১৯৩৩), মওলভী মেরাজ উদ্দীন আহমদ, তসলিম উদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৮), মুনশী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ (১৮৭০-১৯৩০), মৌলভী আব্বাস আলী, কবি আর্জুমন্দ আলী (১৮৭০-১৯১৪), কবি আবু মালি মোহাম্মদ হামিদ আলী (১৮৬৫-১৯৫৩), আবদুল হামিদ খান ইউসুফ জায়ী (১৮৪৫-১৯১৩), নওশের আলী খান ইউসুফ জায়ী প্রমুখ। এই সাহিত্যিকগণ আধুনিক ভাবধারায় মুসলিমদের অতীত গৌরব গাঁথা, ইতিহাস, বীরত্ব গাঁথার রচনা করে হতাশাগ্রস্থ মুসলিমদের জাগানোর চেষ্টা করেছেন। এরপরই ১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন এবং একে কেন্দ্র করে বাঙ্গালী মুসলিমের আত্মোন্নয়ন

প্রচেষ্টা ও বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালী মুসলিমের বোধোদয় সাহিত্যের অঙ্গনকেও আন্দোলিত করে। এই পর্যায়ে নতুন আরেক দল সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় যাদের রচনা ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে অনেক বেশী সম্প্রসারিত। এই পর্যায়ের সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করা হল-

১। সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১): তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'অনল প্রবাহ', 'স্ত্রী শিক্ষা', 'রায়নন্দিনী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের অপরাজেয় সেনানায়ক। তাঁর ' অনল প্রবাহ' কাব্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

২। মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৩৮): তার রচনাবলীর মধ্যে 'শান্তিধারা', 'মানব মুকুট', 'নূরনবী' (শিশু সাহিত্য), কহিনুর পত্রিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬): মানব চরিত্রের উন্নয়নে তাঁর রচিত 'মহৎজীবন', 'মানব জীবন', 'উন্নতজীবন' প্রভৃতি প্রবন্ধ পুস্তকসমূহ গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। 'প্রীতি উপহার' ও 'রায়হান' নামে তার দুটি উপন্যাস এবং 'প্রকাশ' নামে একটি কবিতা গ্রন্থ রয়েছে।

এ তালিকায় আরও রয়েছেন- মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), সাহিত্যরত্ন নজীবুর রহমান (১৮৭৮-১৯২৩), শেখ ফজলুল করীম (১৮৮২-১৯৩৬), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), ইকরামুদ্দীন (১৮৮২-১৯৩৫), শাহাদৎ হোসেন(১৮৯৩-১৯৫৩), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), শেখ মুহম্মদ ইদরিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫), খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ (১৮৭৮-১৯৬৫), মোহাম্মদ হেদায়েৎ উল্লাহ (১৮৮০-১৯৪৬), সয়্যিদ ইমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬), ফজলুর রহীম চৌধুরী (১৮৯০-১৯৩৩) মৌলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ (১৮৮৩-

১৯৬৮), ডক্টর মুম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মিসেস এম. রহমান, নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯৪-১৯৭৫), মুহম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৫৮-১৯৩০), শেখ আবদুল জব্বার, মুহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৬-১৯৭৬), কাজী আকরম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬৩), শেখ হবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬১), ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৮), মাহবুব উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১), কবি জসীম উদ্দীন (১৯০২-১৯৭৭) প্রমুখ।

এসব সাহিত্যিকগণ তাদের রচনায় বাঙালী মুসলমানের জীবন চিত্র, সমস্যা ও সম্ভাবনাকে তুলে এনেছেন। এ সময় নারী ও শিশু সাহিত্যের আবির্ভাব আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নতুনত্ব এনে দেয়। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী সমাজের মুক্তির বার্তা নিয়ে সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন। তাঁর রচনায় বাংলার নারী সমাজের দুর্দশার নানা চিত্র ভেসে ওঠে। মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ এ সময়ই প্রকট হয়ে ওঠে। তবে এ সময়ে কবি কাজী নজরুলের আবির্ভাব সাহিত্যাঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

কাজী নজরবল ইসলামের আবির্ভাব ও বাংলা সাহিত্যঃ

কাজী নজরবল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৭) বাংলা সাহিত্যের 'যুগ-প্রবর্তক' কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে চির ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সাহিত্যাঙ্গনে রবীন্দ্রনাথ একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা 'রবীন্দ্রযুগ' নামে আখ্যা পেয়েছে। নজরুলের আগমনে শুধু মুসলিম সাহিত্য নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরে যায়। রবীন্দ্রনাথের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবের বাইরে গিয়ে সাহিত্য রচনা বাঙালীর কল্পনাতীত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। নজরুল সেই চিরন্তনী বিশ্বাসে ভাঙন এনেছিলেন । তাঁর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রযুগের অবসান ঘটে এবং নতুন যুগের সূচনা

হয়। সামান্য শিক্ষা নিয়ে তিনি ভাষা ও সাহিত্যে আলোড়ন তুলেছিলেন। শতাব্দীব্যাপী অত্যাচার নিপীড়নে বাঙালী মুসলিম হৃদয়ে নিরবে নিভৃতে প্রতিবাদের যে উনুন চাপা পড়ে ছিল, নজরুল এসে তাতে নিমিষে বিদ্রোহীর দাবানল জ্বেলে দিলেন। তিনি ১৯১৮ সালে প্রথম 'বিদ্রোহী' নামক কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। এই একটি মাত্র কবিতার মধ্য দিয়েই নজরৰল রবীন্দ্রনাথের পাশে একটি স্বতন্ত্র আসন তৈরী করে নেন। মুহম্মদ এনামুল হকের ভাষায়– "রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতার মৃদু মধুর গুঞ্জন ধ্বনিতে মুখরিত বাংলায় নজরৰল ইসলাম যখন অদ্ভুত জোরালো ভাব ও ভাষায় 'বিদ্রোহী' প্রকাশ করিলেন, তখন মহাযুদ্ধের দূরাগত কামান গর্জনের ন্যায় যে গম্ভীর নিনাদ শ্রৰত হইল, তাহাতে ভাববিহ্বল বঙ্গ সচকিত চিত্তে বুঝিল ও বিস্মিত নয়নে দেখিল যে, বাংলা সাহিত্যাকাশে হঠাৎ একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটিয়াছে।"[৩৩]

মুসলিমদের বিলম্বে আধুনিক সাহিত্য জগতে প্রবেশের কারণে যে ঘাটতি তৈরী হয়ে ছিল তা তিনি মূহুর্তে পূর্ণ করে দিলেন। মাত্র ২০ বছরের সাহিত্য সাধনায় সাহিত্যের প্রায় সব অঙ্গনে সরব পদচারণা রেখে গেছেন। নির্জীব নিস্তেজ জাতির বুকে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ জ্বেলে দিয়ে গেছেন। আরবী, ফার্সি, উর্দু শব্দের ব্যবহারযোগে ঐতিহ্যবাহী বাঙালী মুসলিম সাহিত্যের ধারাকে শক্তিশালী করেছেন। এ কারণে আজও বাঙালী মুসলিমের 'জাতীয় কবি' হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছেন। তাঁর বিশাল বিস্তৃত রচনাবলীর আলোচনা ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তবে তাঁর উলেৱখযোগ্য কিছু রচনাবলীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল:

- কাব্য : 'অগ্নিবীণা' (প্রথম কাব্য), 'বিষের বাঁশী', 'দোলন চাঁপা', 'ফণি-মনসা', 'ভাঙ্গার-গান', 'ছায়ানট', 'সর্বহারা', 'সাম্যবাদী', 'চিত্তনামা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চোখের চাতক', 'চক্রবাক', 'জিঞ্জীর', 'ঝিঙ্গে ফুল', 'সন্ধা', 'চন্দ্র বিন্দু', 'নতুন চাঁদ', 'মরৰ-ভাস্কর' প্রভৃতি। 'ব্যাথার দান' ও 'রিক্তের বেদন' তাঁর রচিত দুটি গদ্যকাব্য।

- ❑ উপন্যাস: 'মৃত্যু-ক্ষুধা', 'বাঁধনহারা' ও 'কুহেলিকা'।
- ❑ নাটক: 'আলেয়া' ও 'ঝিলিমিলি' ।

এছাড়া তিনি অসংখ্য কবিতা, গান, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, অনুবাদ, ইসলামী সঙ্গীত, হিন্দুয়ানী গান, বৈষ্ণব-পদ, সূফী-গজল, আরবী-কাসীদা, শিশু সাহিত্য, ব্যঙ্গ-রচনা প্রভৃতি অসংখ্য রকম রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাংলা সাহিত্যে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করে গেছেন। এছাড়া এসময়ে আরও অসংখ্য কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেৰিতে বৃটিশ বাংলায় বাংলা সাহিত্যের রূপান্তরের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক উঠে আসে তা হচ্ছে-

এক. পলাশী পরবর্তী একশ বছর বাঙালী মুসলিম সাহিতিকগণ মধ্যযুগীয় মোগল ভাবধারায় সাহিত্য রচনা করেছেন। এসময়ে ধর্মীয় ভাবধারা ও অতীত ঐতিহ্যকে পুঁজি করে সাহিত্য রচিত হয়েছে। ঐ সময়ের রচনায় রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। তবে জাতির দুর্দিনেও কিছু ব্যক্তি সাহিত্য চর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছেন এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এসময় বাংলা সাহিত্য নিম্ন শ্রেণীর বাঙালী মুসলিমরা চর্চা করেছে। বটতলার পুঁথির পাঠক ছিল সাধারণ মানুষ। উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমগণ তখন বাংলা ভাষার চর্চায় দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন।

দুই. সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে বাঙালী মুসলিমগণ আধুনিক ধারায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। সামর্থ ও সুযোগের অভাবে সাহিত্যিকগণ উচ্চশিক্ষিত হতে পারেননি। গুটি কয়েক সাহিত্যিক উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। এরপরও তারা সমাজ ও জাতির উন্নয়নের চেষ্টা

করেছেন। হিন্দু সাহিত্যিকদের সংস্কৃত ভিত্তিক সাহিত্য চর্চার জোয়ারেও মুসলিম সাহিত্যিকগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন।

তিন. পরবর্তী পর্যায়ে আধুনিক মুসলিম বাঙালী সাহিত্যকদের মধ্যে সমাজ ও রাজনীতি সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় এবং তারা মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে জাতিকে জাগ্রত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। সরকার বিরোধী প্রচার-প্রচারণার অভিযোগে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু তত দিনে পশ্চাৎপদ বাঙালী মুসলিম সমাজ জেগে উঠেছে এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলিম ভাবধারা দিনে দিনে বিকশিত হয়েছে।

নগর ব্যবস্থাপনা ও মুসলিম স্থাপত্যের বিনাশঃ

মুসলিম আমলে ব্যবসায়, বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কারণে নগরায়ণের বিকাশ ঘটেছিল। ধর্মীয় কারণেও মুসলমানরা যেখানেই বসতি স্থাপন করেছে সেখানেই নিজেদের উদ্যোগেই মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব ও ইমারত নির্মাণ করেছে। 'পূর্ব বাংলা' মুসলমানদের প্রচেষ্টাতেই আবাদযোগ্য হয়ে উঠেছিল। উইলিয়াম হান্টার মন্তব্য করেছেন –"The Musalmans led several of these great land reclamation colonies to the southward, and have left their names in Eastern Bengal as the first divider of the water from the land. The sportsman comes across their dykes, and metalled roads, and mosques, and tanks, and tombs, in the loneliest recesses of the jungle......."[৩৪]

৩৪। W.W. Hunter, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৭।

মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পতনে তাদের গড়া নগরী, প্রাসাদরাজিও ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কেন্দ্রিক কলকাতা নগরীর উত্থান পূর্ব বাংলার নগরসমূহের প্রাধান্য বিলুপ্ত করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নগরী, সুলতানী ও মোগল বাংলার সমৃদ্ধশালী রাজধানী 'ঢাকা' কোম্পানি শাসনামলে এসে পূর্বের জৌলুস হারিয়ে মৃত প্রায় নগরীতে পরিণত হয়। ১৮১৭ সালের মধ্যে ঢাকার শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দারিদ্র্য ও জনসংখ্যা হ্রাস পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। জেমস টেলরের বর্ণনা থেকে জানা যায়—১৮৮০ সালে ঢাকার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ২,০০,০০০ কিন্তু ১৮৩৮ সালে লোক গণনা অনুসারে তাদের সংখ্যা ৬৮,০৩৮ জনে পৌঁছায়। ট্যাক্সের পরিমাণও কমে যায়। ১৮১৪ থেকে ১৮৩৮ সালের ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ ৩১,৫০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকায় নেমে আসে।[৩৫]

শহরের দুরাবস্থার বর্ণনা দিয়ে টেলর লিখেছেন, "বহু সংখ্যক বাড়ি ঘর শূন্য অথবা ধবংসাবস্থায় পড়ে আছে। নর্দমা, সরু গলিপথ ও সেতুগুলো অর্থের অভাবে সংস্কার না হওয়ায় অবহেলিত হয়ে রয়েছে। শহরতলীসমূহ বর্তমানে জঙ্গলাকীর্ন, অপরদিকে, শহরের অভ্যন্তর ভাগে পরিত্যক্ত মরা জীবজন্তু ও শাক-সবজি এবং নানাবিধ ময়লা আবর্জনায় বহু অবরুদ্ধ খাল-নালা ও গর্ত পূর্ণ হয়ে আছে। এতে পার্শ্ববর্তী কুপগুলোর পানি দূষিত হয়ে পড়েছে। প্রতি বছর ম্যালেরিয়া রোগের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এবং এভাবে সৃষ্ট বিষাক্ত আবহাওয়ায় বহু সংখ্যক লোক রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। সর্বত্র হতভাগ্য অসহায় লোকদের ভীড়, চরম বিপর্যস্ত ও দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধিগ্রস্থ এবং বিকলাঙ্গদেরকে আমরা দেখে থাকি, এরা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে তাদের অনিশ্চিত আহার্যের সন্ধান করে থাকে।"[৩৬]

৩৫। জেমস টেলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, পৃঃ ২৯৬।
৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ-২৯২।

শহরের উন্নতি ও জনহিতকর কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য মাসিক ১৬০০ টাকার অর্থ মঞ্জুরী ১৯২৯ সালে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বাৎসরিক ২০০০ টাকা প্রধান প্রধান সড়ক ও বাজারগুলো ঝাড়ু দেয়ার প্রয়োজনে সামান্য কয়েকটি গরুর গাড়ি ও কিছু সংখ্যক ঝাড়ুদার রাখার জন্য বরাদ্দ করা হয়। তবে টেলর মি: মিডফোর্ড, মি: ডাউরেস ও মি: ওয়াল্টারের উদ্যোগে জনহিতকর কার্যাবলীর প্রশংসা করে পৌর উন্নয়নের উদ্যোগ বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন।[৩৭]

Hunter এর বিবরণেও বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের জীর্ণদশার চিত্র উঠে এসেছে-

“indeed, the remains of a once powerful and graspring Musalman aristocracy dot the whole province, visible monuments of their departed greatness. At Murshidabad a Muhammadan Court still plays its farce of mimic state, and in every District the descendant of some line of princes sullenly and proudly eats his heart out among roofless palaces and weed- choked tanks.”[৩৮]

Hunter ব্যক্তিগতভাবে নগর নামক একটি অঞ্চলের রাজবাড়ী পরিদর্শন করেছেন। নগরের রাজাগণ অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা প্রাসাদের গম্বুজ শোভিত দরবারে বসে ইংল্যান্ডের দুটো জেলার সমান বিরাট এলাকার ওপর শাসন চালাতেন। এই রাজাবাড়ীটি কৃত্রিম হ্রদ, হ্রদের মাঝখানে বাগিচা শোভিত একখণ্ড দ্বীপ, মসজিদ, প্রমোদ বাংলো, রাজপ্রাসাদ, বিরাট আকৃতির ফটক সম্বলিত দূর্গপ্রাকার দ্বারা সজ্জিত ছিল। কিন্তু Hunter সাহেব সেখানে যেয়ে ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছু পান নি। তিনি লিখিছেন–

৩৭। পূর্বোক্ত, পৃ-২৯২।
৩৮। W.W. Hunter, প্রাগুক্ত, P-139.

"Of the citadel nothing now remains but the massive entrance. From the roofless walls of the mosques the last stucco ornament has long since tumbled down. The broad gardens with their trim canals have returned to jungle or been converted into rice-fields. Their well-stocked fish ponds are dank, filthy, hollows. The sites of the summer pavillions are markeed by mounds of brick-dust, with here and there a fragmentary wall, whose slightly arched Moorish window looks down desolately upon the sccene. But most melancholy of all is the ancient Roal Lake. The palace rises from its margin, not as of old, a fairy pillared edifice, but a dungeon-looking building, whose weather-stained walls form a fitting continuation to the green scum which patrefies on the water below."[৩৯]

শরীফউদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেছেন, "ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকায় সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর শহরটি কয়েক দশকের মধ্যেই বিস্ময়করভাবে একটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়, যা পরিলক্ষিত হয় জঙ্গল ঝোপে ছেয়ে যাওয়া এর মুগল রাজপ্রাসাদ, বৃহৎ সেতু, সমাধিস্তম্ভ এবং মসজিদের ধ্বংসাবশেষে।"[৪০]

চল্লিশের দশকে মোগল স্থাপত্যের সবচেয়ে সুন্দর নিদর্শন পরিবিবির সমাধি স্তম্ভ সংস্কারের অভাবে ধ্বংস হতে বসে এবং ঢাকেশ্বরী মন্দির অবহেলিত অবস্থায় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে।[৪১]

৩৯। W.W. Hunter, প্রাগুক্ত, P-140.

৪০। শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা-ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ধানমন্ডি, ঢাকা, ২০০১, পৃ-১৬৮।

৪১। শরীফ উদ্দিন আহমেদ, পূর্বোক্ত পৃ-১৬৮।

১৮৪০ সালের পর থেকে শহর সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়, তবে তা খুব বেশী ফলপ্রসূ হয়নি। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহর এক রকম অবহেলিত অবস্থায়ই পড়ে থাকে এবং পূর্ব বাংলা একটা খামার বাড়িতে পরিণত হয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে নতুন প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদায় ফিরে এসে 'ঢাকা' আবার উন্নয়নের ধারায় ফিরে আসে। এসময় বেশ কিছু প্রশাসনিক ভবন নির্মিত হয়।

হাইকোর্ট মাজার সংলগ্ন গভর্নর হাউস, রমনা এলাকায় সরকারি ভবনাদি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সেক্রেটারিয়েট, বর্ধমান হাউস, হুদা হাউস, কাকরাইল ও বেইলী রোড এলাকার সার্কিট হাউসসহ তখনকার প্রতিষ্ঠিত বহু ভবন বর্তমানে মন্ত্রীপাড়া, বাংলা একাডেমী, সিরডাপ মিলনায়তন এবং সরকারী বিভিন্ন ভবনরূপে ব্যবহার হচ্ছে।[৪২]

কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে ঢাকা নগরীর উন্নয়ন প্রচেষ্টা আবার থমকে দাঁড়ায়। তবে আঞ্চলিক প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে একটা মর্যাদা ধরে রাখে। এসময় ঢাকা কেন্দ্রীক পূর্ববাংলার মুসলিমদের জাগরণ ও ঢাকার নবাবদের প্রচেষ্টায় ঢাকা আবার আবাদ হতে থাকে এবং ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নগরীর মর্যাদা আরও বেড়ে যায়। পরবর্তিতে ৪৭ এর দেশ ভাগ এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীর মর্যাদায় 'ঢাকা' তার হারানো গৌরব ফিরে পায়। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পর 'ঢাকা' আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে জনবহুল এবং বাংলার প্রধান নগরীতে পরিণত হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবক্ষয়:

ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়নের শিকার বাংলার মানুষ মুসলিমদেরকে যে মুক্তিদূত হিসেবে গ্রহণ করেছিল তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। পূর্ব বাংলার সাধারণ শ্রেণীর অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। তবে ক্ষমতাচ্যুত অভিজাত শ্রেণী ও ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কিছু

৪২। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ*, পৃ-১৮৯।

অংশ মুসলিমদের সংস্পর্শে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেও বড় অংশটি বাইরে রয়ে যায়। তবে মুসলিম শাসনের প্রতি তাদের বৈরী মনোভাব থাকলেও প্রকাশ্য বিরোধিতায় জড়ায়নি। যুগ বাস্তবতায় মুসলিম শাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা অংশগ্রহণ করেছে, সহযোগিতা করেছে।

মুসলিমরাও বাংলায় উদার নৈতিক নীতি গ্রহণ করেছে; বিজিত পক্ষকে উৎপীড়ন বা নিঃশেষ করে দেয়ার নীতি তারা গ্রহণ করেনি। স্পেনে মুসলিমরা পরাজিত হওয়ার পর যে ভাবে নিপীড়িত হয়েছে, সে তুলনায় বাংলায় বিপরীত নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলিম শাসনামলে নবদ্বীপ কেন্দ্রিক সংস্কৃত ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চর্চা প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও তা পূর্বের মত রাজকীয় আনুকূল্য পায়নি তবে সীমিত পরিসরে হলেও মুসলিম রাজদরবারে সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়েছে। পুরো সুলতানী ও মোগল আমলব্যাপী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অপূর্ব নজীর লক্ষ্য করা যায়। সুলতান বা নবাবগণ সকল প্রজার অভিভাবক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রাজধর্ম হিসেবে ইসলাম অধিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও ধর্মীয় কারণে অমুসলিম প্রজা সাধারণ রাষ্ট্রকর্তৃক নিপীড়নের স্বীকার হয়েছে- এ দৃষ্টান্ত বাংলায় বিরল। মুসলিম শাসন এখানে জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সুলতানী আমলের শেষ ভাগে এসে হিন্দু ভূস্বামীদের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। 'বারো ভূঁইয়া' নামে পরিচিত হিন্দু মুসলিম ভুস্বামীগণ একজোট হয়েই মোগল আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নবাবী আমলে প্রশাসন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সমাজ-রাজনীতির বিভিন্ন স্তরে হিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠত হয়েছিল। শুধু রাজনীতির অঙ্গন নয়, সমাজ-সংস্কৃতির নানা অঙ্গনেও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তখনও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। হিন্দু মুসলিম সাহিত্যকদের স্ব স্ব অঙ্গনে অবাধ সাহিত্য চর্চা এবং একে অন্যের ভাবধারায় প্রভাবিত হওয়ার দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। কিন্তু নবাবী আমলের শেষ দিকে এসে হিন্দু অভিজাত শ্রেণী বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করে। তাদের মধ্যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার অভিলাষ সৃষ্টি হয়। এ সময়

Dhaka University Institutional Repository

থেকে মুসলিম বিরোধী বৈরী মনোভাব প্রচারের সূচনা হয়। সুচতুর ইংরেজরাও এই মানসিকতা বুঝতে পেরে হিন্দুদের সাথে নিয়ে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়।

পলাশীর ট্রাজেডীর পরে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে মুসলিম বিরোধী প্রচারণার ধারা জোরদার হয়ে ওঠে। নবাবদের চরিত্র হনন করে ইতিহাসে বিকৃতভাবে তাদের চিত্রিত করা হয়। ইংরেজ শক্তি তাদের সীমিত সম্বল নিয়ে বিশাল সাম্রাজ্যে টিকে থাকার জন্য নানা কূটনীতির আশ্রয় নেয়। সদ্য ক্ষমতাচ্যুত মুসলিম শক্তি যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্য ইংরেজগণ তাদের শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম অবদমন নীতি গ্রহণ করেন এবং মুসলিমদের Counter part হিসেবে হিন্দুদের দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার হিন্দু বাবু শ্রেণীটি যখন বেশ শক্ত সামর্থ্যবান হয়ে ওঠে এবং উল্টো তাদের সাথে দর কষাকষি শুরু করে তখন তারা মুসলিম তোষণ নীতি চালু করে। এজন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন-

“রোমীয় ব্যবস্থা শাস্ত্র এবং রাজনীতি শাস্ত্র সমন্ধে শ্রদ্ধাবান অনেক ইংরেজ রাজ পুরুষই ‘প্রজায় প্রজায় মনের মিল’ না হতে দেওয়াই বিজয়লব্ধ রাজ্য পালনের বিধি হিসেবে গ্রহণ করেছেন; ইহারা সর্বদাই হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যাহাতে সম্মিলন না হইতে পারে তাহার জন্য যত্ন করেন। কৌশল করিয়া কখন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর একটু অধিক আদর করেন এবং যখন হিন্দু সেই আদরে ভুলিয়া যায়, তখনই আবার মুসলমানদের দিকে বিলক্ষণ ঝোঁক দেন”।[৪৩]

এ কারণে বৃটিশ শাসনামলে হিন্দু মুসলিমের পারস্পরিক দূরূত্ব বাড়তে থাকে। অথচ তারা সুদীর্ঘ কালব্যাপী দুটি বিপরীতমুখী আদর্শের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও সম্প্রীতির অনন্য নজীর স্থাপন করেছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একে অন্যের ধর্মাচরণ নিয়ে একটু আধটু কটুক্তি করলেও তা হানাহানির পর্যায়ে পৌঁছেনি। বৃটিশ শাসনের প্রথম পর্যায়েও এই সম্প্রীতি বজায়

৪৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সামাজিক প্রসঙ্গ, প্রথম অধ্যায়; ড. পঞ্চানন সাহা , *হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক নতুন ভাবনা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, পৃ-১১৪৫।

ছিল। বাংলার সমাজ সংস্কৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে আসা ইংরেজ সার্জন জেমস টেলর এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

“হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা বিরল। উভয় শ্রেণী সম্পূর্ণ শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করছেন এবং দুটো সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি এতদূর পর্যন্ত সংস্কারমুক্ত হয়েছেন যে তারা একই হুকা থেকে ধুমপান পর্যন্ত করে থাকেন” ।[৪৪]

কিন্তু বৃটিশ বিভেদ নীতিতে ক্রমে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জোরালো হতে থাকে। বৃটিশ শাসনে দু’সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ব্যবধান, শিক্ষাগত বৈষম্য তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি শ্রেণীতে পরিণত করে। এম.এম. আকাশ মনে করেন, এই ভাবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নিচু তলা ও উপর তলায় বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত যত বিকশিত হতে থাকল ততই তারা প্রাগ্রসর বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হতে লাগল। অনুপস্থিত বাঙালী হিন্দু ভুস্বামীদের প্রতি মুসলিম কৃষকদের যে সুপ্ত ক্রোধ ছিল তার সঙ্গে যুক্ত হল শহরাঞ্চলের বিভিন্ন পেশা, চাকরি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে সৃষ্ট নানান নতুন দ্বন্দ্ব। ফলে বাঙালী শ্রমিক বা কৃষকের মধ্যে নয়, বরং বাঙালী মধ্যবিত্তের এই প্রতিযোগী সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারও সুত্রপাত হয়।[৪৫] শুধু অর্থনৈতিক অঙ্গন নয়, সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও মারাত্মকভাবে সাম্প্রাদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে কলুষিত করার কাজটি ইংরেজরাই শুরু করেছে। এরপর সেখানে ইন্ধন যুগিয়েছে তাদের প্রথম ও প্রধান সহযোগী হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধ্বজাধারী গোষ্ঠী। আর একে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে সমকালীন পরিস্থিতিতে সৃষ্ট উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী শ্রেণীটি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-

“হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ভেদ রক্ষা করিবার এবং তাহা বর্ধিত করিবার অপর একটি প্রবলতর কারণ উপস্থিত হইয়া আছে। অনেক ইংরাজ গ্রন্থকার কখন স্পষ্টাক্ষরে কখনো

৪৪। জেমস টেলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনুদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৭৮, পৃ-২০১।

৪৫। এম.এম. আকাশ, *ভাষা আন্দোলন : শ্রেণী ভিত্তিক ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমুহ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইঙ্গিতক্রমে, অনুক্ষণই বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানেরা যখন দেশের রাজা ছিল, তখন হিন্দুদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার সমস্ত করিয়াছিল। ইংরাজ গ্রন্থকারেরা এই রূপে হিন্দুদিগের মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটি গূঢ় বিদ্বেষ বীজ বপন করিয়া দিতেছেন।"[৪৬]

এ সময় একদল ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ বা ভারতবিদ্যা বিশারদের আবির্ভাব হয়। উইলিয়াম জোন্স, স্যার উইলকিন্স, হেনরি টমাস, কোলব্রুক, হোরেস হেম্যান উইলসন, ফ্রাঞ্জ বোপ, ইউজিন বুর্নুফ, স্যার-আলেকজান্ডার কানিংহাম, যোহান গেআর্গ ব্যুলার, মনিয়ার উইলিয়াম, আলব্রেখট ভেবর, এডোয়ার্ড বাইলস কাউয়েল, উইলিয়াম ডুইটে হুইটনি, জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন, ফ্রেডরিখ উইলিয়াম টমাস, আর্থার ব্যারিডেল কিথসহ বহু ইংরেজ লেখক ও পন্ডিত সংস্কৃত ভাষা চর্চার সাথে সাথে ভারতের পুরাতত্ত্ব, হিন্দুপুরাণ, হিন্দু দর্শন, হিন্দু ঐতিহ্য ও হিন্দু ইতিহাস বিষয়ে চর্চা ও গবেষণা শুরু করেন।

এ সময় মুসলিম শাসনামলকে নিপীড়নমূলক রূপে তুলে ধরা এবং হিন্দু অতীতকে বীরোচিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকগণ অনেক বই লেখেন। সেগুলির মধ্যে কানিংহামের 'হিস্ট্রি অব শিখ্‌স', ডাফ এর 'হিস্ট্রি অব মারাঠাজ' এবং টড এর 'অ্যানালস এ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ অব রাজস্থান' বিশেষভাবে উলেৱখযোগ্য।[৪৭]

এসব প্রচার প্রচারণার দ্বারা হিন্দু সমাজে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'সংবাদ প্রভাকরে'র ১৮৫৭ সালের ২০সে জুন একটি লেখায়-

---

৪৬। [illegible] মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, [illegible] প্রাগুক্ত, পৃ-১২৯।
৪৭। মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৪।

যবনাধিকারে আমরা ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই নাই; সর্বদাই অত্যাচার ঘটনা হইত। মহরমের সময় সকল হিন্দুকে গলায় 'বদি' অর্থাৎ যাবনিক র্ধমসূচক একটা সূত্র বাধিয়া র্দগায় যাইতে হইত, গমি অর্থাৎ নীরব থাকিয়া 'হাঁসান' 'হোঁসেনের' মৃত্যু জন্য শোক চিহ্ন প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করিতে হইত। কাছা খুলিয়া কুর্ণিস 'মোর্চ্চে' নামক গান করিতে হইত। তা না হইলে শোণিতের সমুদ্র প্রবাহিত হইত। এক্ষণে ইংরেজাধিকারে এই মনস্তাপ একালেই নিবারিত হইয়াছে, আমরা অনায়াসেই "চর্চ্চ" নামক খ্রিষ্টীয় ভজনামন্দিরের সুম্মুখেই গভীর স্বরে ঢাক, ঢোল, তাড়া, তাসা, নহবৎ , সানাই, তুরী ভেরী, বাদ্য করিতেছি; ছ্যাড়াং শব্দে বলিদান করিতেছি, নৃত্য করিতেছি, গান করিতেছি, প্রজাপালক রাজা তাহাতে বিরক্ত মাত্র না হইয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। এই কল্পে ছোট বড় সকলকে সমভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিতেছে।"[৪৮]

শুধু প্রভাকর নয় সর্বশুভকরী, সোম প্রকাশ, ঢাকা প্রকাশ, হিন্দুরঞ্জিকা, প্রভৃতি পত্রিকায় চরম উৎসাহের সাথে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানো হয়। ঐতিহাসিক রামগোপাল মন্তব্য করেছেন-

"উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গের সংবাদপত্রসমূহে এবং বিশিষ্ট হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে মুসলমান শাসনের প্রতি তীব্র নিন্দা বর্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক একরকম সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। দেশ যে সমস্ত সমস্যার দ্বারা পীড়িত ছিল তার প্রায় সবগুলির জন্য মুসলিম শাসনকে দায়ী করা হয়। হিন্দুরা নতুন ব্যবস্থার দ্বারা সর্বাধিক লাভান্বিত হন। উচ্চ-শ্রেণীর মুসলমানদের মনে হিন্দুদের সম্বন্ধে একটি অনীহার ভাব সৃষ্টি হয় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুরাও মুসলমানদের সম্বন্ধে বীতস্পৃহ বোধ করেন।"[৪৯]

৪৮। ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩০।
৪৯। পূর্বোক্ত, পৃ-১৩০।

আবির্ভাব হয়। ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নবীন সেন, দীনেশচরণ বসু, যোগীন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ তাদের রচনায় মুসলিম বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেন। হেমচন্দ্রের

'বীরবাহু' 'দশমহাবিদ্যা' ও 'বৃত্রসংহার কাব্য', বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী' ও 'সীতারাম', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'অভিমন্যু বধ', 'সংকরাচার্য', নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' প্রভৃতি রচনায় মুসলিম জীবনচিত্র, মুসলিম চরিত্র ও মুসলিম প্রসঙ্গ ভেদবুদ্ধির স্বীকার হয়ে সাহিত্যাঙ্গনকে কলুষিত করে।

মুসলিমগণও এসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বলা হয়-

"বঙ্গভাষায় ইংরেজী আমল হইতে হিন্দুগণ, যে প্রকার অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়নের হস্ত বিস্তার এবং ঘোর অবজ্ঞেয় গ্লানি কুৎসা ও কলঙ্কজনক অলীক অশ্লীল ভাষিনী হলাহল নিস্যন্দিনী রসনা এবং লেখনীর পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাহাতে দু:খ সন্তপ্ত নিরীহ মুসলমানগণের কোমল প্রাণ বিদ্বেষের বিষদিশ দীপ্ত ত্রিশূলাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে।.....কবি ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেম ও নবীনচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য হারান, নারান, মধু, যদু, চনীরাম, পুঁটীরাম, পাঁচুরাম পর্যন্ত সকলেই মুসলমান জাতিকে পৈচাশিক গালাগালি দিতে এবং তাঁহাদের গৌরবান্বিত পূর্ব পুরুষগণকে কুৎসিৎ চিত্রে অঙ্কিত করিতে কিছুমাত্র কসুর করিতেছেন না।"[৫০]

হিন্দু সাহিত্যিকদের সাম্প্রদায়িক বিষেদাগারের জবাবে মুসলিম সাহিত্যিকগণও এগিয়ে আসেন। মারাঠা বিদ্রোহী শিবাজীকে জাতীয় বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তিলক ১৮৯৫ সালে শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করলে কায়কোবাদ রচনা করেন 'অশ্রুমালা'। রবীন্দ্রনাথের হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী 'কথা ও কাহিনী' প্রকাশের পর পরই ওসমান আলীর 'দেবলা কাক' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতা প্রকাশের বছরই প্রকাশিত হয় ওসমান আলীর 'আলোক সভা' ও কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শিবাজী উৎসব'

৫০। উদ্ধৃত: ড. পঞ্চানন সাহা, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৩।

৫০। উদ্ধৃত: ড. পঞ্চানন সাহা, পূর্বোক্ত,পৃ-১৩৩।

কবিতায় যখন বলেছেন, 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খন্ড ছিন্ন বিক্ষত ভারত বেঁধে দিব আমি' তখন মহাশ্মশান কাব্যে কায়কোবাদ উচ্চারণ করেছেন, 'কোন জন্মে ভারতের রাজা ছিল তারা? স্মরিলেও ঘৃণা হয় মনে। আম্বরের সেনাপতি যদুর অধীনে সামান্য বেতনভোগী মালজী ভোসলা, তারই পুত্র কাপুরুষ সাহুজী তস্কর, সেই শিবাজীর পিতা, তারি বংশধর মহারাষ্ট্র অধিপতি, তারই দাসাধম ঘৃণিত পেশবা...... ।"[৫১]

সাহিত্যাঙ্গনে এভাবে বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চার স্থান দখল করে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মন্তব্য করেন, "বাংলার হিন্দু লেখকরা.....(সাম্প্রাদায়িকতার) সূত্রপাত করেন। তারপর মুসলমান লেখকরা গালির বদলে গালি দিতে শুরু করেন।"[৫২]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন, যা স্বদেশী আন্দোলন নামে ছড়িয়ে পড়ে, তাতে বাংলার সাম্প্রদায়িক বিরোধ সংঘাতে পরিণত হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে উপকৃত হয়, যদিও সিংহভাগ সুফল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরাই ভোগ করে। অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হয় কলকাতাস্থ বর্ণবাদী হিন্দু জমিদার গোষ্ঠী,আইনজীবী, ব্যবসায়ী, পত্রিকার প্রকাশক ও রাজনীতিবীদগণ, যারা পূব বাংলাকে খামার বাড়ি, কাঁচামালের উৎস, ব্যবসা পণ্যের বাজার রূপে ব্যবহার করতেন। ফলে বিপরীতমুখী দুটি শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত ধর্মীয় পরিচয়ের আবর্তে সাম্প্রদায়িক সংঘাতে রূপ নেয়। স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনায় 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর' প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের জন্ম হয়, যে সব সংগঠন চরিত্রে ছিল হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির ধ্বজাধারী। এ কারণে স্বদেশী আন্দোলন মুসলিম জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেনি। বিমলানন্দ শাসমল তাঁর 'ভারত কি করে ভাগ হল' শীর্ষক বইতে লিখেছেন-

৫১।মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত,পৃ-১২১।
৫২। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, আমাদের সমস্যা*, রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স, ১৯৪৯,পৃ-২৩-২৪।

"বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল সন্দেহাতীত ভাবে মুসলমান বিরোধী এবং গভীরভাবে মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী। এই আন্দোলনের তাগিদে যে সকল সন্ত্রাসবাদী নেতা কর্মক্ষেত্রে প্রকাশিত হলেন, তারা সকলেই ছিলেন গভীরভাবে মুসলমান বিরোধী"।[৫৩]

স্বদেশী আন্দোলনের সাথে রাখি বন্ধন, কালি মন্দিরে শপথ গ্রহণ, বন্দে মাতরম শ্লোগান এবং এমনি অসংখ্য হিন্দু আচার জুড়ে দেয়া হয়। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের দারুন অবনতি ঘটানো হয়। সর্বত্র বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়ে, স্কুলে হিন্দু ছাত্ররা সহপাঠী মুসলিম ছাত্রদের সাথে একত্রে বসতে অস্বীকার করে- তাদের মুখে নাকি 'পেঁয়াজের গন্ধ'। ক্লাসে মুসলমান ছাত্রদের জন্য পৃথক শাখার ব্যবস্থা করতে হয়।[৫৪]

হিন্দুদের মুসলিম বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় মুসলিমরা তাদের সব রকম সম্ভাবনার পথে হিন্দুদেরকেই বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সকল আস্থাবোধের অবসান ঘটে। মুসলিমদের স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের অধিকার সংক্রান্ত চিন্তা থেকে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এসময় কংগ্রেসে চরমপন্থী তিলকের নেতৃত্ব গ্রহণ পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘটনায় বাংলায় মুসলিমগণ পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েন। এর অব্যবহিত পরেই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও পূর্ববংলার মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবচেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে ব্যাহত করার জন্য সর্বরকম প্রচেষ্টা চালান। ১৯১৭ সালের ১৫ নভেম্বর স্যাডলার কমিশনের কাছে লেখা এক প্রতিবেদনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরবদ্ধে নানা আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন যে-

---

৫৩। মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৫
৫৪। নিরোদ চন্দ্র চৌধুরী, *অটো বায়োগ্রাফী অব এন আননোন ইন্ডিয়ান*, পৃ-২৩৭; আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহলে কি কলকাতা মারাত্মক ভাবে বঞ্চিত হবে না? যদি না হয়, তাহলে কে অগ্রাধিকার পাবে? ঢাকার জন্য আমরা যাই করি না কেন, বাংলায় কলকাতার স্থান সর্বাগ্রে এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। কাজেই এ ধরণের একটি উন্নত শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেয়া একটি মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ হবে।”[৫৫]

এমন কি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও বিশ্ব কবি রবি ঠাকুরের মত ব্যক্তিবর্গও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা আক্রান্ত হন। ‘পূর্ব বাংলার চাষাদের জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই’, ‘মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়’,‘ফাক্কা বিশ্ববিদ্যালয়’-এসব বলে উপহাস ও কটাক্ষ করা হয়।[৫৬] এভাবে সুদীর্ঘ কালব্যাপী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য নিয়ে একীভূত বাংলায় বসবাসকারী দুটি জাতির মধ্যে স্বার্থবোধের পার্থক্য ও চিন্তার পার্থক্য ধর্মীয় বিভাজনে রূপ নেয়, যার প্রকাশ ঘটে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি শেরে বাংলার লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে; এর চুড়ান্ত পরিণতি ঘটে ৪৭ এর দেশ ভাগের মধ্যে দিয়ে।

হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূল উস্কানিদাতা যে বৃটিশ শক্তি এবং তাদের Divide and Rule Policy সে বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। তবে হিন্দু মুসলিম শক্তি নিজেরাও কম দায়ী ছিলেন না। উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তার লালন শুভ বুদ্ধির অবসান ঘটিয়েছে। পলাশী পরবর্তী হিন্দু স্বার্থান্বেসী গোষ্ঠী ইংরেজদের সহযোগিতায় অতি উৎসাহী ভাব দেখিয়েছে; দীর্ঘ দিনের সহচর সুখ ও দুঃখের ভাগীদার মুসলিমদের দোষ ত্রুটির বিপরীতে যে অসংখ্য অবদান ছিল তা বিবেচনায় আনে নি। হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিপরীতে মুসলিম জাতীয়বাদের উত্থান ঘটেছে। গান্ধীর ওকালতি প্রাণ দিয়েই দেয়া হয়েছে। হিন্দু যে তারই প্রতিবেশী, বিপদ আপদের সাথী তা তাদের চিন্তায় আসে নি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কূটকৌশলকে সনাক্ত করে নিজেদের মধ্যে সমঝোতার উদ্যোগ কমই নেয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন, “তৃতীয় পক্ষ

৫৫. জাহেদা আহমদ, রাষ্ট্র ও শিক্ষা (প্রবন্ধ), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, সম্পাদনা সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ-১১০।

৫৬. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ-২১৫।

যদি আমাদের শত্রু পক্ষই হয় তা হলে এ কথাটা মনে রাখতে হবে, তারা তুফান রূপে আমাদের ফাটল মেরামতের কাজে লাগতে আসে নি।....আসলে মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা এত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে।"[৫৭]

তিনি আরও লিখেছেন, "একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে কোন পাপ ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।"[৫৮]

সাম্প্রদায়িক বিভেদ নিরসন ও সম্মিলন প্রচেষ্টাঃ

বৃটিশ শাসনাধীনে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যে চরম অবনতি ঘটেছিল, তার অবসানে মহৎ প্রচেষ্টা যে চালানো হয় নি এমন নয়। হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে অনেক চিন্তাশীল উদারমনা ব্যক্তিই সাম্প্রদায়িক বিরোধের কুফল অনুভব করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, এ.কে. ফজলুল হক, চিত্তরঞ্জন দাস, সুবাস চন্দ্র বসু, সোহরাওয়ার্দী, স্যার আব্দুর রহীম, মৌলবী আব্দুল করিম, মৌলবী মজিবুর রহমান, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী, শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি, ১৯২০ সালের খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২৩ সালের বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯৪৭ এ অখন্ড বাংলার প্রস্তাব প্রভৃতি ইতিবাচক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরোধিতার কারণে, দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আস্থাবোধের অভাবে এসব উদ্যোগ সফল হয়নি। বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পর্কে হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া ছিল- "চিত্তরঞ্জন দাস মুসলমানদের নিকট

৫৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমূহ পরিশিষ্ট, ব্যাধি ও প্রতিকার, ১৩১৪, উদ্বৃতঃ ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৫।

৫৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা প্রজা, ১৩১৫, উদ্বৃতঃ ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৫।

দেশকে বিকিয়ে দিচ্ছেন এবং এ চুক্তি তিনি কখনো প্রাদেশিক সম্মেলনে অনুমোদন করিয়ে নিতে পারবেন না।"[৫৯]

আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন-

"এই সাহসী ঘোষণা (বেঙ্গল প্যাক্ট) বঙ্গীয় কংগ্রেসের ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলছিলো। বহু কংগ্রেস নেতা তুলনামূলক ভাবে এর বিরোধিতা করলেন এবং মি.দাসের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে দিলেন। তাকে সুবিধাবাদের এবং মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য অভিযুক্ত করা হলো। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, তিনি দেহত্যাগ করার পর তার কিছু সংখ্যক শিষ্য তার আদর্শকে খর্ব করে দিলেন এবং তার এই ঘোষণাটিকে বাতিল করে দেয়া হলো। ফল এই হলো যে বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াল এবং দেশ বিভাগের প্রথম বীজ বপন করা হলো।"[৬০]

অখন্ড বাংলা পরিকল্পনার ব্যর্থতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, "তিনি (সোহরাওয়ার্দী) একমাত্র ব্যক্তি যিনি খন্ডিত পাকিস্তানে খন্ডিত বাংলার কুফল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ফলে উদ্ভব হইয়াছিল বৃহত্তর বাংলার 'সোহরাওয়ার্দী-বসু চুক্তি'। এই পরিকল্পনার প্রতি কায়েদে আজমেরও আশীর্বাদ ছিল। কিন্তু মি. বল্লবভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে চরমপন্থী কংগ্রেস এবং মি. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ন্যায় সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইতে দেয় নাই।"[৬১]

৫৯। *অখন্ড বাংলার স্বপ্ন*, আহ্‌সানুল্লাহ্‌, পৃ-১০৭, উদ্ধৃতঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ-২২৬।
৬০। Abul Kalam Azad, India wins Freedom, P-21.
৬১। শেখ মুজিবুর রহমান, নেতাকে যেমন দেখিয়াছি; *দৈনিক ইত্তেফাক*, সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা; মার্চ ১৯৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুদের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে মুসলিমদের মধ্যেও চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি হয়, যার পরিণতি- দেশ ভাগ, বাংলা ভাগ। জাতিভিত্তিক ও ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা পরবর্তীতে ভাষাভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়। মুসলিম লীগ ইসলামের নাম নিয়ে পাকিস্তান কায়েম করলেও ইসলামী ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় আদর্শ গ্রহণ করেনি। ফলে বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পুনরায় বাংলাকে অশান্ত করে তোলে এবং পূর্ব বাংলা 'বাংলাদেশ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। উল্লেখযোগ্য দিক হল স্বাধীন বাংলাদেশ তার প্রাচীন

সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের পথ ধরে পুনরায় দীপ্ত পদচারণা শুরু করে। ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব সংঘাতের সাথে তুলনায় বাংলাদেশে সম্প্রদায়গত বিরোধ নেই বললেই চলে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উসকে দেয়ার চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু বাংলার উদার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে উগ্রপন্থা মাথা চাড়া দিতে পারে নি বা বিস্তার লাভ করতে পারে নি।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী মুসলিম জাগরণে বিভিন্ন আন্দোলনের ভূমিকা:

পলাশীর পট পরিবর্তনে মুসলিম শাসক শ্রেণীর ও অভিজাত শ্রেণীর পতন হয় এবং মুসলিম সমাজ কৃষি ভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে পর্যবসিত হয়। ছোট খাট বৃত্তিজীবী ও পেশাজীবী কিছু সংখ্যক মানুষ শহরে বাস করছিল। উপরন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার পতনে মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে চরম অধঃপতিত অবস্থায় পতিত হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মুসলিম সমাজ ইংরেজ ও তাদের সহযোগী মুৎসুদ্দি, বেনিয়া, নায়েব, গোমস্তাদের গোলামে পরিণত হয় এবং সামাজিক দিক থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজের চরম অবমাননার স্বীকার হয়। আবুল মনসুর আহমদের বাল্যকালের স্মৃতিচারণে সে সময়ের নায়েব গোমস্তা কর্তৃক মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ যে চরম অপমানিত, অপদস্ত ও অসম্মানের স্বীকার হতেন তা উঠে এসেছে। তিনি বর্ণনা করেছেন-

"কিছু দিনের মধ্যে একটা ব্যাপারে আমি মনে বিষম আঘাত পাইলাম। অপমান বোধ করিলাম। দেখিলাম, আমাদের বাড়ির ও গাঁয়ের মুরব্বিরা নায়েব-আমলাদের সাথে দরবার করিবার সময় দাঁড়াইয়া থাকেন। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝি নাই। আরও কিছু দিন পরে জানিলাম, আমাদের মুরব্বিদেরে নায়েব-আমলারা 'তুমি' বলেন।.... জানিলাম, আমাদের মুরব্বিদেরে 'তুমি' বলা ও কাছারিতে বসিতে না দেওয়ার কারণ একটাই। নায়েব-আমলারা মুসলমানদের ঘৃণা-হেকারত করেন।"[১]

অন্য এক স্থানে তিনি উল্লেখ করেছেন "আরেকটা ব্যাপার আমাকে খুবই পীড়া দিত। জমিদাররা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব প্রজার কাছ থনেই কালীপূজার মাথট আদায় করিতেন। এটা খাজনার সাথে আদায় হইত। খাজনার মতই বাধ্যতামূলক ছিল। না দিলে

১। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ১ম অধ্যায়, পৃ-৫।

খাজনা নেওয়া হইত না। ফরাযী পরিবারের ছেলে হিসবে আমি গোঁড়া মুসলমান ছিলাম। মূর্তি পূজার চাঁদা দেওয়া শেরেকী গোনা। এটা মুরব্বিদের কাছেই- শেখা মসলা। কিন্তু মুরব্বিরা নিজেরাই সেই শেরেকী গোনা করেন কেন? এ প্রশ্নের জবাবে দাদাজী, বাপজী ও চাচাজী তাঁরা বলিতেন: না দিয়া উপায় নাই। এটা রাজার জুলুম। রাজার জুলুম নীরবে সহ্য করা এবং গোপনে আল্লাহ্র কাছে মাফ চাওয়া ছাড়া চারা নাই।”[২]

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক থেকেও মুসলমানরা এ সময় চরম হীনমন্যতা বোধের স্বীকার হয়ে পড়ে এবং নানা কুসংস্কারে আছন্ন হয়। এ অবস্থায় ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই মুসলমানদের উত্থান প্রচেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একেবারে প্রতিষ্ঠালগ্নে নবাব মীর কাশিম ইংরেজদের অর্থলোভী ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন। বক্সারের প্রান্তরে তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেও পরাজিত হন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা মুসলিম জনমানসকে নীরবে নিভৃতে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করতে থাকে।

মীর কাশিমের সংগ্রামের সমসাময়িক কালে বাংলায় আর্থসামাজিক সংকটের প্রেক্ষাপটে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকির সন্ন্যাসীগণ ইংরেজ ও তাদের দোসর জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। তাদের সাথে যোগ দেয় চাকুরী হারা সৈন্য ও দুর্দশাগ্রস্থ কৃষক। ১৭৬৩ থেকে ১৭৯১ সাল পর্যন্ত সমাজের অত্যন্ত নীচু তলায় অবস্থানকারী নিতান্তই দরিদ্র শ্রেণীর অসংগঠিত মানুষগুলো তাদের সামান্য পুঁজি নিয়ে বৃটিশ শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। ইংরেজ সরকার সমর শক্তি বলে এই বিদ্রোহ দমন করলেও তা সরকারের অগোচরে জনসমাজে ইংরেজ বিরোধী মানসিকতার প্রসার ঘটায়।

২। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩।

বাংলার মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর যখন মেরুদন্ড ভেঙ্গে গিয়েছে তখন নিম্ন শ্রেণীর সাধারণ মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছে। কোম্পানীর কঠোর রাজনীতি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং জমিদার নায়েব গোমস্তাদের অত্যাচার নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষক ও প্রজাসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ১৭৮৩ সালে দিনাজপুর ও রংপুরের প্রজাগণ সংঘবদ্ধ হয়ে দিনাজপুর জমিদারীর ম্যানেজার দেবী সিংহ এর অত্যাচরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কোম্পানী সরকার কঠোরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেন। তবে বিদ্রোহ পরবর্তীতে সরকার প্রজা বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য দুটি কমিশন নিয়োগ করে। কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী দেবী সিংহকে ম্যানেজারের পদ থেকে অপসারিত করা হয় এবং প্রজা বিদ্রোহের পাঁচজন নেতাকে নির্বাসনদন্ড দেয়া হয়।[৩]

রংপুরের কৃষক বিদ্রোহের পর নীল চাষকে কেন্দ্র করে বাংলার কয়েকটি জেলার কৃষকরা আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মুসলিম শাসনামলে বাংলা ও বিহারের কৃষকগণ স্বল্প পরিসরে কিছু নীল চাষ করতেন এবং তা ইউরোপে রপ্তানি হত। কিন্তু কোম্পানী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে নীলের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থায় ইংরেজ বনিকগণ বহু স্থানে নীল কুঠি স্থাপন করে নীল ব্যবসা একচেটিয়া করে নেয় এবং কৃষককে বিঘা প্রতি ৭ টাকা ক্ষতিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করে।[৪] দীনবন্ধু মিত্রে 'নীল দর্পণ' নাটক এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'অমৃত বাজার' পত্রিকায় নীল করদের নীল চাষীদের উপর অমানবিক অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায়।[৫] ১৮৫৯ সালে যশোর, নদীয়া, পাবনা, রাজশাহী ও রংপুরের কৃষকগণ এ মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে তারা আর কোন ভাবেই নীল চাষ করবে না।[৬]

৩। ড.এম.এ রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ-৬৮।

৪। Blayer Cling, *'Blue Mutiny'*, P-34; উদ্বৃতঃ ড. এম.এ রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-৬৯।

৫। J.C. Bagal, *Peasant Revolution in Bengal*, P-6; ড. এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-৭০।

৬। ড. এম. এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-৭১।

বিভিন্ন স্থানে নীল চাষীগণ নীল করদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে কৃষকদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করে কিন্তু বাঙালী কৃষকগণ কিছুতেই মাথা নত করেনি। বিপ্লব প্রবল আকার ধারণ করলে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং পর্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। বাংলার ছোট লাট স্যার জন, এফ, গ্রান্ট ১৮৬০ সালে স্টীমারে ঢাকা থেকে ফেরার সময় যমুনা নদীর উভয় তীরে হাজার হাজার জনতা নীলকরদের অত্যচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।[৭] অবশেষে সরকার নীল চাষ কৃষকের ইচ্ছাধীন বলে আদেশ জারি করে এবং ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করে। বাংলার অভিজাত শ্রেণী যখন নিষ্ক্রিয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন অনুপস্থিত, তখন নিম্ন শ্রেণীর এই অশিক্ষিত কৃষক সমাজ অন্যায়ের প্রতিকারে যেভাবে সংগঠিত হয়েছেন। তা সত্যিই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

১৮৬০ সালের ১৯ মে পেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে হরিশচন্দ্র মুখার্জী মন্তব্য করেছেন, “বাংলাদেশ বাঙ্গালী কৃষকদের জন্য গর্ব করিতে পারে । বাংলাদেশের কৃষকগণ নীল চাষের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে শুরু হইতে যে সকল গুণের স্পষ্টত পরিচয় দিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কৃষকদের মধ্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্ষমতা, অর্থ ও রাজনৈতিক জ্ঞান ও নেতৃত্বের অভাব থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষকগণ আর একটি বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। এই বিপ্লব ইহার ব্যাপকতা ও গুরুত্বের দিক দিয়া যে কোন দেশের সামাজিক বিপ্লব হইতে কোন অংশে ছোট নয়। তাহার প্রভাব প্রতিপত্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে, আইন তাহাদের প্রতিকূলে, বিচারালয় তাহাদের শত্রুপক্ষে, সংবাদপত্রগুলি তাহাদের প্রতিপক্ষে ছিল ; ইহা সত্ত্বেও তাহারা সংগ্রাম করিয়া যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা দেশের সর্ব শ্রেণীর লোকের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপকারে আসিবে। ধৈর্য, অধ্যবসায়, দৃঢ়সংকল্প প্রভৃতি গুণের বলে এবং কোন

৭। Blayer cling, P-171; উদ্বৃতঃ ড. এম.এ রহিম, পৃ-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন না করিয়া তাহাদের এই বিরাট সাফল্য অর্জিত হইয়াছে।”[৮]

ফরায়েজী আন্দোলনঃ

শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে নয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধঃপতনের বিরুদ্ধেও মুসলিম জাতি সোচ্চার হয়ে উঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হাজী শরিয়তুল্লাহ্ (১৭৬৪-১৮৪০) বাঙালী মুসলিম সমাজের নানা কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতি এবং কৃষক, তাঁতী, জেলে, মজুর প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মানুষের নিপীড়িত জীবনের পরিত্রাণে আন্দোলন শুরু করেন। দুটো লক্ষ্যকে সামনে রেখে তার আন্দোলন পরিচালিত হয়-

এক. পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আদর্শে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা।

দুই. অধিকার বঞ্চিত শোষিত মানুষকে আত্ম প্রতিষ্ঠার বাণী শিক্ষা দেয়া।

হাজী শরিয়তুল্লাহ্ পীর পূজা, কবর পূজা, মাজারে সিজদা দেয়া, জারি গান, মাতম করা, ভেলা ভাসান প্রভৃতি শিরক বিদয়াত পরিহারের জন্য মুসলিমদের আহ্বান জানান এবং ইসলামের মৌলিক ইবাদাতসমূহ (ফরজ) নিষ্ঠার সাথে পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর আন্দোলন ফরায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। Latifa Akanda বলেনঃ

“They declared that the Koran was the complete guide to spiritual life; and they there fore, called themselves faraizis or followers of the faraiz (plural of the Arabic word farz) the divine ordinances of God alone.”[৯]

৮। উদ্বৃত, ড. এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-৭৩ ।

৯। Latifa Akanda, *Social History of Muslim Bengal*, Islamic cultural centre, Dacca, P-181.

Dhaka University Institutional Repository

হাজী শরিয়তুল্লাহ্ ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদের নীতিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন। প্রজাদের মনে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও আত্মসচেতনতাবোধকে জাগিয়ে দেন। ভারতকে ‘দারুল হরব’ (যুদ্ধরত এলাকা) বলে ঘোষনা করেন এবং জমিদারদের নানা রকম অবৈধ করারোপের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন- “The earth belonged to God and that no one had any right to inherit ownership of land or to levy any tax on it.”[১০]

হাজী শরিয়তুল্লাহর আন্দোলন দ্রুত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার মুসলিম জনতার বিশাল একটি অংশ এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। হাজী শরিয়তুল্লাহ্ একদম নিম্ন শ্রেণীর অশিক্ষিত মানুষদের সংগঠিত করে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় এ আন্দোলন নিছক একটি ধর্মসংস্কার আন্দোলনে সীমিত ছিল। কিন্তু প্রজা সাধারণের জাগরণে জমিদার শ্রেণী ভীত হয়ে পড়ে এবং প্রজাদের উপর নানা অত্যাচার শুরু করে। হাজী শরিয়তুল্লাহকেও নানা হয়রানি করা হয় এবং তাঁর উপর পুলিশি নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র দুদু মিয়া আন্দোলনকে রাজনৈতিক পরিচিতি দেন। জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজা সাধারণকে সংগঠিত করেন এবং শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। কানাইপুর ও ঘোষ জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে অবৈধ কর আদায় না করার ব্যাপারে অঙ্গিকার গ্রহণ করেন। জেমস ওয়াইজের মতে, অত্যচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে ত্রাণকর্তারূপে দুদু মিয়ার নাম পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে প্রজাগণ দলে দলে এ আন্দোলনে যোগ দেয়।[১১]

১০। A.R. Mallick, প্রাগুক্ত, P-84.

১১। James Wise, *Eastern Bengal*, P-24; উদ্বৃতঃ ড. এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৬।

দুদু মিয়া পঞ্চচর নীলকুঠির অত্যাচারী গোমস্তা কালী প্রসাদকে হত্যার অভিযোগে জেলে যান কিন্তু আপীলের মাধ্যমে ছাড়া পান। পরে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে যুক্ত হওয়ার আশঙ্কায় সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে এবং দু'বছর পরে ছেড়ে দেয়। দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু এ আন্দোলন প্রজা সাধারণের মধ্যে যে চেতনার জন্ম দিয়েছিল তা লালিত হতে থাকে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। লতিফা আকন্দ মনে করেন যে, এ আন্দোলন প্রজাদের দুরবস্থাকে আরও বাড়িয়ে তুলে ছিল। কারণ একদিকে সরকার ও জমিদার ফরায়েজী প্রজাদের উপর দমন নিপীড়ন বাড়িয়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে দুদু মিয়ার অনুসারীগণ আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য প্রজা সাধারণের উপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন।[১২] তিনি মন্তব্য করেছেন-"The poor peasantry was sandwiched by the dual pressure."[১৩]

কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে বলা যায় যে, সব আন্দোলনেই বাধা বিপত্তি আসে কিন্তু পরিণামে যা অর্জিত হয় তার মূল্য অনেক বেশী। আর্থিক মুক্তি ও ধর্মীয় আবেগে প্রজা সাধারণ ফরায়েজী আন্দোলনে শামিল হয়েছিল যা জমিদার শ্রেণীর ভীতকে নাড়িয়ে দেয় এবং সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। ফলে দমন নিপীড়ন আপাতদৃষ্টিতে বৃদ্ধি পেলেও, এর সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে প্রজা সাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয় এবং পরবর্তী প্রজা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করে।

১২। Latifa Akanda, প্রাগুক্ত, P-185.
১৩। পূর্বোক্ত, P-185.

Dhaka University Institutional Repository

তিতুমীরের প্রজা আন্দোলনঃ

ফরায়েজী আন্দোলনের সমসাময়িককালে অভিন্ন সামাজিক পটভূমিতে একই ভাবধারায় পশ্চিম বাংলায় মওলানা সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) আন্দোলন শুরু করেন। তিনি সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর শিষ্য। তিনি বেরেলভীর সাথে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল সফর শেষে নেতার নির্দেশে বাংলায় আন্দোলন শুরু করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র মত তিতুমীরের আন্দোলনেও প্রথম দিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। ধর্মীয় অনুশাসন পালন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণায় জনসাধারণকে উজ্জীবিত করতে থাকেন। বিরান মসজিদসমূহ সংস্কার করে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রচলন করেন। পূজায় চাঁদা দান বা তাতে অংশ গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন। মুসলমানী নাম রাখা, ধূতি ছেড়ে লুঙ্গি পরা, এক আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা, পীর পূজা ও কবর পূজা বন্ধ করা, কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কাজের মূলোচ্ছেদ তথা কুরআন-হাদীসের খেলাফ কোন কাজ না করা ছিল তার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। তিতুমীরের আন্দোলন ছিল জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, তার স্লোগান ছিল-'লাঙ্গল যার জমি তার'।[১৪]

গণজাগরণের ভয় পেয়ে জমিদারগণ একজোট হয়, নীলকরগণও তাদের সাথে যোগ দেয় এবং সরকারকে তিতুমীরের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত করতে থাকে। জমিদারগণ তিতুমীরের অনুসারীদের উপর উৎপীড়ন শুরু করে; দাঁড়ির উপর ট্যাক্স আরোপসহ নানা অপমানজনক জরিমানা আরোপ করে। তিতুমীর এর প্রতিকারে জিলা ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ফলে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করেন।[১৫]

১৪। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ*, পৃ-৮৬।
১৫। পূর্বোক্ত, পৃ-৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

তিতুমীরের অনুসারীগণ নারিকেল বাড়িয়ায় সমবেত হয়ে সেখানে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিতুমীরের বাহিনী চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলায় অনেক জায়গায় আধিপত্য বিস্তার করে স্বরাজ কায়েম করে। জমিদার ও ইংরেজ বাহিনীর সাথে খন্ড খন্ড যুদ্ধ হয়। সংঘর্ষ এড়াতে ইংরেজ সেনাপতি তিতুমীরের সাথে আলোচনায় বসলে রামচন্দ্র নামক দোভাষী বিকৃতভাবে উভয় পক্ষের বক্তব্য উপস্থাপন করলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং চুড়ান্ত যুদ্ধ বাঁধে । ১৮৩১ সালের ১৯ শে নভেম্বর নারিকেল বাড়িয়ার যুদ্ধে তিতুমীর পরাজিত ও নিহত হন। নিহতদের মৃতদেহ পুড়িয়ে দেয়া হয়। তিতুমীরের অনুচরদের বাড়ীঘর লুণ্ঠন ও বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু তিতুমীরের দেশপ্রেম ও আন্দোলন একটি হতাশাগ্রস্ত জাতিকে উজ্জীবিত করে। ইংরেজ সেনাপতি মেজর স্কট মন্তব্য করেন-

" যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি কিন্তু জীবন দিয়েছেন একজন ধর্মপ্রাণ দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ।"[১৬]

সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর জিহাদ আন্দোলনঃ

সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (১৭৮৬-১৮৩১) উত্তর ভারতে মুসলিমদের স্বরাজ বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার ঢেউ বাংলাতেও এসে লেগেছিল। বিস্তীর্ণ বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষ সেই আন্দোলনে রসদ জুগিয়েছে। বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঘরে মুষ্টি চাল সংগ্রহ করা হত, নারীরা তাদের অলঙ্কার, অনেকে গরু, বাছুর বা জমি বিক্রি করে জিহদ আন্দোলনে সাহায্য পাঠিয়েছে। বালাকোটের লড়াইয়ের অংশীদার মুজাহিদদের এক পঞ্চমাংশই বাংলা থেকে যোগ দিয়েছিল। বালাকোটের দু' শতাধিক শহীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় নয়জন ছিলেন বাঙালী। বেরেলভীর পরামর্শ সভার প্রভাবশালী সদস্য ইমাম উদ্দীন বাঙালীসহ

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ-৮৭।

বাংলার প্রায় চল্লিশ জন মুজাহিদ যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। জিহাদ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাঙালী নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মৌলবী আমীর উদ্দীন নাযির সর্দার, মৌলবী ইব্রাহীম মন্ডল, হাজী বদরুদ্দীন (ঢাকা) ও মৌলবী আজিম উদ্দীন (ঢাকা) প্রমুখ।[১৭] জিহাদ আন্দোলন থেকে যারা জীবিত ফিরে এসেছিলেন তারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছেন।

সিপাহী বিপ্লব:

মুসলিম জাতি ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ১০০ বছর আজাদী সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। এ সংগ্রামগুলো নিতান্তই তৃণমূল পর্যায়ে আলিম ও ওলামাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। আর সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে একেবারে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ, পূর্বে রাজনীতির সাথে যাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। একশত বছর ধরে খন্ড খণ্ড আজাদী সংগ্রামসমূহ সিপাহী বিপ্লবের মত জাতীয় বিপ্লবের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছে।

বেরেলভীর জিহাদ আন্দোলন স্তিমিত হলে তাঁর অনুসারীরাই আজাদী সংগ্রামের শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে এই মহা বিদ্রোহের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মওলানা আহমদ উল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৫৬ সাল থেকেই বিদ্রোহের সংকেতবাহী চাপাতি রুটি ও রক্তজবা ফুল বিতরণের মাধ্যমে দিল্লী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত খবর পৌছে যায়।[১৮]

দিল্লীর সম্রাট থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, আজাদী পাগল জনতা, ডালহৌসীর আগ্রাসী নীতির শিকার অযোধ্যা, সাতারা, ঝাঁসির মত রাজ্যসমূহ এতে সাড়া দেয়, তবে আন্দোলনে মূল ভূমিকা রেখেছে মুসলিমরা। কারণ বৃটিশ শাসনের শুরু থেকেই হিন্দু

১৭। ড. এম.এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ-৮৪।
১৮। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৮।

সমাজের প্রধান অংশ ইংরেজদের সহযোগীর ভূমিকা পালন করে এসেছে। ১৮৫৭ সালের ১৯ মে মীরাট সেনানিবাসের সিপাহীদের প্রকাশ্য বিদ্রোহের মাধ্যমে বিপ্লব শুরু হয় । এ বিদ্রোহ দ্রুত সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এই বিদ্রোহে বাংলার ভূমিকা ছিল বেশ জোরালো। চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট, যশোর প্রভৃতি স্থানে দ্রুত বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। হাবিলদার রজব আলী চট্টগ্রাম প্যারেড গ্রাউন্ড ময়দান থেকে প্রথম পূর্ব বাংলায় বিদ্রোহের সূচনা করেন।[১৯] ঢাকার সিপাহীরা লালবাগ দূর্গকে কেন্দ্র করে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ঘোরতর যুদ্ধে চল্লিশজন দেশীয় সিপাহী নিহত ও বহু আহত হন । বন্দী ষাট জন সিপাহীকে আন্টাঘর ময়দানে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতার পরে এ স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয় এবং ময়দানটির নাম ভিক্টোরিয়া পার্কের পরিবর্তে 'বাহাদুর শাহ পার্ক' রাখা হয়। সিপাহী বিপৰবকে 'মহাবিদ্রোহ' বা 'জাতীয় বিদ্রোহ' যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন এটি ছিল আজাদী পাগল মানুষের শেষ প্রচেষ্টা।

কিন্তু এই কিন্তু এই বিদ্রোহ অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হওয়ায় সফল হতে পারে নি। ১৮৫৭ এর পরে স্বাধীনতার জন্য বীরোচিত বজ্র হুঙ্কার আর শোনা যায় নি। আরও দীর্ঘ ১০০ বছরের গোলামীর পর ভারতীয়রা ইংরেজদের নিকট থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৪৭ এ ইংরেজ শক্তি যে অযৌক্তিক অবাস্তব ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়ে যায়, তা ভারত উপমহাদেশর সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে মারাত্মক পর্যায়ে নিয়ে যায়।

যা হোক, বিদ্রোহের জন্য সরকার মুসলিমদেরকেই দায়ী করে এবং যুদ্ধের পরে তারা নিষ্ঠুর নির্যাতনের স্বীকার হয়। বিদ্রোহের শাস্তি স্বরূপ অগণিত মানুষকে ফাঁসি দেয়া হয়, কারাদন্ড দেয়া হয়। দশ হাজারের বেশী মানুষকে যাবজ্জীবন নির্বাসনে পাঠানো হয়। জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী নায়ক আন্দামানবন্দী মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী লিখেছেন-

---

১৯। মাইকেল এডওয়ার্ড, *ব্যাটলস অব দি ইন্ডিয়ানস;* মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ-৮৯।

"স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিযোগ প্রমানিত হলে তবেই কোন হিন্দুকে আটক করা হতো, কিন্তু পালাতে পারেনি এমন একজন মুসলমানও সে দিন বাঁচেনি।"[২০]

উপরোক্ত আন্দোলনসমূহের মধ্যে সশস্ত্র ভাবধারা পরিলক্ষিত হলেও সেগুলো ছিল যুগবাস্তবতায় মুসলিমদের চরম আজাদীপ্রেমী স্বাধীনচেতা মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। উপমহাদেশের হিন্দু সমাজ যখন ইংরেজদের সহায়তায় আত্মউন্নয়নে নিয়োজিত ছিল তখন মুসলিমরা তাদের সীমিত শক্তি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ একশত বছর ব্যাপী আন্দোলন সংগ্রামে ব্যস্ত থাকার কারণে এবং ইংরেজ শাসনকে মেনে না নেয়ায় সরকার কর্তৃক গৃহীত সব রকম উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে দূরে থেকেছে। ফলে ১৮৫৭ সালের চুড়ান্ত পরাজয়ে মুসলিম জাতি দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এ অবস্থায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কয়েকজন নেতা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সরকারের সাথে আপোষকামী মনোবৃত্তি গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে অগ্রগামী হলেন নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও স্যার সৈয়দ আহমদ। শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় তাদের কর্মকান্ড সমন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। মূলত এ তিনজন মনীষী সরকার ও মুসলিমদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর করে সমঝোতার মাধ্যমে দাবি দাওয়া আদায়ের প্রেক্ষাপট তৈরী করেন। তাদের প্রচেষ্টায় একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী হয়। যারা সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসেন। এ সময় অভিজাত শ্রেণী থেকে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, ধনবাড়ির জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী, হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী, ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, ফরিদপুর বেলগাছির জমিদার আলিমুজ্জামান চৌধুরীসহ আরও অনেকে বাঙালী মুসলিম সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসেন। অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্যোগে বিভিন্ন

২০। উদ্বৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্ম হয়। ইতিপূর্বে হিন্দু সমাজের নেতৃত্বে যে সব সভা সমিতি গড়ে উঠেছিল সেখানে মুসলিমাদের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত ছিল না। ঊনিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে এসে মুসলিম নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সংগঠনসমূহ বাংলার মুসলিম সমাজের উন্নয়নে অসামান্য ভূমিকা রাখে। এসব সভা সমিতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল[২১]-

১। আঞ্জমন ইসলামী । উদ্যোক্তা, মৌলবী মোহাম্মদ মাজহার, প্রতিষ্ঠাকাল- ১৮৫৫ সালের ৬ মে।

২। মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি। উদ্যোক্তা, আব্দুল লতিফ। প্রতিষ্ঠাকাল-১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল।

৩। মাদ্রাসা লিটারেরী এন্ড ডিবেটিং ক্লাব, প্রতিষ্ঠা কাল-১৮৫৭।

৪। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন, উদ্যোক্তা সৈয়দ আমীর আলী। প্রতিষ্ঠাকাল- ১৮৭৮ সালের ১২মে। বাংলাসহ ভারতে এর ৫২টির মত শাখা ছিল।

৫। ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী। উদ্যোক্তা, ঢাকা কলেজের কতিপয় ছাত্র। প্রতিষ্ঠাকাল- ১৮৮৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি।

৬। নূর-আল ইমান সমাজ, রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৭। সাতক্ষীরা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী। উদ্যোক্তা, কাজী আব্দুল আজিজ। প্রতিষ্ঠাকাল- ১৮৮৮।

৮। আঞ্জমনে হেমায়েতে ইসলাম। প্রতিষ্ঠাতা, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, সময়কাল- ১৮৯১। এটি রাজশাহী কেন্দ্রীক প্রতিষ্ঠান।

৯। আঞ্জমানে মঈনাল এসলাম। উদ্যোক্তা, সাংবাদিক মোহাম্মদ নইমুদ্দীন। সময়কাল- ১৮৯১। টাঙ্গাইল কেন্দ্রীক একটি ধর্ম সভা।

২১। ওয়াকিল আহামদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, পৃ-১১৮-১৯১।

১০। রঙ্গপুর নূরল ইমান জামায়ত, উদ্যোক্তা, খয়রুজ্জামান খাঁ। সময়কাল- ১৮৯১ সাল।

১১। কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন। সময়কাল-১৮৯৩।

১২। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। উদ্যোক্তা, আব্দুল গনি। সময়কাল- ১৮৯৪ সালের ১৯ জানুয়ারী।

১৩। মহামেডান এলগিন স্পোর্টিং ক্লাব। উদ্যোক্তা, ঢাকার ছাত্র সমাজ, সময়কাল -১৮৯৪।

১৪। মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন। উদ্যোক্তা, ব্যরিস্টার আব্দুর রহিম ও উকিল মোহাম্মদ ইউসুফ, সময়কাল-১৮৯৬। কলকাতায় স্থাপিত।

১৫। আঞ্জমনে আশ-আতে ইসলাম, ১৮৯৬।

১৬। ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা।

১৭। বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি (১৮৯৯)।

১৮। সুবার্বন মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৯৯)।

১৯। আঞ্জমান নূরল ইসলাম । প্রতিষ্ঠাতা, ডাক্তার মাহাতাব, সময়কাল-১৮৯৯।

২০। মুসলমান শিক্ষা সভা। ১৮৯৯ সাল চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

২১। মহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব (১৮১৯)। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঢাকার নবাব আহসান উল্লাহ্ ।

২২। কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা।

২৩। মোসলেম ইনস্টিটিউট (১৯০২)।

২৪। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি (১৯০৩)। উদ্যোক্তা, স্যার সৈয়দ আহমদ। জনপ্রিয়তার দিক থেকে মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের পরেই এর অবস্থান।

২৫। বঙ্গীয় ইসলাম সমিতি (১৯০৪) ।

Dhaka University Institutional Repository

২৬। আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম।

২৭। মেদিনীপুর মোসলেম সোসাইটি।

২৮। মহামেডান লিটারেরী একাডেমী।

২৯। আঞ্জুমানে ইসলামিয়া ।

এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও ক্রিড়া বিষয়ক কর্মকান্ডের বিকাশের সাথে সাথে মুসলিমদের রাজনৈতিক চেতনারও বিকাশ ঘটে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পূর্ব বাংলার মুসলিমদের মধ্যে কিরূপ জাগরণ সৃষ্টি করেছিল তা আমরা পূর্বে আলোকপাত করেছি। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরে সিমলায় সর্ব ভারতীয় মুসলমানদের একটি ডেপুটেশন প্রেরিত হয় এবং মুসলিমদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশ করে যার অন্যতম বিষয় ছিল ভারতে হিন্দু- মুসলিম উভয়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষা। সিমলা ডেপুটেশনের দু’ মাসের মাথায় ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন শেষে নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মুসলিমদের আকাঙ্খা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়। প্রথম দিকে মুসলিম লীগ ইংরেজ সরকারের প্রতি আপোষকামী মনোভাব প্রদর্শন করলেও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও বাংলার উদীয়মান রাজনীতিবিদ শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে মুসলিম রাজনীতির গতিধারাও পরিবর্তিত হয়। ফজলুল হক বাঙালী মুসলিমের আশা আকাঙ্খার প্রতীকে পরিণত হন। ১৯১০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলিম প্রধান অঞ্চলসমূহ স্বাধীন বা স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব দ্বারা তিনি বাঙালী মুসলিমদের মনের দাবিই উত্থাপন করেছিলেন। ১৯৪৭ এর দেশ ভাগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও বাস্তবতার নীরিখে শেরে বাংলার চিন্তাই সঠিক প্রমাণিত হয় এবং ‘স্বাধীন বাংলাদেশ’ নামে

বাঙালী মুসলিমদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমির জন্ম হয়। বাংলার আবহমান সাংস্কৃতিক ভাবধারায় উদার নৈতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমসহ হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান উন্নত সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহারঃ

বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতির আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বাংলার রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির এক সংকটকালে ত্রাণকর্তারূপে মুসলিমদের আগমন ঘটে। আর্য সংস্কৃতির কঠোর বিধি নিষেধের বেড়াজালে বাংলার বিস্তীর্ণ সমতলে নানা প্রাকৃতিক নিয়ামতে ধন্য উদার প্রকৃতির সহজ সরল মানুষগুলো অস্থির হয়ে উঠেছিল। বাংলার নরম মাটিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী কঠোর ভাবধারা শিকড় বিস্তার করতে পারেনি, বরং গৌতমবুদ্ধের অহিংস নীতিই এখানে প্রসার লাভ করেছিল। সেন শাসনে বৌদ্ধ মতাবলম্বী ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু যারা ছিল বাংলার প্রধান জনগোষ্ঠী, চরম নিপীড়ন আর আগ্রাসনের স্বীকার হয়েছিল এবং একটা পরিবর্তনের অপেক্ষায় ছিল। মুসলিমরা সেই কাঙ্খিত পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল।[১] মুসলিম অভিযানের শুরুতে ভুল বোঝাবুঝি থেকে বৌদ্ধ বিহার আক্রান্ত হলেও বখতিয়ার খলজি দ্রুতই আলোচনার মাধ্যমে বৌদ্ধদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটান। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতির অনন্য নজির স্থাপন করে মুসলিমরা বাংলায় জনকল্যাণকর শাসনের ভিত্তি স্থাপন করে।

বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রধান উলেৱখযোগ্য দিক ছিল জনকল্যাণকর শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। পথের বাঁকে বাঁকে মসজিদ-মাদ্রাসা স্থাপন, দিঘি ও খাল খনন, সরাই খানা ও লঙ্গর খানা স্থাপন, সড়ক ও বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি তাদের জনকল্যাণকর শাসনের প্রমাণ দেয়। মুসলিম শাসনামলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রজাসাধারণের নিরাপত্তা প্রদান করা হত এবং সকলে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পেত। সমাজের অসহায় ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের প্রতিপালন এবং অপরাধীকে কঠোর শাস্তি প্রদান মুসলিম শাসনের একটি প্রশংসনীয় দিক ছিল। সরাইখানা ও লঙ্গরখানায় দরিদ্র ও অসহায়দের বিনা পয়সায় খাদ্য প্রদান এবং তাকাভী

১। দ্রষ্টব্যঃ বর্তমান অভিসন্দর্ভ, ২য় অধ্যায়, পৃ-১১।

Dhaka University Institutional Repository

ঋণের মাধ্যমে অসহায় কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা হতো। খাজনা নির্ধারণে জমির উর্বরা শক্তি বিবেচনা করা হতো। ইতিহাসের পাতায় বাংলার মুসলিম শাসকগণের কল্যাণময় শাসন নীতির এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে।

শিৰা ও সংস্কৃতির প্রসার বাংলার মুসলিম শাসনামলে দ্বিতীয় গুরৰত্বপূর্ণ দিক। সুলতানী ও মোগল আমলে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অবৈতনিক ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং শিক্ষাকে ধর্মীয় ইবাদাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২] মুসলিম শাসনামলে আলিম-ওলামা ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে আর্থিক নিরাপত্তা এবং স্বাধীনভাবে জ্ঞানচর্চার সুযোগ দেওয়া হতো। অমুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও এই অনুদানের বাইরে ছিলেন না। এ কারণেই সুলতানী ও মোগল আমলে আলিম-ওলামা ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী উন্নয়ন ও সঙ্কটে সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রের ন্যায়পালের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা একদিকে সুলতান, সুবাদার বা নবাবগণকে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন এবং প্রয়োজনে সমালোচনা করতেন, অন্যদিকে সঙ্কটকালীন সময়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে শাসকের হাতকে শক্তিশালী করতেন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মুসলিম শাসনের আর একটি উলেৰখযোগ্য দিক। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচারকগণ ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আইনের চোখে সকলে ছিল সমান। বিচার প্রার্থী নগণ্য প্রজা হলেও ন্যায় বিচার পেত এবং অপরাধী সর্বোচ্চ ৰমতাধর হলেও শাস্তি পেতেন। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মত ৰমতাবান শাসককেও কয়েদীর বেশে কাজীর দরবারে হাজীর হতে হয়েছে।[৩] বর্তমানে মানবতাবাদ ও গণতন্ত্রের যুগেও ক্ষমতাসীন কোন শাসকের আইনের প্রতি আনুগত্যের এ দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

২। আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (কাইকাউসের শিলালিপির পাঠোদ্ধার অংশ), পৃ-২২৭।
৩। সুখময় মুখোপধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস* (১২০৪-১৫৭৬), সুলতানি আমলে, পৃ-২৪৫-২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানী ও মোগল আমলে বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধিও ছিল মুসলিম শাসনের একটি গৌরবোজ্জ্বল দিক। অখ্যাত পরিত্যক্ত বাংলাকে মুসলিমরাই বাসযোগ্য করেছে। হান্টারের মতে, তারাই পূর্ববঙ্গকে সর্ব প্রথম সমুদ্রের গ্রাস থেকে পৃথক করে বসবাসের উপযোগী করার সুখ্যাতি অর্জন করেছে।[৪] কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। মুসলিম বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধি আজও কিংবদন্তী হয়ে আছে। মুসলিম শাসনামলেই বাংলার শিল্পায়ন, শহরায়ণ ও নগরায়ণের বিকাশ ঘটে। ইতালীয় বণিক বারথেমার বিবরণে বাংলা হয়ে উঠে বসবাসের উৎকৃষ্ট স্থান।[৫]

ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ মুসলিমদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। মুসলিম আমলেই বাংলা ভাষাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে কাঠামোগত রূপদান ও শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হয়েছে। মুসলিমগণ আরবি ফার্সি শব্দ ভান্ডার দ্বারা বাংলা ভাষার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যে নতুন নতুন ভাবধারা সংযোজন করেছেন। তারাই প্রথম বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস বিষয়ক ও মানবধর্মী রচনার সূত্রপাত করেছেন। তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারকে সকল শ্রেণী-বর্ণের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মুসলিম শাসনামলে ব্যাপকভাবে সাহিত্যের চর্চা শুরব হলে তাঁতী, ধোপা, গোয়ালা, নাপিত প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণী-পেশার মানুষেরাও সাহিত্যের চর্চায় অংশগ্রহণ করে।

৪। W.W. Hunter , The *Indian Musalmans,* P-137.

৫। দ্রষ্টব্যঃ বর্তমান অভিসন্দর্ভ, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ-৪৩।

মুসলিম বাংলার আর একটি দিক উল্লেখ না করলেই নয়, তা হচ্ছে সামাজিক শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। বাংলার স্বাধীনচেতা শাসকদের নিয়ন্ত্রণে আনতে মাঝে মধ্যে দিল্লী থেকে প্রেরিত অভিযান, ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে অন্তর্কলহ এবং মোগলদের বিরুদ্ধে বারো ভূঁইয়াদের সংগ্রাম ব্যতীত পুরো সুলতানী ও মোগল আমলে বাংলার সামাজিক পরিস্থিতি ছিল সুশৃঙ্খল। সাধারণ মানুষের জীবন ছিল নিরুপদ্রপ। সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্যায় করে কোন অপরাধী পার পেত না। প্রত্যেক জমিদার তার স্ব স্ব এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষ একরকম নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে জীবিকা নির্বাহ করত। আর সুলতানী ও মোগল আমলে বাংলা ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই স্ব স্ব অধিকার নিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দের সাথে পাশাপাশি বাস করত। রাষ্ট্রের নানা অঙ্গনে মুসলিমদের একচেটিয়া প্রাধান্য থাকলেও যোগ্যতার বিচারে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীরও প্রবেশাধিকার ছিল। বরং নবাবী আমলে এসে রাজস্ব প্রশাসনে হিন্দুরাই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। সাহিত্যাঙ্গনেও হিন্দু-মুসলিম উভয়ের সরব পদচারণা লক্ষনীয়। পুরো মুসলিম আমলব্যাপী বড় আকারের কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা গণবিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায় না। আলাদা আলাদা ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে সম্মানজনক দূরত্বে অবস্থান করেও দুটি জাতি (হিন্দু, মুসলিম) দীর্ঘ কালব্যাপী একই সমাজে, একই রাষ্ট্রে অবস্থান করেছে।

কিন্তু ইংরেজ শক্তির আগমনে বাংলার সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক রূপান্তর ঘটে। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। মুসলিমগণ ভারতের বাইরে থেকে আসলেও দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় মুসলিম শাসন ভারতে স্থানীয় রূপ লাভ করেছিল। কিন্তু ইংরেজ শক্তি দীর্ঘ দুশো বছর শাসন করেও বিদেশী শক্তি রূপেই বিবেচিত হয়। তাই ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে বাংলার রাজনীতিতে

দেশীয় শাসনের অবসান এবং বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বড় ধরনের রূপান্তর ঘটে। শাসন প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে। সুলতানি ও মোগল আমলে মুসলিম শাসন নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল উদারতা ও জনকল্যাণ। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রথমার্ধে তাদের শাসননীতির মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও শোষণ। পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজগণ প্রজা শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও জনকল্যাণ ও উন্নয়নের পরিধি ছিল সীমিত। তবে বাংলায় মুসলিম শাসন ছিল উদারপন্থী স্বৈরশাসন আর ইংরেজ শাসনামলে ধীরে ধীরে ৰমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়। ইংরেজ শাসনের শেষ পর্যায়ে এসে শাসন ৰমতায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

মুসলিম শাসনামলে বিচার ব্যবস্থায় ন্যায় বিচারের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হয়েছিল ইংরেজ আমলে এর বিপরীতে আইনি জটিলতা, ঘুষ, উৎকোচ ও দালাল শ্রেণীর উৎপাত বৃদ্ধি পায়। ইসলামী আইনের পরিবর্তে ইউরোপীয় সেক্যুলার আইন চালু হয়। মুসলিম শাসনামলে বিচার বিভাগের গুরৰত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল বিচার বিভাগ ও বিচারকের স্বাধীনতা, কিন্তু ইংরেজ আমলে এসে বিচার বিভাগ স্বাধীনতা হারায় এবং শাসন বিভাগের অধীন হয়ে পড়ে।

মুসলিম শাসনামলে শিৰা, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাই প্রধান ভূমিকা রাখলেও ইংরেজ শাসনে মুসলিম শিৰা ব্যবস্থা প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। পরবর্তীতে সরকারি উদ্যোগে সীমিত পর্যায়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে সকলের প্রবেশধিকার ছিল না। সার্বজনীন শিৰার বিপরীতে শ্রেণী বিশেষকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়। ইংরেজ আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিকায়ন ঘটে কিন্তু সংস্কৃত ও আরবি-ফার্সি মুখী দুটি বিপরীত ভাবধারায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাজন সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার কথ্য ভাষায়ও ব্যাপক রূপান্তর ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ শাসনামলে শুধু যে শিক্ষা সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে তা নয়, বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য যা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রসারিত হয়েছিল, তাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। বস্ত্রের কাঁচামাল তথা সুতা উৎপাদনের বিশাল একটি ক্ষেত্র ছিল বাংলা। ইংরেজ শাসনাধীনে সুতা উৎপাদন প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে কৃষির চরম অধোঃপতন ঘটে। বিস্তীর্ণ কৃষি জমি অনাবাদি হয়ে পড়ে ও জঙ্গলে পরিণত হয়। রেশম ও তাঁত শিল্পের উৎপাদন অর্ধেকে নেমে আসে।[৬] ইংরেজ শাসনাধীনে ঐতিহ্যবাহী মসলিনের বিলুপ্তি বাংলার ব্যবসায়, শিল্প ও সংস্কৃতিতে একটি বৃহৎ ক্ষতি। পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই শিল্পকে পুনরুদ্ধার সম্ভব নি। মোটকথা অর্থনৈতিক অঙ্গনে তথা ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে বাংলাকে প্রায় পরিত্যক্ত অঞ্চলে পরিণত করে । বণিকবেশে ইংরেজরা বাংলায় আসলেও ব্যবসায়-বাণিজ্যের পতনের পর ভূমিরাজস্ব তাদের আয়ের প্রধান উৎসে পরিণত হয়। ইংরেজ শাসন জাতীয় ও জনকল্যাণকর শাসন না হওয়ায় বাংলার অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে সুদূরপ্রসারী ও গঠনমূলক ভূমিকা তারা গ্রহণ করে নি।

মুসলিম বাংলার বড় বড় নগর কেন্দ্র, যেমন ঢাকা, চিটাগাং, হুগলী, সোনারগাঁয়ের পতন ঘটে। শুধু বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে চিটাগাং এর অস্তিত্ব টিকে ছিল এবং বঙ্গভঙ্গ পরবর্তীতে ঢাকার পুনরবথান ঘটে। কিন্তু সোনারগাঁ ও হুগলী আর পূর্বের মর্যাদায় ফিরে আসেনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে কলকাতার উথান ঘটলেও কলকাতা পূর্ব বাংলার রাজস্ব ও কাঁচামাল নির্ভর হওয়ায় বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী সময়ে কলকাতার জৌলুস কমে যায়। তবে পূর্ব বাংলা তথা মুসলিম বাংলা খামার বাড়িতে পর্যবসিত হয়। বাংলার মুসলিমরা অভিজাত শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণী নির্বিশেষে কৃষি নির্ভর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। বাঙালী মুসলমানের জীবন মানের

৬। J.C. Sinha, *Economic Annals of Bengal*, ch; II. উদ্ধৃতঃ সিরাজুল ইসলাম, পৃ-৭২।

মারাত্মক অবনতি ঘটে। হান্টারের বর্ণনা অতিরঞ্জন বা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও তা একেবারে অমূলক ছিল না। জীবনমানের অবনতিতে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, খাবার দাবার, উৎসব বিনোদনে পূর্বের জৌলুস হারিয়ে যায়।

ইংরেজ শাসনকালে বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি স্বীয় স্বার্থে হিন্দু-মুসলিম দুটি জাতিকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ইংরেজরা মুসলিম শাসনামলে হিন্দু নিপীড়নের নানা কাহিনী আবিষ্কার করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে হিন্দু সমাজের কাছে উপস্থাপন করে এবং নিজেরা হিন্দু সমাজের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু সমাজের উন্নয়ন যে হয় নি তা নয়, তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার সাথে মুসলিম বিদ্বেষের যে ভাবধারা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে তাতে হিন্দু মুসলিম পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মূল ভিত্তিটিকেই উপড়ে ফেলা হয়েছে। ইংরেজ সরকার বিদায় নিয়েছে কিন্তু তাদের রোপিত উগ্র হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভারত উপমহাদেশের শান্তি ও সম্প্রীতিকে করেছে সুদূর পরাহত। আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে আর একটি দিক উল্লেখ না করলেই নয়, তা হচ্ছে বাঙালী মুসলিমরা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, আর্থিক সচ্ছলতায় ও সমাজ সংগঠনে সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল। সভ্যতার আধুনিকায়নে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর সাথে তুলনায় তারা কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও স্বকীয় জীবনযাত্রায় তারা ছিল আত্মনির্ভরশীল। কিন্তু ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্যায়ে তাদের মুসলিম অবদমননীতি প্রতিষ্ঠিত একটি জাতিকে নিঃশেষ করে দেয়, মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ানোর মত কোন অবলম্বন তাদের ছিল না। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয়। বিপরীতে ধর্মনিরেপক্ষেতার নামে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয় তা ছিল, মুসলিমদের বিশ্বাস ও চাহিদার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। এর ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ সময়ব্যাপী মুসলিম জাতিটি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকে। এরপর যখন তারা এগিয়ে আসে, তখন একটি অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্য একটি অংশ পার্থিব ব্যবহারিক জ্ঞান বিবর্জিত নিরেট ধর্মতাত্ত্বিক

শিক্ষাকে (কওমী শিক্ষা) বেছে নেয়। যে কারণে মুসলিম জাতিটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং আজ পর্যন্ত তাদের পক্ষে রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে নীতি নির্ধারণে জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব হয় নি। যার পরিণতিতে ভারত উপমহাদেশের দুটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও পাকিস্তান আজ রাজনৈতিক অস্থিরতার স্বীকার।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট:

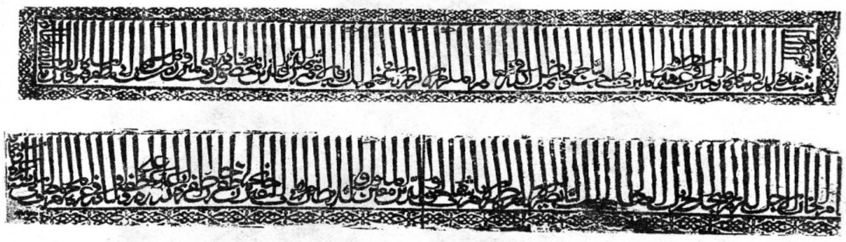

শামসউদ্দিন ফিরুজ শাহের ত্রিবেণী শিলালিপি

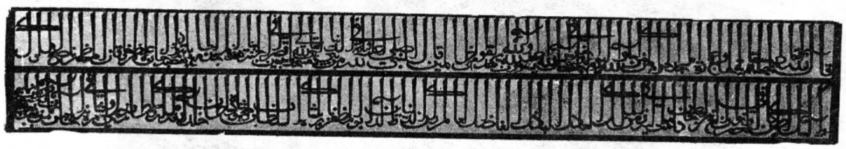

বারবক শাহের দেওতলা শিলালিপি

দিনাজপুরে প্রাপ্ত গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের শিলালিপি

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী জেলার সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহের শিলালিপি

সুলতান ফিরুজ শাহের সিলেটে প্রাপ্ত শিলালিপি

Dhaka University Institutional Repository

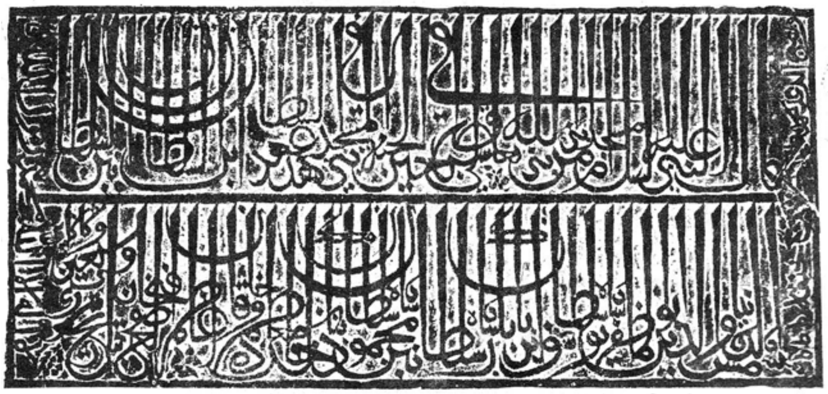

শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহের রাজশাহীর সুলতানগঞ্জের শিলালিপি

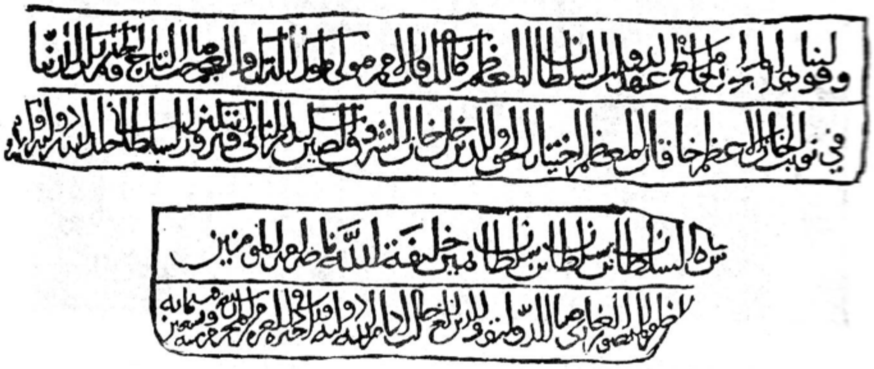

রুকনউদ্দিন কাইকাউসের শিলালিপি

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক ব্রিটিশ বাংলার মুসলিম স্থাপত্যঃ

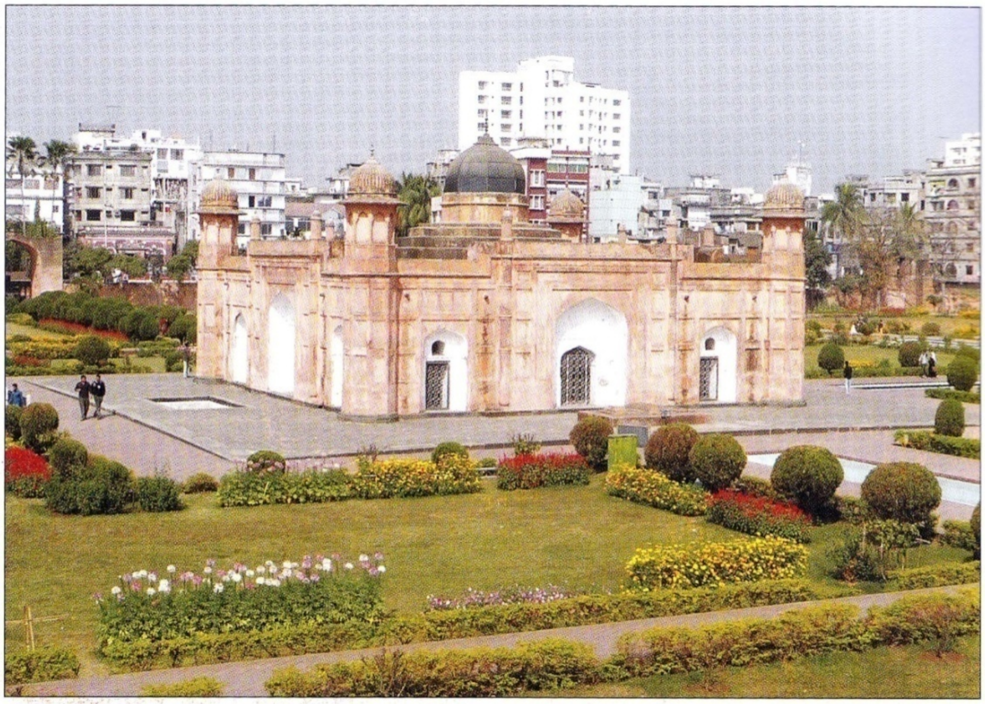

http://files.myopera.com/bachkien/albums/6395041/BANGLADESH-Dhaka-4-Tomb%20of%20Pari%20Bibi%20at%20Lalbagh%20Fort%20%284%29.JPG

পরি বিবির মাজার

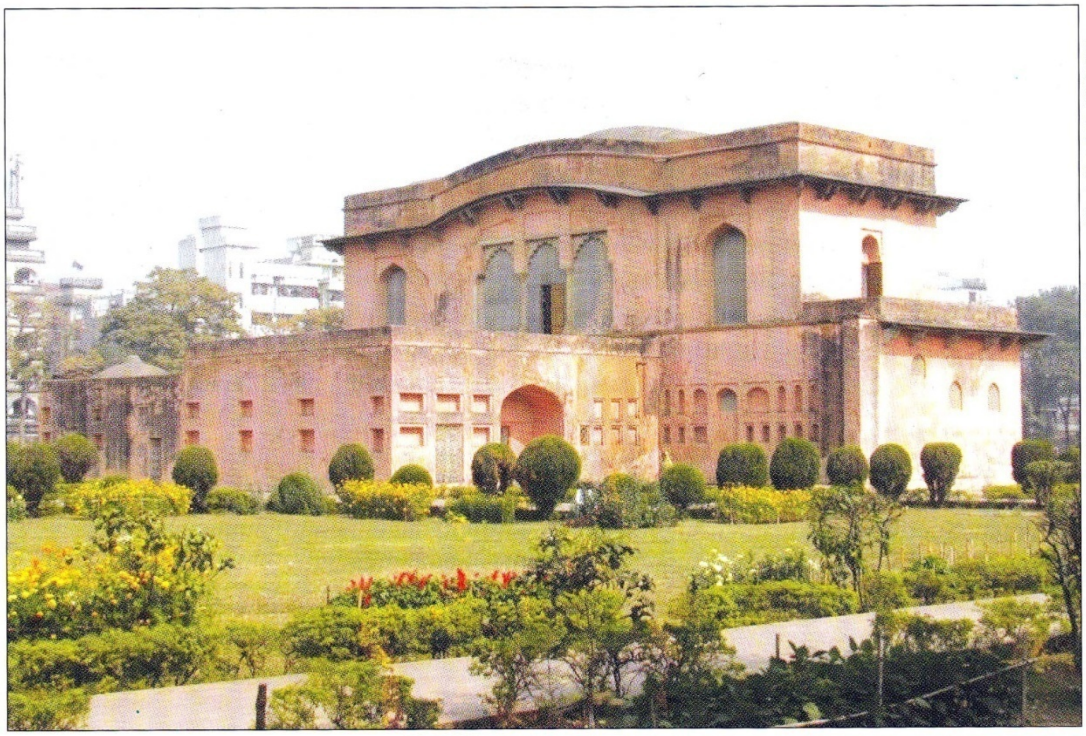

http://joomlight.files.wordpress.com/2011/02/img_3773_audience_hall_hammam_lalbagh_fort_dhaka-1024x768.jpg

দরবার হল (লালবাগ কেলল্লা)

Dhaka University Institutional Repository

Source : http://static.panoramio.com/photos/original/33882447.jpg

লালবাগ ফোর্ট মসজিদ

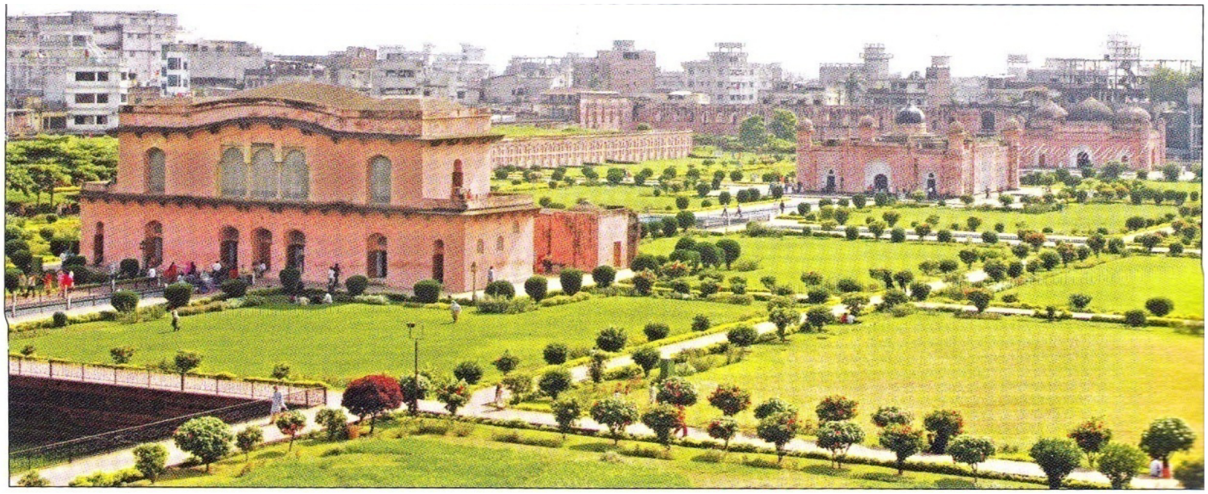

লালবাগ প্রাসাদ

ঈশা খাঁ'র রাজধানী, সোনারগাঁও

Dhaka University Institutional Repository

সাত মসজিদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগের হাট

ব্রিটিশ বাংলার স্থাপত্যঃ

http://img.photobucket.com/albums/v193/Bangladesh/dhakamedicalcollege.jpg

সেক্রেটারিয়েট ভবন

Source : http://en.wikipedia.org

আহসান মঞ্জিল

কার্জন হল

হোলি রোজারিও চার্চ (১৭১৪)

Dhaka University Institutional Repository

নিমতলি দেউড়ি

Source : http://joomlight.files.wordpress.com

১৯ শতকে প্রতিষ্ঠিত পোগোজ স্কুল

Dhaka University Institutional Repository

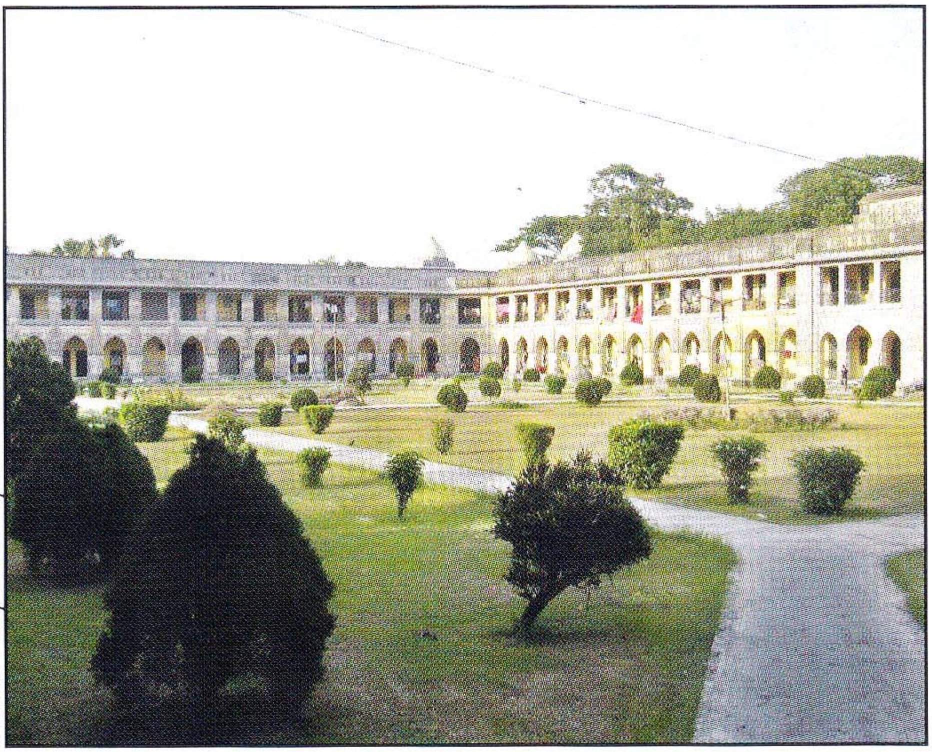

Source : http://static.panoramio.com

১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত সলিমুলৱাহ মুসলিম হল

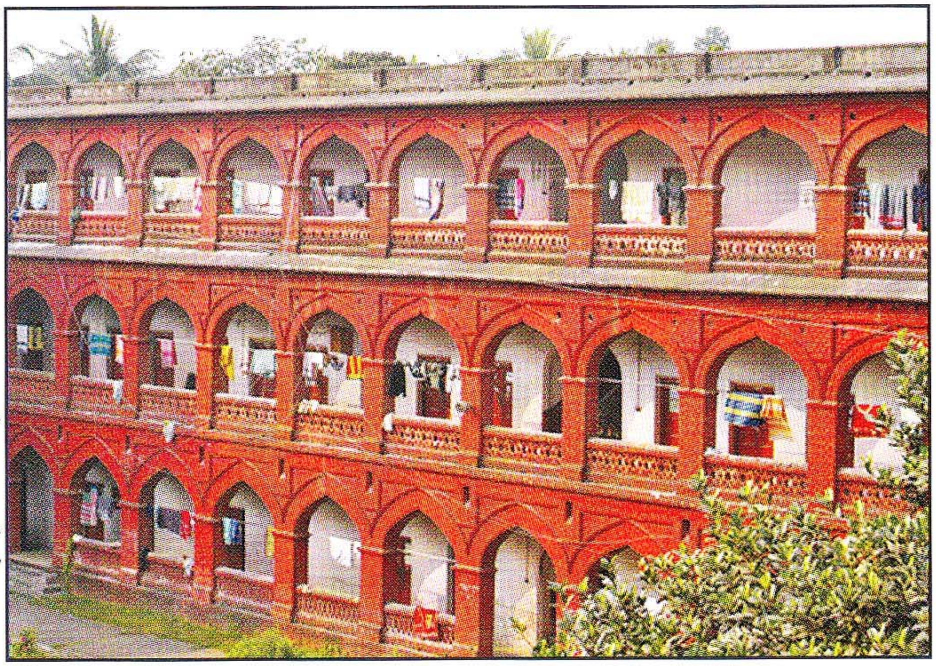

Source : http://farm4.static.flickr.com/3267/3249078905_0987c4c3d0.jpg

ফজলুল হক হল

Dhaka University Institutional Repository

Source: http://www.panoramio.com

চামেরি হাউস

Source : http://upload.wikimedia.org

বর্ধমান হাউস (বাংলা একাডেমি)

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

অপ্রকাশিত থিসিসঃ

১। মিয়াজী, মো আতাউর রহমানঃ বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারীঃ মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমানঃ ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজসেবা-একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, জুন ২০০৭ (ঢা. বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

২। আলমগীর, মোঃ : বাংলার মুসলিমদের সমাজজীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৯ (ঢা. বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

৩। বাছির, আব্দুলঃ বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী (১৭৫৭-১৮৫৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, জুন, ২০০৮ (ঢা. বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

৪। আহমদ, ইমতিয়াজঃ বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকা (১৯০৫-১৯২৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ২০০০ (ঢা. বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

প্রকাশিত গ্রন্থঃ

১। থানবী (রহঃ), হযরত মাওলানা আশরাফ আলীঃ *ছহীহ্ নূরানী কোরআন শরীফ*, অনুবাদ-অধ্যাপক মাওলানা মতিউর রহমান, মীনা বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, নভেম্বর ২০০৮।

২। আযম, অধ্যাপক গোলামঃ *সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ*, (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড), কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৮।

৩। যাকিউদ্দিন, হাফেজ ইমাম আবু মুহাম্মদঃ *আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব* (হাদীস সংকলন), প্রথম খণ্ড, অনুবাদ-হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারবক, হাসনা প্রকাশনী, ঢাকা-১০০০, জনু ২০০৪।

৪। রশিদ, মোহাম্মদ হারবন উর ও অন্যান্য (সম্পাদিত): *বাংলা একাডেমী-সহজ বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৫।

৫। আহমদ, আবুল মনসুরঃ *বাংলাদেশের কালচার*, আহমদ পাবলিশিং, বাংলাবাজার, ঢাকা-২০১১।

৬। জহুরীঃ *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, ১ম খন্ড, উতলু প্রকাশন, ঢাকা-১৯৮৫।

৭। *আরবী-বাংলা অভিধান*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ ১৯৭০।

৮। *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ ১৯৭২।

৯। ইউসুফ, মনির উদ্দিন (সংকলক) : *আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* (সংকলিত গ্রন্থ), আত্মপ্রকাশ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

১০। চৌধুরী, আবুল আহসান (সংকলন সম্পাদনা-ভূমিকা) : *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (সংকলিত গ্রন্থ), মধ্যযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

১১। রাব্বানী, গোলাম : *উপনিবেশ পূর্ব বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুবয়ারী ২০০১।

১২। রহিম, ড. মুহম্মদ আবদুর : *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১২০৩-১৫৭৬), প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩। মুসা, মনসুর (সম্পাদিত) : *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১।

১৪। মুখোপধ্যায়, সুখময়: *বাংলার ইতিহাস* ১২০৪-১৫৭৬ (সুলতানি আমল), খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

১৫। সলীম, গোলাম হোসেন : *রিয়াজ-উস-সালাতীন*, বঙ্গানুবাদ-আকবর উদ্দীন, অবসর প্রকাশ, ঢাকা-১১০০।

১৬। হোসাইন, খুররম (অনুবাদক) : *ইবনে বতুতার ভ্রমন কাহিনী*, ক্যাবকো বিসিক শিল্পনগরী টাঙ্গাইল, ২০০০।

১৭। করিম, আবদুল: *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৪।

১ ৮। শাহনেওয়াজ, এ.কে.এম: *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৯।

১৯। সেন, শ্রী সুকুমার: *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

২০। আহমদ,ওয়াকিল: *মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৬৮।

২১। তরফদার, মমতাজুর রহমানঃ *হোসেন শাহী আমলে বাংলা (১৪৯৪-১৫৩৮) একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যেষণা*, অনুবাদ মোকাদ্দেসুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২২। সেন, এস কে (সম্পাদিত) : *মনসা মঙ্গল*, কলিকাতা ১৯৫৬।

২৩। নাথান, মির্জা : *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, বাংলা অনুবাদ-খালেকদাদ চৌধুরী, দিব্য প্রকাশ, ৩৮/২ ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

২৪। ইসলাম, সিরাজুল : *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠমো* (১৭৫৭-১৮৫৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪।

২৫। রহিম, ড. এম এ : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* ১৭৫৭-১৯৪৭, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

২৬। টেলর, জেমস : *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, বাংলা অনুবাদ-মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৮।

২৭। মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল : *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ*, কথামেলা প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফেব্রবয়ারি, ২০০৭।

২৮। আহমেদ, শরীফ উদ্দিন : *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন* (১৮৪০-১৯২১), একাডেমিক প্রেস এণ্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ধানমন্ডি, ঢাকা ২০০১।

২৯। সাহা, ড. পঞ্চনন : *হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক: নতুন ভাবনা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ২০০১।

৩০। আকাশ, এম. এম. : *ভাষা আন্দোলন : শ্রেণী ভিত্তিক ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা ১৯৯০।

৩১। শহীদুলৱাহ, ডক্টর মুহাম্মদ : *সাহিত্যে সাম্প্রদয়িকতা আমাদের সমস্যা*, রেনেসাঁ পাবলিকেশনন্স, ঢাকা-১৯৪৫।

৩২। আহমদ, আবুল মনসুর : *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজা কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফেব্রবয়ারি, ২০১০।

৩৩। আহমদ, ওয়াকিল : *ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

৩৪। আলম, তাহমিনা : *বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ* ১৯০০-১৯৪৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৮।

৩৫। খান, মোশাররফ হোসেন (সম্পাদনা) : *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান* (সংকলিত গ্রন্থ), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা, ১৯৯৮।

৩৬। হালদার, গৌরদাস : *শিৰণ প্রসঙ্গে ভারতীয় শিৰার ইতিহাস* (আধুনিক যুগ), ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯২।

৩৭। আহমদ, সুফিয়া : *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়*: ১৮৮৪-১৯১২, বাংলা অনুবাদ-সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০২।

৩৮। হালদার, গৌরদাস : *শিৰণ প্রসঙ্গে ভারতীয় শিৰার ইতিহাস* (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৯৭৯।

৩৯। করিম, আবদুল : *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭।

৪০। রহিম, মুহম্মদ আবদুর : *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১৫৭৬-১৭৫৭), দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদ-মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮২।

৪১। মাসুম, মো. আব্দুলৱাহ আল: *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিৰা সমস্যা ও প্রসার* (১৮৭১-১৯৪১), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৮।

৪২। তবাতবায়ি, সৈয়দ গোলাম হোসেন খান : *সিয়ার-উল মুতাখ্খেরিন*, অনুবাদ-আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, দিব্য প্রকাশ, ২০০৬।

৪৩। করিম, আবদুল : *বাংলার ইতিহাস* (মোগল আমল) প্রথম খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ্ প্রকাশন, ঢাকা ২০০৭।

৪৪। হোসেন, দিলওয়ার (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) : *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৪।

৪৫। মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আলা : *উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান*, ২য় খণ্ড, অনুবাদ: আকরাম ফারৰক, আবদুস শহীদ নাসিম ও মনুরৰদ্দীন আহমদ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।

৪৬। রহিম, এনায়েতুর : *বাংলায় স্ব-শাসন* (১৯৩৭-১৯৪৩), অনুবাদ-জাকারিয়া শিরাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১।

৪৭। মান্নান, অধ্যাপক আ.খা. আবদুল ও অন্যান্য : *শিৰার ইতিহাস*, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ঢাকা, ১৯৯২।

৪৮। ফারৰকী, রশীদ আল : *বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

৪৯। খান, আব্বাস আলী : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-১২০৫, জুন, ২০১১।

৫০। মওদুদ,আবদুল : *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ; সংস্কৃতির রূপান্তর*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

৫১। শাইখ, আসকার ইবনে : *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮।

৫২। শাসমল, বিমলানন্দ : *ভারত কী করে ভাগ হলো*, হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস, কলকাতা, ১৯৯১।

৫৩। হক, কাজী আনওয়ারৰল : *তিন পতাকার তলে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫৪। খান, আকবর আলি : *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা*, অনুবাদ-আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৪।

৫৫। নাথ, বিপুল রঞ্জন : *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ* (১৮৬১....), ঢাকা, ১৯৮০।

৫৬। আলীম, এ.কে.এম. আবদুল : *ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬।

৫৭। হান্টার, ডবিৰউ ডবিৰউ : *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, অনুবাদ-এম. আনিসুজ্জামান, খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ১৯৯৪।

৫৮। করিম, আবদুল : *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* (১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত), কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, ফেব্রৰয়ারী, ২০০৬।

৫৯। খাঁ, মোহাম্মদ আকরম : *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফেব্রৰয়ারি ২০০২।

৬০। আহমদ, ওয়াকিল : *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী* (১৭৫৭-১৮০০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

৬১। আজাদ, মাওলানা আবুল কালাম : *ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল* (মাওলানা আব্দুলৰাহ বিন সাঈদ কর্তৃক অনুদিত), ঢাকা, ১৯৭৯।

৬২। আনিসুজ্জামান : *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৪।

৬৩। ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) : *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১) ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, এশিয়াটক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

৬৪। উমর, বদরুদ্দীন : *বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি*, কলকাতা, ১৯৮৭।

৬৫। মজুমদার, রমেশ চন্দ্র : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি, ১৯৭৫।

৬৬। হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল : *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

৬৭। বন্দোপাধ্যায়, শ্রী রাখাল দাস : *বাংলার ইতিহাস* (অখন্ড সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮।

৬৮। আলরামী, আবুল ফজল : *আইন-ই- আকবরী*, (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), অনুবাদ আহমদ ফজলুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৩।

৬৯। মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার : *সিরাজদ্দৌলা*, দিব্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি-২০০৩।

৭০। চক্রবর্তী, রতনলাল : *সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬।

৭১। মামুন, মুনতাসীর (সম্পাদিত): *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০০২।

৭২। চ্যাটার্জী, জয়া : *বাঙলা ভাগ হল*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-২০০২।

৭৩। আহ্মদ, সালাহউদ্দীন : *ঊনিশ শতকে বাংলার সমাজ চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন* (১৮১৮-১৮৩৫), অনুবাদ সালাহউদ্দিন আহ্মদ ও অন্যান্য, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।

৭৪। মুখোপাধ্যায়, সুখময় : *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিম পর্ব* (১২০৪-১৩৩৮ খৃঃ), সাহিত্যলোক, কলকাতা।

৭৫। সেন, সুকুমারঃ *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, কলকাতা।

৭৬। হক, এনামুলঃ *বঙ্গেসূফী প্রভাব*, কলকাতা।

৭৭। রহীম, আব্দুর ও অন্যান্যঃ *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

৭৮। হোসেন, ইমরান : *বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবীঃ* চিন্তা ও কর্ম, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

৭৯। ইসলাম, মফিজুল : *উপমহাদেশের রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব।*

বাংলা পত্রপত্রিকা

১। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

২। দৈনিক ইত্তেফাক, সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা, মার্চ -১৯৬৪।

৩। ইসলাম প্রচারক (কর্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিকপত্র ৬ষ্ঠ ও ৭ম বর্ষ (১৯০৩-৪)

৪। মাহে-নও, বর্ষ ১৬, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

৫। মাসিক মোহাম্মদী, ৩৭-৩৮ শ বর্ষ, ১৩৭৩-৭৪।

৬। নবনূর, মাসিকপত্র ও সমালোচন, মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত, প্রথম বর্ষ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

ইংরেজী

Unpublished Thesis

1. Bhuiyan, Md. Mosharraf Hossain, The sufis of Dhaka: A Study of Their rule in historical context, An unpublished thesis prepared for Ph.D Degree of Dhaka University, 2011.

Published Books:

1. Malik, Hafeez : *Moslem Nationalism In India and Pakistan*, Public Affairs Press, Washington, D.C, 1963.
2. Akanda, Latifa : *Social History of Muslim Bengal*, Islamic Cultural Centre, Dacca, May 1981.
3. Mallick, Azizur Rahman : *British Policy and the Muslims in Bengal*: 1757-1856, Bangla Academy, Dacca, June 1977.
4. Hunter, W.W. : *The Indian Musalmans*, Published by W. Rahman, Barnalipi Mudrayan, Banglabazar, Dacca, June 1975.
5. *The New Encyclopedia Britannica*, Vol-3, Founded 1768.
6. *The World Book Encyclopedia*, (Ci-Cz), Vol-4, Field Enterprises INC, Chicago.
7. Khuda, Khaleda Manzur : *Islam the Formative Background of Bangladesh*, Academic Press and Publishers Library, June 2004, Dhaka-1209.
8. Karim, Abdul : *Social History of The Muslim in Bengal*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1956.

9. Ahmad, Shamsu-ud-din : *Inscription of Bengal*, Vol-lV;
10. Stewart, Charls: *History of Bengal*, Calcutta, 1813.
11. Gupta, J.N. Das : *Bengal in the Sixteenth A.D.*, Calcutta University, 1914.
12. Akhtaruzzaman, Md. : *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, December 2009.
13. Ahmed, Sufia : *Muslim Community in Bengal* (1884-1912), Dacca, 1974.
14. Ali, Muhammad Mohar: *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities* (1833-1857), Chittagong 1965.
15. Ali, Syed Ameer. *The Spirit of Islam*, London, 1955.
16. Azad, Abul Kalam: *India Wins Freedom*, Bombay, Orient long mans, 1959.
17. Chand, Tara: *Influence of Islam on Indian culture,* Allahabad, 1946.
18. Islam, Sirajul (ed): *History of Bangladesh*: 1704-1971, Vol-1, II &III , Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1992.
19. Karim, Abdul : *Muhammadan Education in Bengal*, Calcutta-2900.
20. Karim, Abdul : *Murshidquli Khan and His times*, Dacca, 1963.

21. Misra, B.B.: *The Indian Middle classes*: Their Growth in Modern Times, London, Oxford University press, 1961.

22. Poole, Stanley Lane: *Aurangzeb, and the Decay of the Mughal Empire*, Bombay, 1930.

23. Rahim, Muhammad Abdur: *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. I& II, Karachi, Karachi University, 1963.

24. Sinha, N.K.: *The Economic History of Bengal*, VoI & II, Calcutta, 1961.

25. Rabbi, Fuzli: *The Origin of the Musalmans of Bengal*, Calcutta, 1895.

26. Ghesh, J.: *Higher Education in Bengal Under British Rule*, Calcutta 1926.

27. Haque, M Azizul: *The History and Problems of Moslem Education in Bengal*, Calcutta, 1917.

28. Haque, M. Azizul: *Education and Retrenchment*, Calcutta.

29. Roy, A.C.: *Bengal under the Mughals*, Calcutta, 1974.

30. Sen, Shila: *Muslim Politics in Bengal*: 1937-47, New Delhi, Impex India, 1976.

31. Pant, D: *The Commercial Policy of the Moguls*, Idarah-i-Adabiat-i Delli, Delhi-110006, 1930.

পত্রপত্রিকা ও দলিল পত্র

1. *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Calcutta.
2. *Journal of the Bihar Researeh Society*, Vol-XLII, Part II, 1956.
3. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, Vol-VIII, No.I, 1963.
4. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol-XXVl, 1979-81,
5. *Visva-Bharati Annals*, Vol-l, 1945.
6. Bengal Correspondence, Court of Directors to Fort William Council 17 June, 1948.
7. House of Commonce Sessional papers, 1812-13, Vol. Vlll, No. 152